পরিচয়

বার্ষিক
৪।০

প্রতি সংখ্যা
১৲

ত্রৈমাসিক
পত্রিকা

দ্বিতীয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
মাঘ, ১৩৩৯

বিষয় সূচী

পুস্তক-পরিচয়

পরিচয়

বার্ষিক
৪৷০

প্রতি সংখ্যা
১৲

ত্রৈমাসিক
পত্রিকা

দ্বিতীয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
মাঘ, ১৩৩৯

বিষয় সূচী

পুস্তক-পরিচয়

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুশোভন সরকার, শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু, শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীবিষ্ণু দে, শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীপ্রভাতকুমার বসু—ইত্যাদি।

২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
মাঘ, ১৩৩৯

পরিচয়

চিহ্নবিভ্রাট

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

কল্যাণীয়েষু

সঞ্চয়িতার মুদ্রণভার ছিল জীবনময়ের উপর। প্রুফ দেখার কালে চিহ্ন ব্যবহার নিয়ে তাঁর খটকা বাধে। সেই উপলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে আমার যে-চিঠি চলেছিল সেটা প্রকাশ করবার যোগ্য বলে মনে করি। আমার মতই-যে সকলে গ্রহণ করবেন এমন স্পর্দ্ধা মনে রাখিনে। আমিও-যে সব জায়গায় সম্পূর্ণ নিজের মতে চলব এত বড়ো সাহস আমার নেই। আমি সাধারণত যে-সাহিত্য নিয়ে কারবার করি পাঠকের মনোরঞ্জনের উপর তার সফলতা নির্ভর করে। পাঠকের অভ্যাসকে পীড়ন করলে তার মন বিগড়িয়ে দেওয়া হয়, সেটা রসগ্রহণের পক্ষে অনুকূল অবস্থা নয়। তাই চলতি রীতিকে বাঁচিয়ে চলাই মোটের উপর নিরাপদ। তবুও সঞ্চয়িতার প্রুফে যতটা আমার প্রভাব খাটাতে পেরেচি ততটা চিহ্ন ব্যবহার সম্বন্ধে আমার মত বজায় রাখবার চেষ্টা প্রকাশ পেয়েচে। মতটা কী দুখানা পত্রেই তা বোঝা যাবে। এই মত সাধারণের ব্যবহারে লাগবে এমন আশা করিনে কিন্তু এই নিয়ে উক্তি-প্রত্যুক্তি হয়তো উপাদেয় হতে পারে। এখানে "উপাদেয়" শব্দটা ব্যবহার করলুম ইন্টারেষ্টিং শব্দের পরিবর্ত্তে। এই জায়গাটাতে খাট্‌ল কিন্তু সর্ব্বত্রই-যে খাট্‌বে এমন আশা করা অন্যায়। "মানুষটি উপাদেয়" বল্‌লে ব্যাঘ্রজাতির সম্পর্কে এবাক্যের সার্থকতা মনে আসতে পারে। এস্থলে ভাষায় বলি, লোকটি মজার, কিম্বা চমৎকার, কিম্বা দিব্যি। তাতেও অনেক সময়ে কুলোয় না, তখন নতুন শব্দ বানাবার দরকার হয়। বলি, বিষয়টি আকর্ষক, কিম্বা লোকটি আকর্ষক। 'আগ্রহক' শব্দও চালানো যেতে পারে। বলা বাহুল্য, নতুন তৈরি শব্দ নতুন নাগরা জুতোর মতোই কিছুদিন অস্বস্তি ঘটায়। মনোগ্রাহী শব্দও যথাযোগ্য স্থানে চলে—কিন্তু সাধারণত ইন্টারেষ্টিং বিশেষণের চেয়ে এ বিশেষণের মূল্য কিছু বেশি। কেননা, অনেক সময়ে ইন্টারেষ্টিং শব্দ দিয়ে দাম চোকানো পারা-মাখানো আধ্‌লা

পয়সা দিয়ে বিদায় করার মতো। বাঙালীর গান শুনে ইংরেজ যখন বলে, "হাউ ইণ্টারেষ্টিং" তখন উৎফুল্ল হয়ে ওঠা মূঢ়তা। যে-শব্দের এত ভিন্ন-রকমের দাম অন্য ভাষার ট্যাকশালে তার প্রতিশব্দ দাবি করা চলে না। সকল ভাষার মধ্যেই গৃহিণীপনা আছে। সব সময়ে প্রত্যেক শব্দ সুনির্দ্দিষ্ট একটিমাত্র অর্থই-যে বহন করে তা নয়। সুতরাং অন্য ভাষায় তার একটিমাত্র প্রতিশব্দ খাড়া করবার চেষ্টা বিপত্তিজনক। "ভরসা" শব্দের একটা ইংরেজি প্রতিশব্দ courage, আর একটা expectation। আবার কোনো কোনো জায়গায় দুটো অর্থই একত্র মেলে, যেমন—

নিশিদিন ভরসা রাখিস
ওরে মন হবেই হবে।

এখানে courageও বটে hopeও বটে। সুতরাং এটাকে ইংরেজিতে তর্জ্জমা করতে হলে ও দুটোর একটাও চল্‌বেনা। তখন বল্‌তে হবে—

Keep firm the faith, my heart,
it must come to happen.

উল্টে বাংলায় তর্জ্জমা করতে হলে "বিশ্বাস" শব্দের ব্যবহারে কাজ চলে বটে কিন্তু "ভরসা" শব্দের মধ্যে যে একটা তাল ঠোকার আওয়াজ পাওয়া যায় সেটা থেমে যায়।

ইংরেজি শব্দের তর্জ্জমায় আমাদের দাসভাব প্রকাশ পায় যখন একই শব্দের একই প্রতিশব্দ খাড়া করি। যথা "সিম্প্যাথির" প্রতিশব্দে সহানুভূতি ব্যবহার। ইংরেজিতে সিম্প্যাথি কোথাও বা হৃদয়গত কোথাও বা বুদ্ধিগত। কিন্তু সহানুভূতি দিয়ে দুই কাজ চালিয়ে নেওয়া কৃপণতাও বটে হাস্যকরতাও বটে। "এই প্রস্তাবের সঙ্গে আমার সহানুভূতি আছে" বল্‌লে মানতে হয় যে প্রস্তাবের অনুভূতি আছে। ইংরেজি শব্দটাকে সেলাম করব কিন্তু অতটা দূর পর্য্যন্ত তার তাঁবেদারি করতে পারব না। আমি বলব "তোমার প্রস্তাবের সমর্থন করি।"

এক কথা থেকে আরেক কথা উঠে পড়ল। তাতে কি ক্ষতি আছে। যাকে ইংরেজিতে বলে essay, আমরা বলি প্রবন্ধ, তাকে এমনতরো অবন্ধ করলে সেটা আরামের হয় বলে আমার ধারণা।

নিরামিষভোজীকে গৃহস্থ পরিবেষন করবার সময় ঝোল আর কাঁচকলা দিয়ে মাছটা গোপন করতে চেয়েছিল হঠাৎ সেটা গড়িয়ে আসবার উপক্রম করতেই তাড়াতাড়ি সেরে নিতে গেল, নিরামিষ পংক্তিবাসী ব্যাকুল হয়ে বলে উঠ্‌ল "যো আপ্‌সে আতা উস্‌কো আনে দেও।"

তোমাদের কোনো কোনো লেখায় এই রকম আপ্‌সে-আনে-ওয়ালাদের নির্ব্বিচারে পাতে পড়তে দিয়ো, নিশ্চিত হবে উপাদেয়,

অর্থাৎ ইণ্টারেষ্টিং। এবার পত্র দুটোর প্রতি মন দেও। এইখানে বলে রাখি, ইংরেজিতে যে-চিহ্নকে অ্যাপস্ট্রফির চিহ্ন বলে কেউ কেউ বাংলা পারিভাষিকে তাকে বলে "ইলেক", এ আমার নতুন শিক্ষা। এর যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমি দায়িক নই। এই পত্রে উক্ত শব্দের ব্যবহার আছে।

এই প্রসঙ্গে অবান্তর ভাবে আর একটা দুঃখের কথা বলে নিই।

কাল্‌চার্ শব্দের একটা নতুন বাংলা কথা হঠাৎ দেখা দিয়েচে; চোখে পড়েচে কি। কৃষ্টি। ইংরেজি শব্দটার আভিধানিক অর্থের বাধ্য অনুগত হয়ে ঐ কুশ্রী শব্দটাকে কি সহ্য করতেই হবে। এঁটেল পোকা পশুর গায়ে যেমন কাম্‌ড়ে ধরে ভাষার গায়ে ওটাও তেমনি কামড়ে ধরেচে। মাতৃভাষার প্রতি দয়া করবে না তোমরা ?

অন্য প্রদেশে ভদ্রতাবোধ আছে। এই অর্থে সেখানে ব্যবহার "সংস্কৃতি।" যে-মানুষের কাল্‌চার আছে তাকে বলা চলে সংস্কৃতিবান, শব্দটাকে বিশেষ্য করে যদি বলা যায় সংস্কৃতিবত্তা, ওজনে ভারি হয় বটে কিন্তু রোমহর্ষক হয় না। নিজের সম্বন্ধে অহঙ্কার করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, তবু আন্দাজে বল্‌তে পারি, বন্ধুরা আমাকে কালচার্‌ড্ বলেই গণ্য করেন। কিন্তু যদি তাঁরা আমাকে সহসা কৃষ্টিবান উপাধি দেন বা আমার কৃষ্টিবত্তা সম্বন্ধে ভালোমন্দ কোনো কথার উত্থাপন করেন তবে বন্ধুবিচ্ছেদ হবে। অন্তত, আমার মধ্যে কৃষ্টি আছে এ কথার প্রতিবাদ করাকে আমি আত্মলাঘব মনে করব না।

ইংরেজি ভাষায় চাষ এবং ভব্যতা একই শব্দে চলে গেছে বলে কি আমরাও বাংলা ভাষায় ফিরিঙ্গিয়ানা করব ? ইংরেজিতে সুশিক্ষিত মানুষকে বলে কাল্‌টিভেটেড—আমরা কি সেই রকম উঁচুদরের মানুষকে চাষ-করা মানুষ বলে সম্মান জানাব, অথবা বলব কেদারনাথ।

সংস্কৃতভাষায় উৎকর্ষ প্রকর্ষ শব্দের ধাতুগত অর্থে চাষের ভাব আছে কিন্তু ব্যবহারে সে অর্থ কেটে গেছে। কৃষ্টিতে তা কাটেনি। সেইজন্যে তোমাদের সম্পাদকবর্গের কাছে আমার এই প্রশ্ন, চিৎপ্রকর্ষ বা চিত্তপ্রকর্ষ বা চিত্তোৎকর্ষ শব্দটাকে কালচার অর্থে চালালে দোষ কি ? কালচার্‌ড্ মানুষকে প্রকৃষ্টচিত্ত লোক বলা যেতে পারে। কালচার্‌ড্ ফ্যামিলিকে প্রকর্ষবান পরিবার বল্‌লে সে-পরিবার গৌরব বোধ করবে। কিন্তু কৃষ্টিবান বললে চন্দনের সাবান মেখে স্নান করতে ইচ্ছা হবে।

রবীন্দ্রনাথ

৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩২।

* * * * * *

দার্জ্জিলীং

শ্রীযুক্ত জীবনময় রায়

কল্যাণীয়েষু

প্রুফে তুমি যে যে জায়গা নির্দ্দেশ করে দিয়েচ সেগুলো প্রশ্নসঙ্কেতের যোগ্য সন্দেহ নেই। তবে কেন মূল সংস্করণে তার ত্রুটি দেখচ তার একটু ইতিহাস আছে। একদা আমার মনে তর্ক উঠেছিল-যে চিহ্নগুলো ভাষার বাইরের জিনিষ, সেগুলোকে অগত্যার বাইরে ব্যবহার করলে ভাষার অভ্যাস খারাপ হয়ে যায়। যেমন, লাঠিতে ভর কোরে চললে পায়ের পরে নির্ভর কমে। প্রাচীন পুঁথিতে দাঁড়ি ছাড়া আর কোনো উপসর্গ ছিল না, ভাষা নিজেরই বাক্যগত ভঙ্গীদ্বারাই নিজের সমস্ত প্রয়োজন-সিদ্ধি করত। এখন তার এত বেশি নোকর চাকর কেন। ইংরেজের ছেলে যখন দেশে থাকে তখন একটিমাত্র দাসীতেই তার সব কাজ চলে যায় ভারতবর্ষে এলেই তার চাপরাসী হরকরা বেহারা বাট্‌লার চোপদার জমাদার মালী মেথর ইত্যাদি কত কি। আমাদের লিখিত ভাষাকেও এইরকম হাকিমী সাহেবিয়ানায় পেয়ে বসেচে। "কে হে তুমি" বাক্যটাই নিজের প্রশ্নত্ব হাঁকিয়ে চলেচে তবে কেন ওর পিছনে আবার একটা কুঁজ-ওয়ালা সহিস। সব চেয়ে আমার খারাপ লাগে বিস্ময়ের চিহ্ন। কেননা বিস্ময় হচ্চে একটা হৃদয় ভাব—লেখকের ভাষায় যদি সেটা স্বতই প্রকাশিত না হয়ে থাকে তাহলে একটা চিহ্ন ভাড়া করে এনে দৈন্য ঢাকবে না। ও যেন আত্মীয়ের মৃত্যুতে পেশাদার শোকওয়ালির বুক-চাপড়ানি। "অহো, হিমালয়ের কী অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য।" এর পরে কি ঐ ফোঁটা-সওয়ারি দাঁড়িটার আকাশে তর্জ্জনী নির্দ্দেশের দরকার আছে—(রোসো, প্রশ্নচিহ্নটা এখানে না দিলে কি তোমার ধাঁধা লাগবে (?)। কে, কি, কেন, কার, কিসে, কিসের, কত, প্রভৃতি এক ঝাঁক অব্যয় শব্দ তো আছেই তবে চিহ্নের খোসামুদি করা কেন। "তুমি তো আচ্ছা লোক" এখানে "তো"—ইঙ্গিতের পিছনে আরো একটা চিহ্নের ধাক্কা দিয়ে পাঠককে ডব্‌ল্ চমক খাওয়ানোর দরকার আছে কি। পাঠক কি আফিমখোর। "রোজ রোজ যে দেরি করে আস" এই বাক্যবিন্যাসেই কি নালিশের যথেষ্ট জোর পৌঁছল না। যদি মনে করো অর্থটা স্পষ্ট হোলো না তাহলে শব্দযোগে অভাব পূরণ করলে ভাষাকে বৃথা ঋণী করা হয় না,—যথা, "রোজ রোজ বড়-যে দেরি কোরে আসো।" মুস্কিল এই যে, পাঠককে এমনি চিহ্ন-মৌতাতে পেয়ে বসেচে, ওগুলো না দেখলে তার চোখের তার্ থাকে না। লঙ্কাবাটা দিয়ে তরকারী তো তৈরি

হয়েচেই কিন্তু সেই সঙ্গে একটা আস্ত লঙ্কা দৃশ্যমান না হলে চোখের ঝালে জিভের ঝালে মিলনাভাবে ঝাঁঝটা ফিকে বোধ হয়।

ছেদ চিহ্নগুলো আর এক জাতের। অর্থাৎ যতি-সঙ্কেতে পূর্ব্বে ছিল দণ্ডহাতে একাধিপত্য-গর্ব্বিত সীধে দাঁড়ি—কখনো বা একলা কখনো দোকলা। যেন শিবের তপোবনদ্বারে নন্দীর তর্জ্জনী। এখন তার সঙ্গে জুটে গেছে বাঁকা বাঁকা ক্ষুদে ক্ষুদে অনুচর। কুকুরবিহীন সঙ্কুচিত ল্যাজের মতো। যখন ছিল না তখন পাঠকের আন্দাজ ছিল পাকা, বাক্যপথে কোথায় কোথায় বাঁক তা সহজেই বুঝে নিত। এখন কুঁড়েমির তাগিদে বুঝেও বোঝে না। সংস্কৃত নাটকে দেখেচ রাজার আগে আগে প্রতিহারী চলে—চিরাভ্যস্ত অন্তঃপুরের পথেও ক্ষণে ক্ষণে হেঁকে ওঠে, "এই দিকে" "এই দিকে"। কমা সেমিকোলনগুলো অনেকটা তাই।

এ মোহ ক'দিন থাকে এ মায়া মিলায়
কিছুতে পারেনা আর বাঁধিয়া রাখিতে
কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়
মদিরা উথলে নাকো মদির আঁখিতে।

এখানে সংস্কৃত শ্লোক-লিখনের নিয়ম অনুসারে একমাত্র দাঁড়ি চিহ্ন ফেলা গেল চতুর্থছত্রের শেষে। তাতে কি বুঝতে বাধা পেলে। চোখটা অভ্যস্ত খুঁটিগুলোক খুঁজে মরে প্রয়োজন না থাক্‌লেও। তুমি হয় তো বলবে পদ্যের নিয়মে লাইন ভাগ করে লিখেচি বলেই অসুবিধে হয় নি। কথাটা সত্য। পুরোনো পুঁথিতে দেখেচি সমপংক্তিতে লেখবার সময় ছন্দের যতি অনুসারে প্রত্যেক ভাগেই দাঁড়ির ব্যবহার চলে। সেই অনুসারে লেখাটা হবে এই রকম—

এ মোহ কদিন থাকে এ মায়া মিলায়। কিছুতে পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে। কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়। মদিরা উথলে নাকো মদির আঁখিতে।

—এতে বুঝতে কিছুই বাধেনা কেবল অভ্যাসে বাধে। শেষোক্ত বাক্যটাতে "বাধে না" শব্দের পরে একটা কমা দিতে ঝোঁক হয়। কিন্তু যদি না দিই নালিশ করবে কি।

একদিন চিহ্নপ্রয়োগে মিতব্যয়ের বুদ্ধি যখন আমাকে পেয়ে বসেছিল তখনই আমার কাব্যের পুনসংস্করণকালে বিস্ময়সঙ্কেত ও প্রশ্নসঙ্কেত লোপ করতে বসেছিলুম। প্রৌঢ় যতিচিহ্ন সেমিকোলনকে জবাব দিতে কুণ্ঠিত হই নি। কিশোর কমা-কে ক্ষমা করেছিলুম, কারণ, নেহাৎ খিড়কির দরজায় দাঁড়ির জমাদারী মানানসই হয় না। লেখায় দুই জাতের যতিই যথেষ্ট, একটা বড়ো একটা ছোটো। সূক্ষ্ম বিচার করে আরো একটা যদি আনো তাহলে অতি সূক্ষ্ম বিচার করে ভাগ আরো অনেক বাড়বে না কেন।

অতএব আমার নিয়মে যদি ছাপাতে চাও তাহলে এইরকম দাঁড়াবে—

এ মোহ ক'দিন থাকে এ মোহ মিলায়,
কিছুতে পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে,
কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়,
মদিরা উথলে না কো মদির আঁখিতে।
কেহ কারে নাহি চেনে আঁধার নিশায়।
ফুল-ফোটা সাঙ্গ হলে গাহে না পাখিতে।
কোথা সেই হাসিপ্রান্ত চুম্বনতৃষিত
রাঙা পুষ্পটুকু যেন প্রস্ফুট অধর,
কোথা কুসুমিত তনু পূর্ণবিকশিত
কম্পিত পুলকভরে যৌবনকাতর।
তখন কি মনে পড়ে সেই ব্যাকুলতা
সেই চির-পিপাসিত যৌবনের কথা
সেই প্রাণপরিপূর্ণ মরণ অনল,
মনে পোড়ে হাসি আসে, চোখে আসে জল ॥

একটা কথা লক্ষ্য কোরো, যেখানে "সেই" সর্ব্বনাম শব্দের পুনরুক্তি আছে সেখানে "কমা"র প্রয়োজন বোধ করি নি।

কিন্তু সাধারণ পাঠকের প্রতিনিধিস্বরূপ হয়ে তুমি যদি আধুনিক চিহ্নগুলো ব্যবহার করো আমি নালিশ করব না—কেবল বিস্ময়চিহ্ন নৈব নৈবচ। এই সঙ্গে বলে রাখি উক্ত কবিতা থেকে "কমা"-গুলোকে যদি আগাগোড়াই উপড়িয়ে ফেলো তাহলেও ক্ষতি হয় না।

চিহ্নের উপর বেশি নির্ভর যদি না করি তবে ভাষা সম্বন্ধে অনেকটা সতর্ক হতে হয়। মনে করো কথাটা এই :—"তুমি যে **বাবুয়ানা** সুরু করেচ।" এখানে বাবুয়ানার উপর ঠেস দিলে কথাটা প্রশ্নসূচক হয়—ওটা একটা ভাঙা প্রশ্ন—পূরিয়ে দিলে দাঁড়ায় এই, "তুমি যে বাবুয়ানা সুরু করেচ তার মানেটা কি বল দেখি।" "যে" অব্যয় পদের পরে ঠেস দিলে বিস্ময় প্রকাশ পায়। "তুমি **যে** বাবুয়ানা সুরু করেচ।" প্রথমটাতে প্রশ্ন এবং দ্বিতীয়টাতে বিস্ময়চিহ্ন দিয়ে কাজ সারা যায়। কিন্তু যদি চিহ্ন দুটো না থাকে তাহলে ভাষাটাকেই নিঃসন্দিগ্ধ করে তুলতে হয়। তাহলে বিস্ময়সূচক বাক্যটাকে শুধরিয়ে বলতে হয়—"যে-বাবুয়ানা তুমি সুরু করেচ।"

এইখানে আর একটা আলোচ্য কথা আছে। প্রশ্ন-সূচক অব্যয় "কি" এবং সর্ব্বনাম "কি" উভয়ের কি এক বানান থাকা উচিত। আমার মতে বানানের ভেদ থাকা আবশ্যক। একটাতে হ্রস্ব ই ও অন্যটাতে দীর্ঘ ঈ দিলে উভয়ের ভিন্ন জাতি এবং ভিন্ন অর্থ বোঝবার

সুবিধা হয়। "তুমি কি রাঁধচ" "তুমি কী রাঁধচ"—বলা বাহুল্য এদুটো বাক্যের ব্যঞ্জনা স্বতন্ত্র। তুমি রাঁধচ কিনা, এবং তুমি কোন্ জিনিষ রাঁধচ, এ দুটো প্রশ্ন একই নয়, অথচ এক বানানে দুই প্রয়োজন সারতে গেলে বানানের খরচ বাঁচিয়ে প্রয়োজনের বিঘ্ন ঘটানো হবে। যদি দুই "কি"-এর জন্যে দুই ইকারের বরাদ্দ করতে নিতান্তই নারাজ থাকো তাহলে হাইফেন্ ছাড়া উপায় নেই। দৃষ্টান্ত :—"তুমি-কি রাঁধ্চ" এবং "তুমি কি-রাঁধ্চ।" এই পর্য্যন্ত থাক্। ইতি ৫ নবেম্বর, ১৯৩১।

* * * * * *

শ্রীজীবনময় রায়

কল্যাণীয়েষু

আমার প্রুফ-সংশোধনপ্রণালী দেখলেই বুঝতে পারবে আমি নিরঞ্জনের উপাসক—চিহ্নের অকারণ উৎপাত সইতে পারিনে। প্রশান্ত যাকে ইলেক্ বলে (কোন্ ভাষা থেকে পেলে জানিনে) তার ঔদ্ধত্য হাস্যকর অথচ দুঃসহ। অসমাপিকা ক'রে ব'লে প্রভৃতিতে দরকার হতে পারে কিন্তু "হেসে" "কেঁদে"-তে একেবারেই দরকার নেই। "করেছে বলেছে"-তে ইলেক চড়িয়ে পাঠকের চোখে খোঁচা দিয়ে কী পুণ্য অর্জ্জন করবে জানিনে। করবে চলবে প্রভৃতি স্বতঃসম্পূর্ণ শব্দগুলো কী অপরাধ করেছে যে ইলেককে শিরোধার্য্য করতে তারা বাধ্য হবে। "যার"—"তার" উপর ইলেক চড়াওনি বলে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। পাছে হল এবং হ'ল শব্দে অর্থ নিয়ে ফৌজদারী হয় সেজন্যে ইলেকের বাঁকা বুড়ো আঙুল না দেখিয়ে অকপটচিত্তে হোলো লিখতে দোষ কী। এ ক্ষেত্রে ঐ ইলেকের ইসারাটার কী মানে তা সকলের তো জানা নেই। হোলো শব্দে দুটো ওকার ধ্বনি আছে—এক ইলেক কি ঐ দুটো অবলাকেই অন্তঃপুরে অবগুণ্ঠিত করেচেন। হতে ক্রিয়াপদ যে-অর্থ স্বভাবতই বহন করে তা ছাড়া আর কোনো অর্থ তারপরে আরোপ করা বঙ্গভাষায় সম্ভব কি না জানিনে অথচ ঐ ভালোমানুষকে দাগীরূপে চিহ্নিত করা ওর কোন্ নিয়তির নির্দ্দেশে। স্তম্ভপরে পালঙ্কপরে প্রভৃতি শব্দ কানে শোনবার সময় কোনো বাঙালীর ছেলে ইলেকের অভাবে বিপন্ন হয় না, পড়বার সময়েও স্তম্ভ পালঙ্ক প্রভৃতি শব্দকে দিন মুহূর্ত্ত প্রভৃতি কালার্থক শব্দ বলে কোনো প্রকৃতিস্থ লোকের ভুল করবার আশঙ্কা নেই। "চলবার" "বলবার" "মরবার" "ধরবার" শব্দগুলি বিকল্পে দ্বিতীয়

কোনো অর্থ নিয়ে কারবার করে না তবু তাদের সাধুত্ব রক্ষার জন্যে ল্যাজগুটোনো ফোঁটার ছাপ কেন। তোমার প্রুফে দেখলুম "হয়ে" শব্দটা বিনা চিহ্নে সমাজে চলে গেল অথচ "ল'য়ে" কথাটাকে ইলেক দিয়ে লজ্জিত করেছ। পাছে সঙ্গীতের লয় শব্দটার সঙ্গে ওর অধিকার-ভেদ নিয়ে মামলা বাধে এই জন্যে। কিন্তু সে রকম সুদূর সম্ভাবনা আছে কি। লাখে যদি একটা সম্ভাবনা থাকে তারি জন্যে হাজার হাজার নিরপরাধকে দাগা দেবে। কোন্ জায়গায় এ রকম বিপদ ঘট্‌তে পারে তার নমুনা আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো। যেখানে যুক্ত ক্রিয়াপদে অসমাপিকা থাকে সেখানে তার অসমাপ্তি সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা থাকতে পারে না। যেমন, বলে ফেল, করে দাও ইত্যাদি। অবশ্য করে দাও মানে হাতে দাও হতেও পারে কিন্তু সমগ্র বাক্যের যোগে সে রকম অর্থদ্বৈত হয় না—যেমন কাজ করে দাও। "বলে ফেল" কথাটাকে খণ্ডিত করে দেখলে আর একটা মানে কল্পনা করা যায়, যথা, কেউ একজন বলে, "ফেল"। কিন্তু আমরা তো সব প্রথমভাগ বর্ণপরিচয়ের টুক্‌রো কথার ব্যবসায়ী নই। "তুমি বলে যাও" কথাটা স্বতই স্পষ্ট, কেবল দুর্দ্দৈবক্রমে, তুমি বল্ নাচে যাও এমন মানে হতেও পারে সেই ক্বচিৎ দুর্যোগ এড়াবার জন্যে eternal punishment কি দয়া কিম্বা ন্যায়ের পরিচায়ক। "দেবতা নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলেন"—সমস্ত বাংলা দেশে যত পাঠশালায় যত ছেলে আছে পরীক্ষা করে দেখ একজনেরও ইলেকের দরকার হয় কি না, তবে কেন তুমি না-হক্ মুদ্রাকরকে পীড়িত করলে। তোমার প্রুফে তুমি ক্ষুদে ক্ষুদে চিহ্নের ঝাঁকে আমার কাব্যকে এমনি আচ্ছন্ন করেছ যে তাদের জন্য মশারি ফেলতে ইচ্ছে হয়। আমার প্রুফে আমি এর একটাও ব্যবহার করিনি—কেননা জানি বুঝতে কাণাকড়ি পরিমাণও বাধে না। জানি আমার বইয়ে নানা বানানে চিহ্নপ্রয়োগের নানা বৈচিত্র্য ঘটেচে—তা নিয়েও আমি মাথা বকাইনে—যেখানে দেখি অর্থবোধে বিপত্তি ঘটে সেখানে ছাড়া এইদিকে আমি দৃকপাতও করিনে। প্রুফে যত অনাবশ্যক সংশোধন বাড়াবে ভুলের সম্ভাবনা ততই বাড়বে—সময় নষ্ট হবে, তার বদলে লাভ কিছুই হবেনা। ততো যতো শব্দে ওকার নিতান্ত অসঙ্গত। মতো সম্বন্ধে অন্য ব্যবস্থা। মোটের উপর আমার বক্তব্য এই পাঠককে গোড়াতেই পাগল নির্ব্বোধ কিম্বা আহেলাবেলাতি বলে ধরে নিয়ো না—যেখানে তাদের ভুল করবার কোনো সম্ভাবনা নেই সেখানে কেবলি তাদের চোখে আঙুল দিয়ো না—চাণক্যের মতো চিহ্নের কুশাঙ্কুরগুলো উৎপাটিত কোরো তাহলে বানানভীরু শিশুদের যিনি বিধাতা তাঁর আশীর্ব্বাদ লাভ করবে।

আমি যে নির্ব্বিচারে চিহ্নসূয়যজ্ঞের জনমেজয়গিরি করতে বসেচি তা মনে কোরো না। কোনো কোনো স্থলে হাইফেন চিহ্নটার প্রয়োজন স্বীকার করি। অব্যয় "যে" এবং সর্ব্বনাম "যে" শব্দের প্রয়োগভেদ বোঝাবার জন্যে আমি হাইফেনের শরণাপন্ন হই। "তুমি যে **কাজে** লেগেছ" বল্‌তে বোঝায় তুমি অকর্ম্মণ্য নও, এখানে "যে" অব্যয়। "তুমি **যে** কাজে লেগেছ" এখানে কাজকে নির্দ্দিষ্ট করবার জন্য "যে" সর্ব্বনাম বিশেষণ। প্রথম "যে" শব্দে হাইফেন দিয়ে "তুমি"-র সঙ্গে ও দ্বিতীয় "যে"-কে "কাজ" শব্দের সঙ্গে যুক্ত করলে অর্থ স্পষ্ট হয়। অন্যত্র দেখ,—"তিনি বললেন যে **আপিসে** যাও, সেখানে ডাক পড়েচে।" এখানে "যে" অব্যয়। অথবা তিনি বল্‌লেন "**যে** আপিসে যাও সেখানে ডাক পড়েচে।" এখানে "যে" সর্ব্বনাম, আপিসের বিশেষণ। হাইফেন চিহ্নে অর্থভেদ স্পষ্ট করা যায়। যথা, "তিনি বল্‌লেন-যে আপিসে যাও, সেখানে ডাক পড়েচে।" এবং "তিনি বল্‌লেন যে-আপিসে যাও সেখানে ডাক পড়েচে।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কোনো অর্থ নিয়ে কারবার করে না তবু তাদের সাধুত্ব রক্ষার জন্যে ল্যাজগুটোনো ফোঁটার ছাপ কেন। তোমার প্রুফে দেখলুম "হয়ে" শব্দটা বিনা চিহ্নে সমাজে চলে গেল অথচ "ল'য়ে" কথাটাকে ইলেক দিয়ে লজ্জিত করেছ। পাছে সঙ্গীতের লয় শব্দটার সঙ্গে ওর অধিকার-ভেদ নিয়ে মামলা বাধে এই জন্যে। কিন্তু সে রকম সুদূর সম্ভাবনা আছে কি। লাখে যদি একটা সম্ভাবনা থাকে তারি জন্যে হাজার হাজার নিরপরাধকে দাগা দেবে। কোন্ জায়গায় এ রকম বিপদ ঘট্‌তে পারে তার নমুনা আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো। যেখানে যুক্ত ক্রিয়াপদে অসমাপিকা থাকে সেখানে তার অসমাপ্তি সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা থাকতে পারে না। যেমন, বলে ফেল, করে দাও ইত্যাদি। অবশ্য করে দাও মানে হাতে দাও হতেও পারে কিন্তু সমগ্র বাক্যের যোগে সে রকম অর্থদ্বৈত হয় না—যেমন কাজ করে দাও। "বলে ফেল" কথাটাকে খণ্ডিত করে দেখলে আর একটা মানে কল্পনা করা যায়, যথা, কেউ একজন বলে, "ফেল"। কিন্তু আমরা তো সব প্রথমভাগ বর্ণপরিচয়ের টুকরো কথার ব্যবসায়ী নই। "তুমি বলে যাও" কথাটা স্বতই স্পষ্ট, কেবল দুর্দ্দৈবক্রমে, তুমি বল্ নাচে যাও এমন মানে হতেও পারে সেই কচিৎ দুর্য্যোগ এড়াবার জন্যে eternal punishment কি দয়া কিম্বা ন্যায়ের পরিচায়ক। "দেবতা নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলেন"—সমস্ত বাংলা দেশে যত পাঠশালায় যত ছেলে আছে পরীক্ষা করে দেখ একজনেরও ইলেকের দরকার হয় কি না, তবে কেন তুমি না-হক্ মুদ্রাকরকে পীড়িত করলে। তোমার প্রুফে তুমি ক্ষুদে ক্ষুদে চিহ্নের ঝাঁকে আমার কাব্যকে এমনি আচ্ছন্ন করেছ যে তাদের জন্য মশারি ফেলতে ইচ্ছে হয়। আমার প্রুফে আমি এর একটাও ব্যবহার করিনি—কেননা জানি বুঝতে কাণাকড়ি পরিমাণও বাধে না। জানি আমার বইয়ে নানা বানানে চিহ্নপ্রয়োগের নানা বৈচিত্র্য ঘটেচে—তা নিয়েও আমি মাথা বকাইনে—যেখানে দেখি অর্থবোধে বিপত্তি ঘটে সেখানে ছাড়া এইদিকে আমি দৃকপাতও করিনে। প্রুফে যত অনাবশ্যক সংশোধন বাড়াবে ভুলের সম্ভাবনা ততই বাড়বে—সময় নষ্ট হবে, তার বদলে লাভ কিছুই হবেনা। ততো যতো শব্দে ওকার নিতান্ত অসঙ্গত। মতো সম্বন্ধে অন্য ব্যবস্থা। মোটের উপর আমার বক্তব্য এই পাঠককে গোড়াতেই পাগল নির্ব্বোধ কিম্বা আহেলাবেলাতি বলে ধরে নিয়ো না—যেখানে তাদের ভুল করবার কোনো সম্ভাবনা নেই সেখানে কেবলি তাদের চোখে আঙুল দিয়ো না—চাণক্যের মতো চিহ্নের কুশাঙ্কুরগুলো উৎপাটিত কোরো তাহলে বানানভীরু শিশুদের যিনি বিধাতা তাঁর আশীর্ব্বাদ লাভ করবে।

আমি যে নির্ব্বিচারে চিহ্নস্থূয়যজ্ঞের জনমেজয়গিরি করতে বসেচি তা মনে কোরো না। কোনো কোনো স্থলে হাইফেন চিহ্নটার প্রয়োজন স্বীকার করি। অব্যয় "যে" এবং সর্ব্বনাম "যে" শব্দের প্রয়োগভেদ বোঝাবার জন্যে আমি হাইফেনের শরণাপন্ন হই। "তুমি যে **কাজে** লেগেছ" বল্‌তে বোঝায় তুমি অকর্ম্মণ্য নও, এখানে "যে" অব্যয়। "তুমি **যে** কাজে লেগেছ" এখানে কাজকে নির্দ্দিষ্ট করবার জন্য "যে" সর্ব্বনাম বিশেষণ। প্রথম "যে" শব্দে হাইফেন দিয়ে "তুমি"-র সঙ্গে ও দ্বিতীয় "যে"-কে "কাজ" শব্দের সঙ্গে যুক্ত করলে অর্থ স্পষ্ট হয়। অন্যত্র দেখ,—"তিনি বললেন যে **আপিসে** যাও, সেখানে ডাক পড়েচে।" এখানে "যে" অব্যয়। অথবা তিনি বল্‌লেন "**যে** আপিসে যাও সেখানে ডাক পড়েচে।" এখানে "যে" সর্ব্বনাম, আপিসের বিশেষণ। হাইফেন চিহ্নে অর্থভেদ স্পষ্ট করা যায়। যথা, "তিনি বল্‌লেন-যে আপিসে যাও, সেখানে ডাক পড়েচে।" এবং "তিনি বল্‌লেন যে-আপিসে যাও সেখানে ডাক পড়েচে।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ইস্কুলের বিদ্যা শেষ ক'রে ১৮৯০সালে বাগ্‌দেবীর মন্দিরের তোরণে ধরনা দিতে কলকাতায় এলাম। পাঠককে গোড়াতেই ব'লে রাখা ভাল যে বিদ্যা বেশী সঞ্চয় হলনা শেষ পর্য্যন্ত, কিন্তু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল অনেক। যাহোক, আমার সুবুদ্ধি দুর্ব্বুদ্ধির জন্য বাণীমন্দিরকে দায়ী করলে অন্যায় হবে। মানুষের যে বিষয় সম্পত্তি থাকে তার কতক উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আর কতক স্বোপার্জ্জিত। আমার কলকাতার কীর্ত্তি সম্পূর্ণ স্বোপার্জ্জিত। একটা কথা হয়ত আগে বলি নেই যে আমার জন্মের সময় সনাতন প্রথামত এক জন্ম-পত্রিকা তৈয়ার হয়েছিল। তার ফলাফল সম্বন্ধে কখনও কুতূহল হয় নেই কিন্তু শুনেছি যে মোটামুটি তার ডিক্রী এই রকম যে বুধ আর বৃহস্পতি আমায় নিয়ে সারা জীবন টানা হেঁচড়া করবে। কলকাতায় যে এলাম তার কারণ বুধের চাঞ্চল্য না বৃহস্পতির জ্ঞানপিপাসা তা আজও ঠিক করতে পারিনি। যাহোক, ১৮৯০সালে বাড়ী ছেড়ে এই আমার প্রথম পাড়ি। কলকাতার ছবছরের জীবনকে ওয়েসিসের সঙ্গে তুলনা করতে পারলাম না, কারণ আমার বাকী জীবনটা মোটেই মরুভূমি নয়। জীবনটাকে মোটামুটি রসময় ব'লে পেয়েছি। রসময় বল্‌তে তো নানা রস বোঝায়, আমার কলিকাতার জীবন তারই একটা রকমারী।

খুব সঙ্গোপনে একটা কথা পাঠকের কাছে জানাচ্ছি যে আমার এই সময়টা সম্বন্ধে নানা মিথ্যা কথা বলতে হবে। তার প্রথম কারণ যে বন্ধুবান্ধবরা অনেকেই সাংসারিক হিসেবে এত উঁচু জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছেন যে তাঁদের বাল্যজীবনের কতকটা অলৌকিকত্ব না দেখাতে পারলে সাজন্ত হবেনা; কাজেই দরকার হলে দুচারটে ঘটনা ঠাকুমার ঝুলি থেকে বের করব। দ্বিতীয় কারণ, ব্রহ্মচর্য্য সুরু করতে না করতেই আমার গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ ঘটল, অর্থাৎ কলেজে পড়তে পড়তেই কলকাতা আমার শ্বশুরবাড়ী হল। এখন আমি যদি বলি কলকাতায় বারমাস কোকিল ডাকে না, গঙ্গার জল উজান বয় না, ষ্টীমারের বাঁশী ছাড়া কোন বাঁশী বাজেনা, তাহলে কি সেটা ভাল দেখাবে? এই সব পাঁচরকম কারণে আমার জীবনের এই অংশটায় একটু বেশী ক'রে কল্পনার রঙ্গ চড়াতে আমি বাধ্য।

কলেজ খোলবার আগে লম্বা ছুটিটা এবার দেশে কাটিয়েছিলাম। আগে জানিয়েছি যে তখন আমার মনে একটা বেশ বড় রকম টিকি গজিয়ে-

ছিল। সেই টিকির জন্যই এবার দেশে এই আড়াই মাস কাল এত ভাল লেগেছিল। সব ভাল লেগেছিল, এমন কি গ্রামের দলাদলি পর্য্যন্ত। গাঁয়ে এক ওলাইচণ্ডীতলা ছিল। সেখানে নানারকম কাণ্ড হত যার আজ কোন অর্থই বুঝতে পারি না। তখন কিন্তু তার প্রত্যেক খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত জানতাম, আর তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতাম। পূর্ব্বপুরুষদের বসান ভগ্নপ্রায় মন্দিরগুলোর ক্রিয়াকর্ম্ম খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতাম। ভালও লাগত। কিন্তু এত সাত্বিকভাব সত্বেও বন্দুকের ঝোঁক ছাড়তে পারি নেই। একদিন আমরা দুতিনজন গোটাকয়েক কাঁদাখোঁচা মেরে কাছের এক গ্রামের ভেতর দিয়ে আসছি। দুই বৃদ্ধা জল নিয়ে যাচ্ছিলেন। একজন, আর একজনকে জিজ্ঞেস করলেন "এরা কারা লো।" তিনি চুপিচুপি কি জবাব দিলেন। তখন প্রথম বৃদ্ধা বেশ চেঁচিয়ে বার দুই বললেন, "দেখ সে লো দেখ সে, কালীরায়ের ছেলেগুলো পাখমারা হয়েছে।" আমরা পাখীগুলো সেখানেই ফেলে দিয়ে মানে মানে চম্পট দিলাম। তামসিক আহারের হাত থেকে সেদিন নিষ্কৃতি পেলাম। এই একবার মাত্র ধরা পড়েছিলাম, তা নইলে রায়মহাশয়ের ছেলেদের বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে দেবদ্বিজে ভক্তির অপূর্ব্ব সংযোগ দেখে গ্রামের ভদ্রমণ্ডলী চমৎকৃত হয়েছিলেন। ছেলেরা এখন বললে বিশ্বাস করবেনা যে পূরো আড়াই মাস সনাতন ধর্ম্মানুমোদিত খাদ্য খেয়েই কাটিয়েছিলাম। কিন্তু বৃথা প্রয়াস। দেশের অবনতি বন্ধ হলনা। কয়েক বছর পরে আমার ভ্রাতা যখন গ্রামে যেতেন তখন পাঁউরুটি কেক বাবত অনেক খরচ হত। হপ্তায় একদিন করে আমাদের গ্রামে হাট বসত। মহা উৎসাহে আমরা দরোয়ানের সঙ্গে তোলা আদায় করতে যেতাম। যতদূর মনে আছে আদায় বেশ জোরেই করতাম। আদায় ব্যাপারটা সনাতন ধর্ম্মসঙ্গত কিনা, তাই আগ্রহের অভাব হতনা।

একদিন রাজেন্দ্রবাবু নামে এক ভদ্রলোক এলেন। তিনি আমাদের দূর কুটুম্ব। পরে ফকীর রাজেন্দ্রনাথ ও ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী নামে খ্যাত হয়েছিলেন। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে তিনি এক বক্তৃতা দিলেন। দশভূজা মূর্ত্তি আর সন্ধি-পূজার বলি সম্বন্ধে এমন আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা করলেন যে গাঁয়ের লোক মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। আমাদের কিন্তু খুব ভাল লেগেছিল। সনাতন ধর্ম্মের আর বর্ত্তমান বিজ্ঞানের অদ্ভুত সমন্বয়—জগাখিচুড়ী—ব'লে। তর্কচূড়ামণির বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা আগেই শোনা অভ্যাস ছিল।

আষাঢ় মাস পড়তে না পড়তে ভীষণ বৃষ্টি নামল। দামোদরে বান এল। দেখতে দেখতে চারিদিক জলে জলময় হয়ে গেল। জল মরবার

আগেই ছুটি শেষ হল। কিন্তু নিরুপায়, ভেলায় চ'ড়ে ত আর সাগর পার হওয়া যায়না। সেজন্য মনে কিন্তু ক্ষোভ রইল না। আমার কোষ্ঠীর বৃহস্পতির ফলাফল দিন কয়েক মুলতুবী রইল মাত্র। ইতিমধ্যে বুধকে সহায় ক'রে ডিঙ্গীতে আর ভেলায় চেপে চতুর্দ্দিক তোলপাড় করতে লাগলাম। পাড়াগেঁয়ে ছেলে হলেও দিনে দশবার ঘোলা বেনো জলে ডুব দেওয়া অভ্যাস ছিল না। সইল না। কলকাতায় এসে দশদিন ডাক্তারবাবু কুইনিন হস্তে মেলেরিয়ার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ ক'রে কোনও রকমে খাড়া করলেন। কুইনিনের প্রভাবে মেঠো রঙ্গটা গেল। একটা কাঞ্চনবর্ণ আভা মুখে দেখা দিলে। তখন সাহস ক'রে শহুরে কলেজে ঢুকতে পারলাম।

যে কেলাসে ঢুকলাম সেটার একমাত্র বর্ণনা হতে পারে—হরিঘোষের গোয়াল। লেক্‌চার হত কিন্তু শোনা যেত না। দুয়েকদিনেই বুঝতে পারলাম যে যদি কিছু বিদ্যা শিক্ষা করতে পারি ত সে ওখানে হবেনা, অন্যত্র। কিছুদিন পরে কেলাসটা দুভাগ হয়ে গেল। মোটামুটি একটা ভাগে হেয়ার ইস্কুল হিন্দু ইস্কুলের মার্জ্জিতরুচি ছেলেরা গেল, আর অন্যটায় আমরা শ' খানেক জঙ্গলী অর্থাৎ বাঙ্গাল, রেঢ়ো, মুসলমান গেলাম। কিন্তু এই সেক্‌শান্ ভাগা হওয়ার আগের একটা ঘটনা বলি।

তখনকার দিনে প্রেসিডেন্সী কলেজে বাঙ্গালী মাষ্টার খুব কমই ছিলেন। তাঁদেরই একজনের কেলাসে কার্ত্তিকপুজোর দিন টেবিলের উপর ঠাকুর এনে রাখা স্থির হল। আমার অত্যন্ত লজ্জা হওয়া উচিত একথা স্বীকার করতে যে আমি ঐ ব্যাপারে সামিল ছিলাম, তবে চুনোপুঁটিরূপে। ধুরন্ধর যাঁরা ছিলেন তাঁদের একজন আজ নেই, আর একজন এখন যোগাভ্যাস করেন। মাষ্টার মশায় টেবিলাধিষ্ঠিত দেবসেনানীকে দেখে প্রথমটা রেগে কথা কইতে পারলেন না। দুই এক মিনিট চুপ ক'রে থেকে তারপর বজ্রগম্ভীরস্বরে হাঁকলেন, "তোমাদের ব'লে দিচ্ছি যে আমি অপরাধীকে খুঁজে বের করবই, আর রাষ্টিকেট করাব।" এই না ব'লে, তিনি ঘুরে ঘুরে আমাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কিছু জান?' আমাদের দিকের প্রায় সত্তর আশীজন নির্ভীক বীরের মত বললাম, "না স্যার, আমরা কিছুই জানিনা।" তখন মাষ্টারমশাই আমাদের দিকে পেছন ক'রে অন্য দিকের ছেলেদের জিজ্ঞেস পড়া করতে লাগলেন। তাদেরও কয়েকজন 'না' বলার পরে যার কাছে মাষ্টারমশায় পৌঁছলেন তিনি অপেক্ষাকৃত বয়স্থ, মুখে ছোট্ট ছাগলদাড়ী, ঢাকা জেলায় বাড়ী, ধর্ম্মে ব্রাহ্ম। আমাদের সেকালের ব্রাহ্মরা মিথ্যাকথা কইতেন না। অতএব এই ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠে, একটু বুক ফুলিয়ে বললেন, "আমি জানি, স্যার।" ব'লে

বোধ হয় নাম প্রকাশ করতে যাচ্ছিলেন, ইতিমধ্যে একটা অঘটন ঘটল। আমাদের ষড়যন্ত্রের একজন নেতা তাঁর কলমকাটা ছুরির ফলাটা খুলে একটু নাটুকে ভাবে সেটা ছোরার মত ভাঁজতে লাগলেন। দাড়ীওয়ালা ভদ্রলোকটী ছুরি দেখবামাত্র মুখব্যাদন ক'রে ধপ্ ক'রে ব'সে পড়লেন। জগতে আবার সত্যের নিগ্রহ, মিথ্যার জয় হল। জলখাবার ঘরের উড়িয়া বেয়ারাটার একটাকা জরিমানা হল। আমরা সেটা গোপনে দিয়ে দিলাম।

এ সব গল্পগুলো বলার একমাত্র উদ্দেশ্য এই দেখান যে ছেলেমানুষ চিরদিনই ছেলেমানুষ। একটা বে-পরোয়া ভাব, একটা চাঞ্চল্য, তার নিজস্ব। অনেক বৃদ্ধের মুখে শুনি যে সেকালে আমরা গোপালের মত সুবোধ বালক ছিলাম, আর আজকালকার ছোকরারা হয়েছে কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত বর্ব্বর। এটা নিছক রূপকথা। গোপালের দল আজও বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজমান। তবে তাদের হাতে বঙ্গমাতার দুঃখ কতটা ঘুচবে তাতে আমার ঘোর সন্দেহ। মা পথ চেয়ে রয়েছেন লর্ড ক্লাইবের মত সোনার চাঁদদের জন্য।

আমরা যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে ঢুকি তখন আমাদের বড় সাহেব ছিলেন খ্যাতনামা মিষ্টার টনী। তাঁর ছাত্রেরা শিক্ষক হিসাবে তাঁর খুব প্রশংসা করতেন। আমার নিজের তাঁর কাছে পড়বার সৌভাগ্য হয় নেই। তবে বড় সাহেব ব'লে তাঁর সংস্রবে আসতে হয়েছিল। তিনি আর পাঁচজন বড় সাহেবের মতই দুরধিগম্য ছিলেন। মোটের উপর কলেজটা বড় সাহেব, মেজ সাহেব, ছোট সাহেব, বড় বাবু, মেজ বাবু, ছোট বাবু অধিষ্ঠিত একটা প্রকাণ্ড সরকারী আফিসের মত ছিল। এঁদের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সম্পর্ক কিছুই ছিলনা। টনী মহাশয়কে বার দুই দেখেছিলাম ব'লে মনে আছে। একবার যখন তিনি আমাদের কেলাস শুদ্ধ বিনা দোষে জরিমানা করতে আসেন, আর একবার যখন সেই জরিমানা প্রত্যাহার করাবার জন্য তাঁর খাস কামরায় যেতে হয়েছিল। এই সাহেবের শেষ বয়সের কীর্ত্তি যে তিনি বিলেতে প্রকাশ্য সভায় সমস্ত বাঙ্গালী জাতটাকে মিথ্যাবাদী—monumental liars—বলেছিলেন। কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।

ঢাকার ছেলেদের কাছে ঢাকা কলেজে শিক্ষক ছাত্রের একসঙ্গে খেলাধূলোর গল্প শুনে আমাদের বিশ্বাস করা শক্ত হত। কারণ আমাদের খেলার ক্লাবে সাহেব বা বাঙ্গালী অধ্যাপক একদিনও কেউ খেলতে আসেন নেই। কলেজের বাঙ্গালী মাষ্টাররা সর্ব্বরকমে ইংরেজদের নকল করতেন। আমাদের সঙ্গে যদি কখনও বারান্দায় লাইব্রেরীতে কথা কইতে হত তা ইংরেজীতেই কইতেন। ধুতি প'রে কোন অধ্যাপকই কলেজে আসতেন না—পণ্ডিত মশায়রাও নয়।

এই স্মৃত্রে বেশভূষার কথা একটু বললে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ধুতির তখন বড় দুর্দ্দিন। সাহেবদের অবজ্ঞা, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, ত ছিলই। তাছাড়া সহরের নানাস্থানে ধুতি প'রে প্রবেশ নিষেধ ছিল। দুটো একটা জায়গার নাম করি। ইডেন গার্ডেনের গঙ্গার দিকটায় অনেকখানা জায়গা প্যান্টুলুন-ওয়ালাদের জন্য দড়ি দিয়ে ঘেরা থাকত। ঘোড়দৌড়ের মাঠে জুয়ো খেলতে গেলেও ধুতি-পরিহিত লোকের অনেক বাধা বিপত্তি ছিল। আপিস সভা সমিতির ত কথাই নেই। এই সবে আমাদের নিজেদের মনেও ধারণা জন্মে গেছল যে কোনও সভ্যভব্য স্থানে যেতে হলে একটা ইজার চড়ানই চাই। বিদ্যাসাগর মশায় অবশ্য কখনও ইজার পরেন নেই। কিন্তু ডাক্তার মহেন্দ্রলাল, যিনি সর্ব্বত্র ধুতি প'রে ঘুরতেন, তিনিও টাউন হলের সভায় যেতে হলে একটা চাপকান চোগা প'রে নিতেন। কলেজের ছেলেদের বেশভূষার কথা একটু বলি। নানারকমের পিরান, পাঞ্জাবী ও মের্জ্জাই তখনও হয় নেই। আমরা গৃহস্থ ঘরের ছেলেরা ধুতির সঙ্গে হয় কামিজ পরতাম, নয় খাটো গলাবন্ধ কোর্ত্তা। তবে গায়ে একটা চাদর সর্ব্বদাই থাকত। পায়ে অধিকাংশ ছেলেই ফিতে বাঁধা কালো জুতো পরত। নাগরা হিন্দুস্থানীদের একচেটে ছিল। আর মাদ্রাজী চটি মাদ্রাজীদের। বড়লোকের মধ্যে বিদ্যাসাগর মশায় পরতেন ঠনঠনের চটি, মহেন্দ্রবাবু পরতেন তালতলা। আমাদের চটি প'রে নগর পরিভ্রমণ রেওয়াজ ছিল না। এই ত হল সাধারণ পোষাক। তবে ধনীলোকের ছেলেদের কি সাহেববাড়ীর ছেলেদের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র ছিল। তখন জাতিভেদ প্রবল, আজই সব একাকার হয়ে গেছে।

কলেজে উঠে প্রথম বছরে বাবার হুকুমে জিনের ইজার ও গলাবন্ধ কোর্ত্তা প'রে যেতে হত। অনেকেরই এই সাজ ছিল। তাই বিশেষ খারাপ লাগত না। কিন্তু একদিন এক বিভ্রাট হল। শিয়ালদহ ষ্টেশনে গেছি ঐ বেশে। গাড়ীর অপেক্ষায় প্ল্যাটফর্মে বেড়াচ্ছি, এমন সময় এক সাহেব আমায় টিকিটবাবু মনে ক'রে ট্রেণ সম্বন্ধে নানাকথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। সাহেবকে ত কোন রকমে ভাগালাম, কিন্তু মনে বড় দুঃখ হল। দূর হোক্‌গে, আর কখন প্যান্টুলুন পরবনা। তার পরদিন থেকে ধুতি প'রে কলেজে যেতে লাগলাম। মা এতে খুশী হলেন বলেই মনে হল। বাবার অনুমতি তিনিই আনিয়ে দিলেন। এইভাবে কিছুদিন চলল, কিন্তু যখন বি এ পাশ করলাম তখন দুতিন জোড়া কোট প্যান্টুলুন সংগ্রহ করতে হল। বড় হয়েছি, পাঁচ রকম সভাসমিতি জলসায় যেতে হবে ত! সে কোট-প্যান্টুলুন সাজও অপরূপ। মাথায় গোল টুপী গায়ে গলাবন্ধ পার্শীকলার খাটো কোর্ত্তা ও ফতুই। ভেতরে বিলেতী কামিজ, তার ছাতি

তক্তার মত শক্ত। ইজারটা পুরোপুরি ইংরেজী ফেশানের। আমার কিন্তু অদৃষ্ট খারাপ! এত সাধের সভ্য কাপড় পরেও এমন বিপদে পড়লাম যে, বিলেত রওয়ানা হওয়া পর্য্যন্ত বাকী কটা দিন ধুতি প'রেই কাটিয়ে দিতে হয়েছিল। ব্যাপারটা বলি। মিসেস বেসাণ্টের তখন খুব নাম ডাক। তিনি কলিকাতায় এলেন বক্তৃতা করতে। টাউন হলে প্রকাণ্ড সভা জমল। আমি আমার 'মিটিংকা কাপড়া' প'রে গিয়ে একেবারে সামনের সারে জাঁকিয়ে বসলাম। বক্তৃতা চলল। বক্তা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। টাউন হল্ ভরা জনতা একেবারে নিস্তব্ধ। এমন সময়, হঠাৎ মনে হল বক্তা আমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে খুব জোরে বলছেন, And you there in your English costume, let me tell you, that behind your starched shirt front there beats a Hindu heart!' "আর তুমি বিলেতী সাজে সজ্জিত বাবু, তোমাকে আমি বলি যে তোমার ঐ বর্ম্মের মত কঠিন কামিজের বুকের ভেতর যে হৃদয় লুকানো আছে সেটা হিন্দুর হৃদয়।"

আশে পাশে সকলের নজর আমার উপর পড়ল। আমার Hindu heart (হিন্দু-হৃদয়) এমন দুড় দুড় ক'রে উঠল যে আমি চুপি চুপি হল্ থেকে বেরিয়ে বাড়ী পালালাম।

আবার কলেজের কথা বলি। আমাদের রসায়নের থিয়েটার ছিল একটা আলাদা একতলা বাড়ীতে। ঘণ্টা পড়লেই, সেইদিকে শ'খানেক ছেলে ঠেলাঠেলি ক'রে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ান, আমাদের একটা নিত্যকর্ম্ম ছিল। ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাসে একদিন এই ঘোড়দৌড়ে আমি ফার্ষ্ট হয়ে কি গোল বাধিয়েছিলাম শুনুন। থিয়েটারে উঠতে হত পেছনে সরু এক কাঠের গোল সিঁড়ি দিয়ে। আমি সেই সিঁড়ি বেয়ে দুড় দুড় ক'রে যেই উপরে উঠেছি, দেখি যে তখনও সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাস চলছে। ডাক্তার রায়, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, কেলাস নিচ্ছেন। আমায় দেখেই সেকেণ্ড ইয়ারের একজন ছাত্র দাঁড়িয়ে খুব থিয়েটারী ঢঙ্গে হাত নেড়ে ব'লে উঠলেন, "ভগ্নদূত! কহ শুনি লঙ্কার সমাচার।" চারিদিকে হাসির রোল উঠল। আমি হুড়মুড় ক'রে আমার পিছনের ছেলের ঘাড়ে পড়লাম। এই ভদ্রলোক পরে একজন পেশাদার অভিনেতা হয়ে খুব নাম কিনেছিলেন। অনেক বছর বাদে একবার 'চোখের বালি' নাটক দেখতে গিয়ে তাঁকে হঠাৎ 'বিহারী'র ভূমিকায় দেখে এই পুরানো গল্প মনে প'ড়ে গিয়েছিল। ফলে প্রায় দশ মিনিট হাসি থামাতে পারি নেই। সঙ্গীদের অনেক ক'রে বোঝাতে হয়েছিল যে রবিবাবুর 'বিহারী' চরিত্রে হাস্যাস্পদ কিছু নেই।

ডাক্তার রায়ের কথা বলতে বলতে মনে হল যে propagandist zeal (প্রচার কার্য্যে উৎসাহ), সেকালেও তাঁর বড় কম ছিলনা। তবে তখনও

তিনি দেশশুদ্ধ লোককে বৈশ্যধর্ম্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা আরম্ভ করেন নেই। উৎসাহ বেশী ছিল ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারে। রসায়নের মধ্যেও তিনি মাঝে মাঝে সংস্কার-রস আবিষ্কার করতেন, আর আমাদের সেই রস বিতরণ করতেন। ছুয়েকটা নমুনা দেব। অঙ্গার (carbon) সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার সময় আমাদের শেখালেন "অঙ্গার-পরমাণুর চারহাত, তোমাদের বিষ্ণুর মত।" সাবান তৈরী করা দেখিয়ে আমাদের গ্যালারীর দিকে ফিরে হাসিমুখে বললেন, "এরই নাম সাবান, সেই মহামূল্য জিনিষ যা মেথরকে ব্রাহ্মণ করতে পারে।" আশ্চর্য্য রূপক! তবে হিন্দু ছাত্রের কেলাসে ব্রাহ্ম অধ্যাপকের এসব কথা না বলাই বোধ হয় সুশোভন হত। আমাদের কেউ কেউ একথা তাঁর কাছে নিবেদনও করেছিলেন। আচার্য্যদেব পরম পূজনীয় ব্যক্তি। তাঁর সম্বন্ধে এ গল্প করা হয়ত অমার্জ্জনীয়। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য এই দেখান যে হিন্দু আজও যেমন তখনও তেমন, "নিজ বাসভূমে পরবাসী।" নইলে, আচার্য্যদেব সেই অল্পবয়সেও দানশীল ও উন্নতমনা ছিলেন। কলেজের বাহিরে, ছাত্র সমাজের উপর তাঁর অসীম দয়া ছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথা ছাত্রদের তৃণজ্ঞান করা। তিনিও কলেজের চৌহদ্দির ভেতর তা ছাড়িয়ে উঠতে পারেন নেই।

কিছুদিনের জন্য বুথ সাহেব ব'লে আমাদের এক বিজ্ঞানের অধ্যাপক এসেছিলেন। তিনি বিশালকায় জোয়ান ছিলেন ও খুব ভাল ক্রিকেট খেলতেন। তবে আমাদের সঙ্গে কখন খেলেনও নেই, আমাদের কোনদিন খেলতে শেখানও নেই। তাঁর একটা গল্প মনে হচ্ছে, গল্পটার সঙ্গে টনী সাহেবের বাক্য—"monumental liars"-এর কিছু যোগ আছে। একদিন আমাদের কোন সহপাঠী গ্রন্থাগারে এক আলমারীর সামনে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানের বই দেখছিলেন। হঠাৎ বুথ সাহেব সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। বন্ধু তাঁকে অভিবাদন করলেন, কিন্তু সরলেন না। সাহেব তাঁর পেছনে পা ফাঁক ক'রে কলোসাসের মত খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রহিলেন, তারপর রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ডাফ্‌টারী, ডাফ্‌টারী, নিকাল দেও।" দপ্তরী আমাদের নিয়মিত বখশিশ-ভুক্ প্রাণী, সে শ্যাম রাখি কুল রাখি ভাবে বন্ধুকে স'রে যেতে মিনতি করলে। বন্ধু স'রে গেলেন কিন্তু বাহিরে এসে তাঁর ভেতরকার সুপ্ত সিংহ জেগে উঠল। বড় সাহেবের কাছে দরখাস্ত করলেন যে তাঁর সম্মানে বিষম ঘা লেগেছে। তখন বড় সাহেব ছিলেন সর্ব্বজনপ্রিয় গ্রিফিথ্‌স্ সাহেব। তিনি বুথ সাহেবের কৈফিয়ৎ চাইলেন। সাহেব বললেন তিনি বাবুকে কিছুই বলেন নাই, নিকলের (Nicoll) একখানা বই দপ্তরীর কাছে চেয়েছিলেন মাত্র। এ কৈফিয়তের টীকা অনাবশ্যক।

কিছুদিন টনী সাহেবের কথাগুলি লোকের মুখে মুখে ফিরত। একদিন রো সাহেবের কেলাসে কয়েকজন ছাত্র একসঙ্গে ছুমদাম ক'রে বই বন্ধ করাতে সাহেব বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে করেছে?' কেউ যখন কবুল করলে না, তখন তিনি একগাল হেসে বললেন "Oh! you monumental liars"! এমন মধুর হেসে কথাটা বললেন যে কেউ রাগ করলে না। আর ভেবে দেখলে, একথা বলতে মেকলে থেকে কার্জ্জন পর্য্যন্ত কোন সাহেবই বা কসুর করেছেন? এই রো সাহেব ব্যবহারে বড় অমায়িক ছিলেন। মাঝে মাঝে কেলাসে বাংলা কথারও বুকনি দিতেন। প্রশ্নের উত্তর দিতে দেরী হলে সাক্ষীগোপাল, বিধুমুখী ইত্যাদি নানা নাম ধরে ডাকতেন। কেলাসে যে সব হাসি তামাসা করতেন তা কখনও কখনও আদিরসাশ্রিত হয়ে পড়ত। এক আধটা উদাহরণ না দিলে হয়ত কেউ বিশ্বাস করবেন না। একদিন কেলাসে জিজ্ঞেস করলেন যে গ্রীক পুরাণের Graces ক'জন? উত্তর হল, চারজন। সাহেব হেসে বললেন, "চতুর্থটিকে হাজির করতে পার? তাঁরা বেশ সাজ করেন।" ব্যাপার হচ্ছে এই যে এই গ্রীক্ দেবীরা তিনজন এবং তাঁদের মূর্ত্তি দিগম্বরী। আর একদিন নানা রকম Knight-দের কথা ব'লতে ব'লতে হঠাৎ মেয়েদের Garter সম্বন্ধে যে রসাল টিপ্পনী কাটলেন তা আমার পাঠিকাদের ভয়ে এখানে ব্যক্ত করতে পারলাম না। একদিন এই সাহেব হাসি ঠাট্টার মাত্রা একটু বেশী চড়িয়ে ফেলেছিলেন; কিন্তু অন্য রকমে। ফলে মুসলমানরা (আমরাও পিছনে ছিলাম) তাঁকে মাপ চাইয়ে ছেড়েছিল। কিন্তু তিনি মাপ চেয়েছিলেন যে ভাষায় সে অতি অপরূপ। "আমার কোন পোষা জন্তুকে আমি যা কিছু নাম দিতে পারি। তোমরা মূর্খ, ইংরেজী বোঝ না।"

রো সাহেবের নাম করলেই ওয়েব্ সাহেবের নাম মনে পড়ে। এই ছুই সাহিত্যরথী, শুধু কলেজ কেন, সমগ্র বাঙ্গলাদেশকে ইংরেজী শেখাবার ভার মাথায় ক'রে নিয়েছিলেন। গালাগালও খেয়েছিলেন অনেক। তাঁদের সে বই আজ ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরীতে আশ্রয় নিয়েছে, অন্যত্র আর দেখা যায়না। এ ছাড়া ওয়েব্ সাহেব নেটিব লোকদিগকে ইংরেজী আদব কায়দা শেখাবার মতলবে এক বই লিখেছিলেন। এক সময় সরকারের সকল বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর টেবিলের উপর সে বই দেখা যেত। ওয়েব্ সাহেবের কাছে কখনও পড়ি নেই কিন্তু তাঁর আদব কায়দা সম্বন্ধে জ্ঞান কি রকম ছিল তার নমুনা পাঠককে একটা দেব। আমি বছর ছুই Dr. Atkinson ব'লে এক সাহেবের কাছে পড়তে যেতাম। সাহেব এক বড় ইংরেজী কলেজের কর্ত্তা ছিলেন। আমার সঙ্গে তিনি এমন সুন্দর ব্যবহার করতেন যেন এটা

ভারত নয়, যেন আমি বিলেতের ছাত্র। একদিন পড়ার সময় তিনি বললেন, "আজ আমাদের চা খাওয়া এখানে নয়, ওয়েব্ সাহেবের বাড়ীতে। তাঁকে চেন ত?" আমি জানালাম, "চিনি, যে রকম প্রেসিডেন্সী কলেজের শিক্ষক ছাত্রের পরিচয় হয়ে থাকে।" যথাসময় ওয়েব্ সাহেবের ওখানে চা খেতে গেলাম। সাহেব আমাকে সমস্ত সময়টা Baboo, Baboo, ক'রে কথা কইতে লাগলেন, এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে আমার ভাত ও নেটিব তরকারীর অভাবে চা খাওয়ার কষ্ট হচ্ছে না ত? আমার তখন সব কথা বোঝবার হয়ত ক্ষমতা ছিলনা, কিন্তু Dr Atkinson নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন, কেননা তিনি বেরিয়ে যাবার সময় আমায় বললেন, "I am sorry I brought you here lad" (তোমাকে এখানে না আনলেই ভাল হত)। নিজের কলেজের নিন্দা আর কত করব? এম এ কেলাসে অবস্থার অনেক উন্নতি হল। হতে পারে আমরা বড় হয়েছি ব'লে, হতে পারে হাওয়া বদলাচ্ছিল ব'লে। নিন্দা ত অনেক করলাম, কিন্তু দুজন অধ্যাপক যাঁরা অন্ততঃ আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তাঁদেরও নাম করব, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও অধ্যাপক পেড্লার। যতদূর মনে আছে এই দুজনকে সকলেই ভালবাসত। প্রেসিডেন্সী কলেজের দমবন্ধ করা হাওয়ায় না থাকতে হলে এঁদের গুণ আরও ফুটে বেরোত।

আমাদের কলেজের সভাসমিতি ও খেলার ক্লাবের কথা পরে বলব। আমাদের সময়েই এখনকার Institute, Higher Training Society নাম দিয়ে আরম্ভ হল। তার প্রথম পাণ্ডা ছিলেন আমাদের অধ্যাপক উইলসন। আমার নিজের ঘটনাচক্রে higher training (উচ্চশিক্ষা) হলনা। সোসাইটীর ঘরে তাস খেলা সঙ্গত কিনা এই নিয়ে সাহেবের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় আমাদের সোসাইটী ত্যাগ ক'রে অন্যত্র তাসের আড্ডা জমাতে হল। এই তাসের আড্ডার মেম্বার কেউ কেউ এখন ভারতের ভাগ্যবিধাতার মধ্যে গণ্য। তাঁদের নাম করলে রসভঙ্গ হবে।

এই সময়েই কলেজের Speech Day (বাৎসরিক উৎসব) সুরু হল। সেই উপলক্ষে Julius Cœsar-এর হত্যাকাণ্ড ও Merchant of Venice-এর আদালতের দৃশ্য অভিনয় হল। আমাদের উইলসন সাহেব ও Oxford Mission-এর ডগলাস সাহেব আমাদের শিক্ষক ছিলেন। অভিনয় ভালই হল, অন্ততঃ লাটসাহেব এলিয়ট তাই ব'লে গেলেন। একটা মজার কথা কেবল মনে হয়, যে সেদিন Cœsar-কে যাঁরা খুন করলেন তাঁরা অনেকেই আজ নিজেরা উচ্চ মসনদে অধিষ্ঠিত।

আর যিনি Portia হয়েছিলেন তিনি আদালতকে বহুদূরে ঠেলে রেখে আজ সরকারের আবকারী মালের হেপাজৎ করছেন। একমাত্র Antony তাঁর থিয়েটারের পার্ট কায়েম রেখেছেন। প্রিয়দর্শন Brutus-কে খুনে আসামী সেজে যা দেখিয়েছিল জজ্ সেজে তার চেয়ে অনেক ভাল দেখায়।

এলিয়ট সাহেবের নাম করতে মনে পড়ে গেল যে তিনি এক সময় বাঙ্গলাদেশে ধূম ধড়াক্কা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এই প্রদেশ থেকে জুরীর বিচার তুলে দেওয়ার জন্য কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। কিন্তু এমন হৈ চৈ উঠল, যে কিছু ক'রে উঠতে পারলেন না। এই সিভিলিয়ান লাট সাহেব শুধু যে দেশী লোকদের উত্যক্ত করেছিলেন তা নয়, ইংরেজ বড় হাকীমদেরও প্রাণ অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিলেন। এক গল্প আছে যে একবার তিনি ষ্টীমারে সফরে বেরিয়ে, ষ্টীমার খুব দূরে নোঙ্গর ক'রে ডিঙ্গী বেয়ে পাবনার সদরে উপস্থিত হলেন, আর সোজা স্থানীয় হাকীম-দের কাছারীতে চ'লে গেলেন। বড় হাকীম তখনও আসেন নেই, যদিও ১১টা বেজে গেছে। লোক পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে এনে খুব ধমকে দিলেন, মাষ্টার যেমন ইস্কুলের ছেলেকে ধমকায়। কখন কাকে অপদস্থ হতে হবে এই ভয়ে কিছুদিন হাকীমবর্গ সন্ত্রস্ত থাকতেন।

একবার এলিয়ট সাহেব কুচবেহারে এসেছিলেন। দেশী রাজ্যে লাটেরা যান প্রধানতঃ শিকার ইত্যাদি সামাজিক ব্যাপারের জন্য। কিন্তু এই সময় মহারাজের নিজের ও রাজ্যের অনেক খরচ বেড়ে গিয়েছিল ব'লে কিঞ্চিৎ ধমকে দেওয়াও বোধ হয় এলিয়ট সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল। এই সাহেবের বাঁধা বুলি ছিল, "আমি জাঁকজমক আড়ম্বর দেখতে পারি না, আমি চাই কাজ।" এঁর গুণাগুণ সম্বন্ধে বাবা সবই শুনেছিলেন আগে, প্রধানতঃ সেক্রেটারী মহল থেকে। তাই তিনি মহারাজের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক ক'রে রেখেছিলেন যে দেখাবেন, কুচবেহারেও তাঁরা efficiency-র উপাসক—কাজের লোক। স্থির হল মহারাজ ষ্টেট-কর্ম্মচারীদের নিয়ে রাজবাড়ীতেই লাট সাহেবকে স্বাগত করবেন। আর বাবা তাঁকে অভ্যর্থনা করবেন ১২ কোশ দূরে যেখানে সীমান্তে রেল থামে। যথা সময় ট্রেণ এল। ষ্টেশনে বাবা একজন মাত্র চাপরাসী নিয়ে উপস্থিত। স্বয়ং খাকী চাপকান প'রে আর এক সাদা ছাতা বগলে, আর চাপরাসীর উর্দ্দী এক আধময়লা পটুর কোট ও ধূতির উপর পট্টী। লাট সাহেব অযথা জাঁকজমকের জন্য না ধমকাতে পেয়ে বোধ হয় একটু নিরাশ হলেন। তখন প্রায় দশটা। বাহিরে দুই হাতী তৈয়ার ছিল। বাবা সাহেবকে অভিবাদনাদি ক'রে বললেন

যে তিনি যদি শ্রান্ত না হয়ে গিয়ে থাকেন ত ধরলা নদীর চর দেখিয়ে নিয়ে যাবেন, যেখানে যেখানে ছুই রাজ্যের সীমানা নিয়ে বাদানুবাদ চলছে। সাহেব তার অদম্য উৎসাহ নিয়ে সব চরগুলো দেখে বারোটার সময় ওপারে ডাকবাঙ্গলায় পৌছলেন। সেখানে মধ্যাহ্ণ-ভোজন হল। আড়ম্বর কিছু ছিল না। একজন মাত্র খানসামা খাবার পরিবেশন করলে। তারপর বাবা একটু siesta মধ্যাহ্ণ বিশ্রামের কথা তোলাতে সাহেব বললেন, "না, ও সব আলস্য আমার নেই। চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।" বাবা বললেন, "যদি আপত্তি না থাকে ত পথে আপনাকে চওড়াহাট বন্দর দেখিয়ে নিয়ে যাব, যেখানে রেলী, আপকার, এদের বড় বড় পাটের আড়ৎ আছে।" লাট সাহেব তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন।

চওড়াহাট ইত্যাদি দেখে যখন রাজধানীর প্রান্তে পৌছলেন তখন চারটে বেজে গেছে। সেখানে তোরসা নদীর পারঘাটে জঙ্গী ও পুলিশ কর্ত্তারা সাহেব বাহাদুরকে সেলামী দিলেন। তাঁদের সঙ্গে এসেছেন বালক রাজকুমার ও একজন A.D.C. (মহারাজের পার্শ্বচর)। আবার দেওয়ানজী জিজ্ঞাসা করলেন যে হুজুর সোজা রাজবাড়ী যাবেন, না পথে সেপাইদের ও সওয়ারদের লাইন (Lines) দেখে যাবেন। সাহেবের কার্য্যপিপাসা তখনও নিবৃত্ত হয় নেই। বললেন যে পথে যা দ্রষ্টব্য আছে দেখে যাবেন। কাজ শেষ ক'রে পাঁচটায় রাজবাড়ী পৌছলেন। নেমেই মহারাজকে বললেন, "আপনার রাজ্যের চমৎকার বন্দোবস্ত। সর্ব্বত্র নিয়মিত কাজকর্ম্মের হাওয়া।" মহারাজ জানতেন, একটু হাসলেন। যা হুতিন দিন এলিয়ট সাহেব কুচবেহারে রইলেন সেই একইভাবে এঁরা তাঁকে ঘোরালেন। ধুমধামও নিতান্ত মামুলী রকমের বেশী হল না। সাহেব এত আনন্দে সময় কাটালেন যে খরচ পত্রের জন্য টীকা টিপ্পনী কিছু আর করলেন না। ফেরবার আগে সাহেবের একজন কর্ম্মচারী মহারাজকে ব'লে এল, "আপনার দেওয়ানের এলিয়টের চেয়েও বেশী এলিয়টী চাল।" সেবার দার্জ্জিলিঙ্গে একাধিক সিভিলিয়ান মহারাজকে খুব তারিফ করেছিলেন এই ব'লে যে "তোমরা দেশী রাজ্যে জান কাকে কি রকমে জব্দ করতে হয়।" এলিয়ট সাহেব নিজে দার্জ্জিলিঙ্গে বাবাকে ডেকে বললেন যে নূতন বছরে তাঁকে রাজা খেতাব দেবেন। বাবা নিজের দারিদ্র্য উল্লেখ ক'রে কোন রকমে পার পেলেন। কিন্তু বর্ত্তমান লেখকের কুমার বাহাদুর হওয়া এই রকম ক'রে ফস্‌কাল।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

মুক্তের অবস্থা

গত বারের 'পরিচয়ে' মোক্ষের আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিয়াছি যে, মোক্ষ মননের বচনের বর্ণনের অতীত।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—তৈত্তি, ২।৯
'যাহার 'লাগ' না পাইয়া বাক্য মন হটিয়া আইসে।'

পুনশ্চ, মোক্ষ 'অদৃশ্য, অনাত্ম্য, অনিরুক্ত, অনিলয়ন'—কেন না, 'Nirvana is the land of silence and non-being' (*Voice of the Silence*). অতএব মোক্ষ 'অস্তি-নাস্তি'র অতীত অবস্থা। যিনি নির্ব্বাণী, তিনি 'is no-where and everywhere.'

নাহং ক্বচনি কস্সচি কিংচন তস্মিং
ন চ মম ক্বচনি কিস্মিংচি কিংচনং নত্থি।* —মজ্ঝিমনিকায়

যিনি মুক্ত পুরুষ, তিনি সমুদ্রের মতই অগাধ, অনন্ত, অপ্রমেয়। সেইজন্য একজন অভিজ্ঞ লেখক মোক্ষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

To reach Nirvana is to pass beyond humanity and to gain a level of peace and bliss far above earthly comprehension. (Man, Visible and Invisible).

মোক্ষ = ভূমানন্দ

মোক্ষ সম্বন্ধে উহাই সার কথা—a level of peace and bliss, এমন স্বস্তি ও শান্তি, যাহা মনুষ্যধারণার বহু উর্দ্ধে। সেইজন্য মুক্তিকে পরা শান্তি এবং পরম আনন্দ বলা হয়।

ঐ আনন্দের দিক্ হইতে গীতা ইহাকে 'অত্যন্ত সুখ' বলিয়াছেন—ঐ সুখ 'ব্রহ্মসংস্পর্শ'-জনিত।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তং সুখম্ অশ্নুতে—গীতা, ৬।২৮

অন্যত্র গীতা মুক্তের (ব্রহ্মযোগ-যুক্তের) সুখকে 'অক্ষয়' সুখ বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখম্ অক্ষয়ম্ অশ্নুতে—গীতা, ৫।২১

উপনিষদে মুক্তির অবস্থাকে 'ভূমা' বা 'অতিঘ্নীম্ আনন্দস্য' (বৃহ, ২।১।১৯) (acme of bliss) বলা হইয়াছে।

---

*I am not anywhere whatsoever, to any one whatsoever, in anything whatsoever; neither is anything whatsoever mine, anywhere whatsoever, in anything whatsoever.—Majjhim Nikaya,II, 263.

আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্ বিভাতি—মুণ্ডক, ২।২।৭
যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।
ভূমৈব সুখং × × যো বৈ ভূমা তদ্ অমৃতম্—ছান্দোগ্য, ৭।২৩।১-২

অর্থাৎ মোক্ষ বা অমৃতত্ব-সিদ্ধি ভূমানন্দের অবস্থা। যাজ্ঞবল্ক্য জনককে এই ভূমানন্দের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন—মনুষ্যের মধ্যে যে ব্যক্তি বিশেষ সৌভাগ্যবান্, সমৃদ্ধিমান্, সকলের অধিপতি, সর্ব্ববিধ মনুষ্য-ভোগের অধিকারী—ঐ ব্যক্তির যে আনন্দ, তাহাই মনুষ্যলোকের চরম আনন্দ।

স যো মনুষ্যাণাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবতি অন্যেষাম্ অধিপতিঃ সর্ব্বৈ র্মানুষ্যকৈ র্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ স মনুষ্যানাং পরম আনন্দঃ—বৃহ, ৪।৩।৩৩

পিতৃলোকের যে আনন্দ, সে আনন্দ ঐ আনন্দের শতগুণ; গন্ধর্ব্ব-লোকের যে আনন্দ, পিতৃলোকের আনন্দের তাহা শতগুণ; দেবলোকে কর্ম্মদেবগণের যে আনন্দ, গন্ধর্ব্বলোকের আনন্দের তাহা শত গুণ এবং আজানদেবগণের যে আনন্দ, কর্ম্মদেবগণের আনন্দের তাহা আবার শতগুণ; প্রজাপতি লোকের যে আনন্দ, আজানদেবগণের আনন্দের তাহা শতগুণ; কিন্তু ব্রহ্মলোকের যে আনন্দ, ঐ প্রজাপতি লোকের আনন্দ তাহার শতাংশের একাংশ মাত্র—

অথ যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দঃ।

ইহাই চরম আনন্দ, পরম আনন্দ—যিনি শ্রোত্রিয়, অবৃজিন, অকামহত, তাঁহার ঐ পরিমাণ আনন্দ—

যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতঃ অথ এষ এব পরম আনন্দঃ—বৃহ, ৪।৩।৩৩

অর্থাৎ নির্ব্বাণী বা জীবন্মুক্ত পুরুষের আনন্দের মাত্রা মানবীয় চরম আনন্দের দশলক্ষকোটি গুণ (billion times)। তৈত্তিরীয়-উপনিষদ্ ইহার উপর কয়েক গ্রাম চড়াইয়া বলিয়াছেন—

যুবা স্যাৎ সাধু যুবা অধ্যায়কঃ আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ স একো মানুষ আনন্দঃ—২।৮

'যুবা যদি সাধু হন, অধ্যায়ক হন, আশিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হন এবং এই সর্ব্ববিত্তপূর্ণা পৃথিবী যদি তাঁহার করতলগত হয়, তবে সেই মনুষ্য-আনন্দের চরম।'

ব্রহ্মের যে আনন্দ সে আনন্দ ঐ মনুষ্য-আনন্দের ১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ গুণ অর্থাৎ one hundred trillion times। অকামহত শ্রোত্রিয়ের অর্থাৎ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত জীবন্মুক্তের আনন্দ ঐরূপই—

স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য—তৈত্তি ২।৮

এরূপ বলার তাৎপর্য্য এই যে, মুক্তির আনন্দ মনুষ্য-মানের অতীত। সেইজন্যই ইহাকে 'ভূমানন্দ' বলা হইয়াছে।

বৌদ্ধেরাও নির্ব্বাণের প্রসঙ্গে বলেন—Bliss is Nibbana, Bliss is Nibbana (অঙ্গুত্তর-নিকায়)। ইহা শারিপুত্রের মুখের কথা। বুদ্ধদেবের নিজের বাণী আরও উদাত্ত। তিনি বলেন, মুক্ত পুরুষ পীতিসুখং অধিগচ্ছতি, অঞ্ঞং এবং চা ততো সন্ততরং (মজ্ঝিম নিকায়) অর্থাৎ নির্ব্বাণ কেবল সুখ নহে, উহা সুখোত্তর দশা। সেইজন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন—আনন্দং নন্দনাতীতম্। অন্যত্র বুদ্ধদেব পোট্টপাদকে বলিয়াছিলেন—

'Rather will all that I have mentioned happen, and then only joy, pleasure, quietude, earnest reflection, complete consciousness and *bliss* ensue.'——দীঘনিকায় IX।

এই আনন্দ যে পরম সুখ * (highest bliss), ধম্মপদে তাহার বিস্পষ্ট উল্লেখ আছে :—

নিব্বাণং পরমং সুখং—সুখবগ্গো, ৮
পস্সে চ বিপুলং সুখং—পকিণ্ণক বগ্গো, ১

মুক্তি = পরা শান্তি

মুক্তি শুধু পরম আনন্দ নহে—মুক্তি পরা শান্তি—

'that peace that passes understanding'—'an inward peace that can never be shaken, a joy that can never be ruffled' (Rhys Davids, p. 166).

তম্ আত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্—কঠ, ৫।১৩

'সেই ব্রহ্মকে যে ধীর ব্যক্তি আত্মার মধ্যে অনুভব করেন, তাঁহারই শাশ্বতী শান্তি—অপরের নহে।'

ইহাই প্রকৃত জ্ঞান—যাহার ফলে অচিরে পরা শান্তি।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিম্ অচিরেণাধিগচ্ছতি—গীতা, ৪।৩৯

* এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক রাইস ডেভিড্স্ (Professor Rhys Davids) যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য—

One might fill pages with the awestruck and ecstatic praise lavished in the writings of the early Buddhists upon the glorious *bliss* and peace of the mental condition it (Nirvana) involved. They had endless love-names for it.—Lectures on Buddhism, pp. 150-151.

গীতায় ভগবান্ ইহাকে 'শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং' বলিয়াছেন (৬।১৫)। হংস-উপনিষদের বর্ণনায় যিনি মুক্ত, তিনি 'স্বয়ং-জ্যোতিঃ শুদ্ধো বুদ্ধো নিত্যো নিরঞ্জনঃ শান্তঃ প্রকাশতে'—মুক্ত 'স্বয়ং-জ্যোতিঃ (self-illuminated), শুদ্ধ বুদ্ধ নিত্য নিরঞ্জন (stainless) ও শান্ত।' বৌদ্ধ ত্রিপিটকে নির্ব্বাণের পরা শান্তি লক্ষ্য করিয়া, ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে—

'Blissful tranquility' 'stainless bliss of eternal peace' 'absolute peace' 'eternal peace' 'eternal rest, eternal stillness, the great peace.'—(The Doctrine of the Buddha, pp. 350 & 356).

মুক্ত পুরুষ যে শাশ্বত শান্তির অধিকারী হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। অশান্তির নিদান কি? কামনা, বাসনা, তৃষ্ণা। নির্ব্বাণ দশায় যখন—যত্র কামাঃ পরাগতাঃ, সমস্ত কামনা তিরোহিত হয়, সমস্ত বাসনা উন্মূলিত হয় (ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ—মুণ্ডক, ৩।২।২) সমস্ত তৃষ্ণা নির্ব্বাপিত হয় (মোক্ষঃ স্যাৎ বাসনাক্ষয়ঃ—মুক্তিক, ২।৬৮)—তখন নির্ব্বাণীর অশান্তি আসিবে কোথা হইতে? সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য মুক্ত পুরুষকে 'শ্রোত্রিয়, অকামহত' বলিলেন (বৃহ, ৪।৩।৩৩) এবং তাঁহাকে 'অকাম নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকাম' এই বিশেষণ-চতুষ্টয়ে বিশেষিত করিলেন (বৃহ, ৪।৪।৬) এবং বলিলেন তিনি ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি। ইহাকেই বলে 'ব্রহ্মভূত' হওয়া। এই ব্রহ্মভূতকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি—১৮।৫৪

ব্রহ্মভূত পুরুষ কেবল প্রশান্ত নহেন, তিনি কামের ও শোকের অতীত।

যাজ্ঞবল্ক্যেরও ঐ কথা—

তীর্ণো হি তদা সর্ব্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য ভবতি—বৃহ, ৪।৩।২২
অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ, হৃদয়ের সমস্ত শোক হইতে উত্তীর্ণ হন।

অন্যান্য উপনিষদেরও ঐ কথা—

তরতি শোকম্ আত্মবিৎ—ছান্দোগ্য, ৭।১।৩
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং—মুণ্ডক, ৩।২।৯
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি—কঠ, ২।২২

'সেই মহতো মহীয়ান্ (বিভু) পরমাত্মাকে মনন করিয়া ধীর ব্যক্তি শোকের অতীত হন।'

এই জন্যই মোক্ষশাস্ত্রে তৃষ্ণাক্ষয়ের এত মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্যাসভাষ্যে একটি প্রাচীন বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, যাহার মর্ম্ম এই যে, ইহলোকে যে কামসুখ এবং দিব্যলোকে যে মহৎ সুখ—তৃষ্ণাক্ষয়-সুখের তাহারা ১৬ ভাগের এক ভাগও নহে।

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়-সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥

বুদ্ধদেবও মনোজ্ঞ ভাষায় তন্‌হা-বিজয়ের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এতং সন্তং এতং পণিতং যদিদং সর্ব্বসঙ্খারসমথো সব্বুপধিপটিনিস্সগ্গো তন্‌হক্খয়ো বিরাগো নিব্বাণংতি—মজ্ঝিমনিকায়

অর্থাৎ 'This is the peaceful, this is the exalted: the coming to rest of all organic processes, the becoming free from all *Upadhis*, the drying up of thirst, the unattractiveness, Niroda, Nibbana.'

'In him who dwells in the insight into the transitoriness of all the fetters of existence, thirst (তন্‌হা) is annihilated; through the annihilation of thirst, উপাদান (grasping) is annihilated; through the annihilation of grasping, ভব (becoming) is annihilated; through the annihilation of becoming, জাতি (birth) is annihilated; through the annihilation of birth, old age, sickness, death, pain, lamentation, suffering, sorrow and despair are annihilated.'

অশান্তির আর একটি কারণ—স্বকৃত সুকৃত-দুষ্কৃত—এক কথায় কর্ম্মবিপাক, যাহার ফলে সুখ দুঃখ, 'হ্লাদ পরিতাপ'।

তে হ্লাদ পরিতাপ ফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ—যোগসূত্র, ২।১৪

মুক্তপুরুষ কিন্তু বিসুকৃত, বিদুষ্কৃত—

বিসুকৃতঃ বিদুষ্কৃতো ব্রহ্ম বিদ্বান্—কৌষী, ১।৪
তিনি পুণ্যপাপ-প্রহীন (ধম্মপদ, চিত্ত বগ্গো, ৭)

তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম অবসিত—

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে—মুণ্ডক, ২।২।৮

অতএব পাপ ও পুণ্য, কৃত ও অকৃত তাঁহাকে সন্তপ্ত করে না।

এতং হ বা ন তপতি কিমহং সাধু নাকরবম্ কিমহং পাপম্ অকরবম্ ইতি স য এবং বিদ্বান্—তৈত্তি, ২।৮

'যিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানী—তাঁহাকে 'কেন আমি পুণ্য করিলাম না—কেন আমি পাপ করিলাম'—এ চিন্তা কখনও তাপিত করে না।' কারণ তিনি

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যম্ উপৈতি—মুণ্ডক, ৩।১।৩

এ সম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি এই—

এবম্ উ হৈব এতে ন তরতঃ। ইত্যতঃ পাপং অকরবম্ ইত্যতঃ কল্যাণম্ অকরবম্ ইত্যুভে উ হৈব এষ এতে তরতি। নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ × × আত্মন্যেব আত্মানং পশ্যতি, নৈনং পাপ্মা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি। নৈনং পাপ্মা তপতি, সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি। বিপাপো বিরজো বিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি—বৃহ, ৪।৪।২২-৩

'ইঁহাকে 'কি আমি পাপ করিয়াছি, কি আমি পুণ্য করিয়াছি' এ চিন্তা পীড়িত করে না। এ উভয় চিন্তাই তিনি অতিক্রম করেন। কৃত বা অকৃত ইঁহাকে সন্তপ্ত করে না। ×× যিনি আত্মাতে আত্মাকে দর্শন করেন, যিনি 'আত্মরতি, আত্মক্রীড়' (মুণ্ডক ৩।১।৪)—পাপ তাঁহাকে উত্তীর্ণ হয় না, তিনি পাপকে উত্তীর্ণ হন; পাপ তাঁহাকে তাপিত করে না, তিনি পাপকে তাপিত করেন। তিনি বিপাপ, বিমল, বিচিকিৎস হইয়া 'ব্রাহ্মণ' হন।'

ব্রাহ্মণ কে? ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ—যিনি ব্রহ্মজ্ঞ। তাঁহার চর্য্যা কিরূপ? স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ? যেন স্যাৎ তেন ঈদৃশ এব (বৃহ, ৩।৫।১)—'By living as chance may determine' অর্থাৎ যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্টঃ (গীতা)।*

এই ব্রাহ্মণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য এই ঋক্‌টি উদ্ধৃত করিয়াছেন

এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য
  ন বর্দ্ধতে কর্ম্মণা ন কনীয়ান্
তস্যৈব স্যাৎ পদবিৎ তং বিদিত্বা
  ন লিপ্যতে কর্ম্মণা পাপকেন।

'ব্রাহ্মণের ইহাই চিরন্তন মহিমা যে, তিনি কর্ম্ম দ্বারা অপচিত বা উপচিত হন না। ব্রহ্মের পদ (তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্) যিনি অবগত হইয়াছেন, তিনি পাপ কর্ম্মে লিপ্ত হইবেন কেন?'

ইহাকেই বলে, সঞ্চিতের বিনাশ—জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা—গীতা, ৪।৩৭

বৃহদারণ্যক ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

যদ্ ইহ বা অপি বহ্বিব অগ্নৌ অভ্যাদধতি সর্ব্বম্ এব তৎ সংদহতি, এবং হৈব এবংবিদ্ যদ্যপি বহ্বিব পাপং কুরুতে সর্ব্বমেব তৎ সংপ্সায় শুদ্ধঃ পূতঃ অজরঃ অমৃতঃ সংভবতি—বৃহ, ৫।১৪।৮

'যদি বহু কাষ্ঠও অগ্নিতে নিক্ষেপ করা যায়, অগ্নি সে সমুদায়ই দগ্ধ করে। সেইরূপ এই প্রকার বিজ্ঞানী ব্যক্তি যদি বহু পাপও করেন তথাপি তিনি সে সমস্ত বিনাশ করিয়া শুদ্ধ পূত অজর অমর হয়েন।'

---

* বুদ্ধদেবও ব্রাহ্মণের ঐরূপই লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন

আয়ন্তীং নাভিনন্দতি পথামন্তীং ন শোচতি।
সংজাসংগামজিং মুত্তং তং অহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং॥—উদান, ১।৮

The coming does not make him glad,
The going does not make him sad;
The monk, from longing all released
Him do I call a Brahmana.

ছান্দোগ্যের এ সম্বন্ধে উক্তি এই—

তদ্ যথা ঈষিকাতূলম্ অগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত, এবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে—৫।২৪।৩

'যেমন ঈষিকা বৃক্ষের তুলা (fibre), অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে ভস্মীভূত হয়, তেমনি ব্রহ্মবিজ্ঞানীর সমস্ত পাপ প্রদগ্ধ হয়।

ইহার সহিত ধম্মপদের নিম্নোক্তি তুলনীয়ঃ—

মাতরং পিতরং হন্ত্বা রাজানো দ্বে চ খত্তিয়ে।
রট্ঠং সানুচরং হন্ত্বা অনিঘো যাতি ব্রাহ্মণো॥
—ধম্মপদ, পকিন্নক বগ্‌গো, ৫

ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে শুধু সঞ্চিতের বিনাশ হয় না—ক্রিয়মান কর্ম্মেরও 'অশ্লেষ' হয়।

তদ্ যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবম্ এবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে—ছান্দোগ্য, ৪।১৪।৩ *

'যেমন পদ্মপত্রকে জল স্পর্শ করে না, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞকে পাপ (ও পুণ্য) কর্ম্ম স্পর্শ করে না।' ইহাকেই গীতা 'পদ্মপত্র মিবাম্ভসা' বলিয়াছেন।

ঈশ-উপনিষদ্ সেইজন্য বলিলেন—

এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে—২

অর্থাৎ এইরূপ হইলে, (ক্রিয়মান) কর্ম্মের আর সংশ্লেষ হয় না। বাদরায়ণ মুক্ত পুরুষের কর্ম্মসম্পর্কে এই 'অশ্লেষ-বিনাশ' লক্ষ্য করিয়া সূত্র করিয়াছেন—

তদধিগমে উত্তর-পূর্ব্বাঘয়োঃ অশ্লেষবিনাশৌ তদ্ ব্যপদেশাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১৩

অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান অধিগত হইলে ব্রহ্মজ্ঞের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মরাশি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ইহজন্মকৃত কর্ম্ম (যাহা সাধারণতঃ বন্ধের কারণ) বন্ধের হেতু হয় না।

যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণের (ব্রহ্মজ্ঞের) একটি বিশেষণ দিলেন 'বিচিকিৎস'। বিচিকিৎসার অর্থ সংশয় (doubt)। ইহাও অশান্তির অন্যতম কারণ। কিন্তু যিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানী, তাঁহার সমস্ত সংশয় তিরোহিত হয়, কারণ তিনি তত্ত্বসাক্ষাৎকার করেন, সত্যের তাঁহার অপরোক্ষ অনুভূতি হয়—পাশ্চাত্যেরা

---

* ইহার সহিত বুদ্ধদেবের নিম্নোক্তি তুলনীয়

'Just as, O Brahmin, the blue, red or white lotus-flower, originated in the water, grown up in the water, stands there towering above the water, untouched by the water: just so, Brahmin, I am born within the world, but I have vanquished the world and unspotted by the world I remain.—অঙ্গুত্তর নিকায় II

ইহার পালি মূল এই:—সেয্‌যথাপি ব্রাহ্মণ! উপ্পলং বা পদুমং বা পুণ্ডরীকং বা উদকে জাতং উদকে সংবড্ঢং উদকং অচ্চুগ্‌গম্ম ঠাতি অনুপলিত্তং উদকেন, এবমেব খো অহং ব্রাহ্মণ! লোকে জাতো লোকে সংবড্ঢো লোকং অভিভুয্য বিহরামি অনুপলিত্তো লোকেন।

যাহাকে temperamental reaction to the vision of reality বলিতেছেন। অতএব—

ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ—মুণ্ডক, ২।২।৬

ছান্দোগ্যও বলিয়াছেন—ইতি যস্য স্যাৎ, অদ্ধা ন বিচিকিৎসা অস্তি (৩।১৪।৪)—'যাঁহার এই অবস্থা, তাঁহার কখনও সংশয় হয় না অর্থাৎ 'The illusion, when once it has been penetrated can no longer delude.'

তাঁহার অবস্থা বর্ণন করিয়া ছান্দোগ্য আর এক স্থলে বলিয়াছেন—

অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিঃ এষাং লোকানাম্ অসংভেদায়। নৈতং সেতুম্ অহোরাত্রে তরতঃ, ন জরা ন মৃত্যুঃ ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং। সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তে—অপহতপাপ্মা এষ ব্রহ্মলোকঃ।

তস্মাদ্ বা এতং সেতুং তীর্ত্বা অন্ধঃ সন্ অনন্ধো ভবতি, বিদ্ধঃ সন্ অবিদ্ধো ভবতি, উপতাপী সন্ অনুপতাপী ভবতি।—ছান্দোগ্য, ৮।৪।১-২

'যিনি পরমাত্মা, তিনি সেতু—এই সমস্ত লোকের বিভাজক ধারক সেতু। ঐ সেতুকে দিবারাত্রি, জরা মৃত্যু, শোক, সুকৃত দুষ্কৃত, উত্তরণ করিতে পারে না।

অতএব যিনি এই সেতু উত্তীর্ণ হন, তিনি যেন অন্ধ ছিলেন চক্ষুষ্মান্ হন, ক্ষত ছিলেন অক্ষত হন, রোগী ছিলেন অরোগী হন।'

ইহার সহিত বুদ্ধদেবের নিম্নোক্তি তুলনীয় :—

এবমেব খো মহারাজ! ভিক্খু যথা ইণং যথা রোগং যথা বন্ধনাগারং যথা দাসব্যং যথা কন্তরদ্ধানমগ্গং ইমে পঞ্চ নীবারণে অপ্পহীণে অত্তং সমনুপস্সতি, সেয্যথাপি মহারাজ! যথা আনণ্যং যথা আরোগ্যং যথা বন্ধনা মোক্খং যথা ভুজিনং যথা খেমন্ত ভূমিং এবমেব খো মহারাজ! ইমে পঞ্চ নীবারণে পহীণে অত্তং সমনুপস্সতি—দীঘনিকায়

'Even thus, O king, as a debt, as an illness, as imprisonment, as thraldom, as a desert journey, does the monk regard these Five Impediments, while as yet they are not banished from within him. But, like a cancelled debt, like recovery from illness, like release from prison, like being a freed man, like safe soil—even so does the monk regard the banishing of these Five Impediments from within him.'—Digha Nikaya, II.

যিনি নির্ব্বাণের তোরণে উপনীত হইয়াছেন, বুদ্ধদেব অন্যত্র তাঁহার অবস্থা (attitude) এই ভাবে বর্ণন করিয়াছেন :—

সো সুখং চে বেদনং বেদেতি সা অনিচ্চাতি পজানাতি, অনজ্ঝোসিতা তি পজানাতি অনভিনন্দিতা তি পজানাতি। দুক্খং চে বেদনং বেদেতি সা অনিচ্চাতি পজানাতি, অনজ্ঝোসিতা তি পজানাতি, অনভিনন্দিতা তি পজানাতি। অদুক্খং অসুখং চে বেদনং বেদেতি, সা অনিচ্চাতি পজানাতি, অনজ্ঝোসিতা তি পজানাতি, অনভিনন্দিতাতি পজানাতি।

সো সুখং চে বেদনং বেদেতি বিসংযুত্তো নং বেদেতি; সো দুক্খং চে বেদনং বেদেতি, বিসংযুত্তো নং বেদেতি: সো অদুক্খং অসুখং চ বেদনং বেদেতি বিসংযুত্তো নং বেদেতি।—মজ্ঝিমনিকায়, ৩

'তিনি যদি সুখকর বেদন (sensation) অনুভব করেন, তবে তাঁহার বোধ হয়—'ইহা অনিত্য, ইহা অস্বীকৃত (unappropriated), ইহা অনভিনন্দিত'। যদি দুঃখকর বেদন অনুভব করেন, তবে তাঁহার বোধ হয়—'ইহা অনিত্য, ইহা অস্বীকৃত, ইহা অনভিনন্দিত'। যদি অদুঃখ-অসুখকর বেদন অনুভব করেন, তবেও তাঁহার বোধ হয়—'ইহা অনিত্য, ইহা অস্বীকৃত, ইহা অনভিনন্দিত'। তাঁহার অনুভব সুখকর হ'ক, দুঃখকর হ'ক, অদুঃখ-অসুখকর হ'ক, তিনি 'বিসংযুক্ত' (উদাসীন) ভাবে তাহা ভোগ করেন।'

গীতার সেই প্রাচীন কথা—উদাসীনবদ্ আসীনং × × অসক্তং তেষু কর্ম্মসু।

বুদ্ধদেবও ঐ মর্ম্মে আনন্দকে বলিয়াছেন—

পটিকূলং চ অপটিকূলং চ তদুভয়ং অভিনিবজ্জেত্বা উপেখকো বিহরেয্যং সতো সংপজানো তি উপেখকো তত্থ বিহরতি সতো সংপজানো এবং খো আনন্দ অরিয়ো হোতি ভাবিতেন্দ্রিয়ো—মজ্ঝিমনিকায়, ৩

অর্থাৎ প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল (Repugnant and unrepugnant)—উভয়কেই বর্জ্জন করিয়া উপেক্ষক (উদাসীন ভাবে=with equal mind) বিচরণ করিতে হইবে—সৎ ও সম্প্রজান (thoughtful and clearly conscious) হইয়া। হে আনন্দ! যিনি 'অরিয়' (আর্য্য=saint) তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম এইরূপই বশীকৃত।

এই যে 'Equal Mind,' গীতা ইহাকেই 'সমত্ব' বলিয়াছেন—সমত্বংযোগ উচ্যতে। এই অবস্থার নাম দ্বন্দ্বাতীত হওয়া—

যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ—গীতা, ৪।২২

সেই অবস্থায় নির্দ্বন্দ্ব পুরুষ—

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥
উদাসীনবদ্ আসীনং গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥—গীতা, ১৪।২২-৩

এই যে উদাসীনবৎ অবস্থান, 'পক্ষপাত'-বিনির্মুক্তি—ইহা 'অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণম্,' নির্ব্বাণের সমীপস্থ দশা—

পক্ষপাত বিনির্মুক্তো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা—ব্রহ্মবিন্দু, ৬

বুদ্ধদেব নিজের ঐ অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

যে মে দুক্খং উপাদন্তি যে চ দেন্তি সুখং মম।
সব্বেসং সমকো হোমি দেন্যো কোপিন বিজ্জতি॥

সুখদুক্খে তুলাভূতো যসেসু অযসেসু চ।
সব্বথ সমকো হোমি এসা মে উপেক্খাপরং॥
—চর্য্যাপিটক, ৩

'যাহারা আমাকে দুঃখ দেয় এবং যাহারা আমাকে সুখ দেয়, তাহারা সকলেই আমার পক্ষে সমান—তাহাদের সম্পর্কে আমার রাগ বা দ্বেষ নাই। সুখ দুঃখ আমার নিকট তুল্য মূল্য - যশঃ ও অযশঃ। সর্ব্বত্রই আমি সমান—ইহাই আমার চরম উপেক্ষা (Perfection of my equanimity)।

সেই গীতার কথা—

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধি রসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥—৫।২০

'যিনি ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মেস্থিত—তিনি স্থিরবুদ্ধি, মোহহীন—প্রিয়-প্রাপ্তিতে তাঁহার প্রহর্ষ নাই, অপ্রিয়-প্রাপ্তিতে তাঁহার উদ্বেগ নাই।'

ইহাই প্রকৃত প্রজ্ঞা—যাজ্ঞবল্ক্যের অভিমত 'ব্রাহ্মণে'র অনুষ্ঠেয়—যে ব্রাহ্মণ 'শ্রোত্রিয়, অবৃজিন, অকামহত'।

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ—বৃহ, ৪।৪।২১

কারণ, এইরূপ 'প্রাজ্ঞ' ব্রাহ্মণই—শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া আত্মার অভ্যন্তরে পরমাত্মাকে দর্শন করেন।

তস্মাদ্ এবংবিৎ শান্তো দান্তঃ উপরতঃ তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মনি এব আত্মানং পশ্যতি, সর্ব্বম্ আত্মানং পশ্যতি—বৃহ, ৪।৪।২৩

সন্ন্যাস-উপনিষৎ-সমূহে এ অবস্থার সবিশেষ বর্ণনা আছে।

ব্রহ্ম-উপনিষদ্ বলেন 'তাঁহারই ব্রাহ্মণ্য সম্পূর্ণ, যাঁহার জ্ঞানময়ী শিখা, যাঁহার জ্ঞানময় উপবীত।'

শিখা জ্ঞানময়ী যস্য উপবীতং চ তন্ময়ম্।
ব্রাহ্মণ্যং সকলং তস্য ইতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥

এইরূপ ব্রাহ্মণের লক্ষ্য—পরম পদে প্রবেশ বা ব্রহ্ম-সাযুজ্য।
গুহাং প্রবেষ্টু মিচ্ছামি পরং পদম্ অনাময়ম্।

এইরূপ ব্রাহ্মণ পরম-হংস-পদারূঢ়।

'তিনি শীত উষ্ণ, সুখদুঃখ, মান-অপমান প্রভৃতি দ্বন্দ্বের অতীত। ক্ষুৎপিপাসা, শোক মোহ ও জরামৃত্যুরূপ সংসার-সমুদ্রের ছয়টি উর্ম্মি তাঁহাকে স্পর্শ করে না। তিনি নিন্দাগর্ব্ব হিংসাদম্ভদর্প ইচ্ছাদ্বেষ সুখদুঃখ কাম ক্রোধ লোভ মোহ হর্ষ অসূয়া অহংকারাদি বর্জ্জন করিয়া, (দেহাত্মবুদ্ধি অতিক্রম পূর্ব্বক) নিজ শরীরকে শবদেহ জ্ঞান করেন।'

ন শীতং ন চোষ্ণং ন সুখং ন দুঃখং ন মানাপমানে চ ষড়ূর্ম্মিবর্জ্জং নিন্দাগর্ব্বমৎসরদম্ভদর্পেচ্ছাদ্বেষ সুখ-দুঃখ-কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-হর্ষাসূয়াহংকারাদীংশ্চ হিত্বা স্ববপুঃ কুণপমিব দৃশ্যতে—পরমহংস, ২

'তিনি কি ভাবে জীবন যাপন করেন?' ইহার উত্তরে আরুণেয়ী-উপনিষদ্ বলিয়াছেন:—

ব্রহ্মচর্য্যম্ অহিংসাং চ অপরিগ্রহং চ সত্যং চ যত্নেন হে রক্ষত হে রক্ষত হে রক্ষত—৩

'হে সন্ন্যাসী! তোমরা ব্রহ্মচর্য্য অহিংসা অপরিগ্রহ ও সত্য সযত্নে রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর।'

সঙ্গে সঙ্গে কাম ক্রোধ লোভ মোহ দম্ভ দর্প হিংসা মমত্ব অহংকার অসত্য সর্ব্বথা বর্জ্জন কর।

কাম ক্রোধ লোভ মোহ দম্ভ দর্পাসূয়া মমত্বাহংকারানৃতাদীন্ অপি ত্যজেৎ —আরুণেয়ী, ৪

সন্ন্যাসী কিরূপ আচরণ করিবেন?

দুঃখে নোদ্বিগ্নঃ সুখে ন স্পৃহা ত্যাগো রাগে, সর্ব্বত্র শুভাশুভয়োঃ অনভিস্নেহঃ ন দ্বেষ্টি ন মোদতে—পরমহংস ৪

'দুঃখে উদ্বেগহীন, সুখে স্পৃহাহীন, কাম্যবস্তুতে কামনাহীন সর্ব্বত্র শুভাশুভে স্নেহহীন—সন্ন্যাসী দ্বেষরাগ-বর্জ্জিত।'

তিনি নিন্দা স্তুতির অতীত—
স্তূয়মানো ন তুষ্যেত নিন্দিতো ন শপেৎ পরান্—সন্ন্যাস ৪

তাঁহার সম্পর্কে শাঠ্যায়নী-উপনিষদ্ বলিতেছেন:—

কাম ক্রোধ লোভ মোহ দম্ভ দর্পাসূয়া মমত্বাহংকারাদীন্ বিতীর্য্য মানাপমানৌ নিন্দাস্তুতী চ বর্জ্জয়িত্বা বৃক্ষ ইব তিষ্ঠাসেৎ। ছিদ্যমানো ন ব্রূয়াৎ। তদৈবং বিদ্বাংস ইহৈব অমৃতা ভবন্তি—১৮

সন্ন্যাসী 'কাম ক্রোধ লোভ মোহ দম্ভ দর্প ঈর্ষা মমতা অহংকার প্রভৃতি নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া মান-অপমান নিন্দা-স্তুতি বর্জ্জন করিয়া তরুর মত (সহিষ্ণু হইয়া) অবস্থান করিবেন। কাটিয়া ফেলিলেও কথা কহিবেন না। এইরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি এখানেই অমৃতত্ব লাভ করেন।"

তখন তাঁহার স্থিতি কিরূপ হয়?

সর্ব্বে কামা মনোগতা ব্যাবর্ত্তন্তে। সর্ব্বেষাম্ ইন্দ্রিয়াণাং গতিঃ উপরমতে য আত্মনি এব অবস্থীয়তে যৎ পূর্ণানন্দৈকবোধঃ তদ্ ব্রহ্মাহমস্মি ইতি কৃতকৃত্যো ভবতি কৃতকৃত্যো ভবতি—পরমহংস উপনিষদ্।

'মনঃস্থিত সমস্ত কামনা ব্যাবৃত্ত হয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গতি উপরত হয়। যিনি আত্মাতে অবস্থিত হন, তিনি সেই চিদানন্দঘন ব্রহ্মের সহিত ঐক্য উপলব্ধি করিয়া সোহং ভাব প্রত্যক্ষ করতঃ কৃতকৃত্য হন—কৃতকৃত্য হন।'

এইবার চরমপন্থী পরিব্রাজক পরমধামে তীর্থযাত্রা করেন। তাঁহার জন্য 'বৈতরণী'র ঘাটে ওঁকার-নৌকা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল, (ওঁকার-প্লবেন অন্তর্হৃদয়াকাশস্য পারং তীর্ত্বা—মৈত্রী ৬৷২৮), তিনি ঐ তরীতে আরোহণ করিয়া অনায়াসে ভবপারে চলিয়া যান—

> ওঁকাররথমারুহ্য বিষ্ণুং কৃত্বাথ সারথিম্।
> ব্রহ্মলোকপদান্বেষী রুদ্রারাধন তৎপরঃ ॥—অমৃতনাদ ২

যিনি এই অবস্থায় উপনীত হন, তিনি বুদ্ধদেবের বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারেন—

> খীণা জাতি, বুসিতং ব্রহ্ম চরিয়ং; কতং করণীয়ং নাপরং ইত্থত্তা যাতি—মজ্ঝিমনিকা

'পুনর্জন্ম রহিত হইয়াছে, ধর্ম্মজীবন অবসিত হইয়াছে, করণীয় সম্পূর্ণ হইয়াছে—আর কোন কিছু অবশিষ্ট নাই।'

যোগসূত্রে এইরূপ পুরুষকে 'চরিতাধিকার' বলা হইয়াছে—তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা (২৷২৭ সূত্র)—'তাঁহার সপ্তবিধ প্রজ্ঞা উদিত হয়'। কি কি ?

(১) পরিজ্ঞাতং হেয়ং নাস্য পুনঃ পরিজ্ঞেয়ম্ অস্তি—'হেয়' পরিজ্ঞাত হইয়াছে, আর কিছু পরিজ্ঞেয় নাই। (২) ক্ষীণাঃ হেয়হেতবঃ, ন পুনরেতেষাং ক্ষেতব্যম্ অস্তি—'হেয়-হেতু' ক্ষয়িত হইয়াছে, আর কিছু ক্ষয় করিবার নাই। (৩) সাক্ষাৎকৃতং নিরোধসমাধিনা হানম্—নিরোধ-সমাধি দ্বারা 'হান' অধিগত হইয়াছে। (৪) ভাবিতো বিবেকখ্যাতিরূপো হানোপায়ঃ—বিবেকখ্যাতি-(প্রকৃতি পুরুষের ভেদবিজ্ঞান-) রূপ 'হানোপায়' উপলব্ধ হইয়াছে।

(প্রজ্ঞার এই চতুর্বিধ কার্য্য-বিমুক্তি—ইত্যেষা চতুষ্টয়ী কার্য্য-বিমুক্তিঃ প্রজ্ঞায়াঃ। চিত্তবিমুক্তিস্তু ত্রয়ী—আর ত্রিবিধ চিত্তবিমুক্তি লইয়া সপ্তবিধ প্রজ্ঞা)

(৫) চরিতাধিকারা বুদ্ধিঃ—বুদ্ধির করণীয় সম্পূর্ণ হইয়াছে। (৬) গুণা গিরিশিখরতটচ্যুতা ইব গ্রাবাণো নিরবস্থানাঃ স্বকারণে প্রলয়াভিমুখাঃ সহ তেন অস্তং গচ্ছন্তি, ন চৈষাং প্রবিলীনানাং পুনরস্তি উৎপাদঃ প্রয়োজনাভাবাদ্ ইতি—গিরিশৃঙ্গ-চ্যুত প্রস্তর-খণ্ডের ন্যায় নিরাশ্রয় গুণত্রয় স্বকারণ প্রকৃতিতে অস্তোন্মুখ হইয়াছে—প্রয়োজনের অভাবে আর তাহাদের উদয় হইবে না। (৭) এতস্যাম্ অবস্থায়াং গুণ-সম্বন্ধাতীতঃ স্বরূপমাত্রজ্যোতিঃ অমলঃ কেবলী পুরুষ ইতি—আর পুরুষ ? ঐ অবস্থায় তিনি গুণসম্বন্ধের অতীত (অসঙ্গ) হইয়া স্বরূপমাত্রজ্যোতিঃ (স্বয়ং জ্যোতিঃ), অমল, কেবলী হইয়াছেন।—ব্যাসভাষ্য।

অধ্যাপক ডয়সান এইরূপ 'চরিতাধিকার' পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া, উপনিষদের ভাষায় বলিয়াছেন—

'He who has recognised 'Aham Brahma asmi' 'I am Brahman,' he already is, not will be delivered; he sees through the

illusion of plurality (নানাত্ব), knows himself as the sole real, as the substance of all that exists—and is thereby exalted above all desire (কাম)।

মোক্ষশব্দের নিরুক্তি

এতক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিলাম, মোক্ষশব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি। মোক্ষ অর্থে বন্ধন-মুক্তি (Release, Liberation, Emancipation)। কিসের বন্ধন (Bondage) ? অবিদ্যার বন্ধন, কামনার বন্ধন, বাসনার বন্ধন, তৃষ্ণার বন্ধন, মোহের বন্ধন। ইহাদিগকে উপনিষদে গ্রন্থি, গ্রহ, বন্ধ, পাশ বলা হইয়াছে। এই সকলের দ্বারা জীবের বদ্ধ ভাব—পাশবদ্ধো ভবেৎ জীবঃ—অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ (শ্বেত, ৪৷৭)—মোহের অধীন হইয়া ঈশ্বর ভাবের অভাব হয়। অতএব ইহারা Fetters, knots, bands, bonds that bind the soul to the objects of sense ; এবং ঐ অবিদ্যার শাতন হইলে, ঐ কামনা-বাসনার বারণ হইলে, ঐ মোহের উন্মূলন হইলেই জীবের মুক্তি (Deliverance)।

> তখন—ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ—মুণ্ডক, ২৷২৷৮
> তখন গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তঃ অমৃতো ভবতি—মুণ্ডক, ৩৷২৷৯
> তখন স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ—ছান্দোগ্য, ৭৷২৬৷২
> তখন জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ—শ্বেত, ১৷১১

অতএব ইহাই জীবের পরম পুরুষার্থ (Summum Bonum)। সেইজন্য মুক্তির নাম নিঃশ্রেয়স। ধম্মপদের ভাষায়,—নিব্বাণং যোগক্খেমং অনুত্তরং (অপ্পমাদবগ্‌গো, ৭)

উপনিষদ্ প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ের ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

> অন্যৎ শ্রেয়ঃ অন্যদ্ উতৈব প্রেয়ঃ
> তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ—কঠ, ২৷১

প্রেয়ঃ প্রবৃত্তির পথ (Primrose Path of dalliance)—শ্রেয়ঃ নিবৃত্তির পথ। আর মোক্ষ নিঃশ্রেয়স—নিবৃত্তি পথের goal (গম্যস্থান)। সেই জন্য বুদ্ধদেব নির্ব্বাণকে 'the highest, holy freedom' বলিয়াছেন ; কারণ—যিনি নির্ব্বাণী, তিনি

already in this present life, has actually realised complete deliverance from everything that is অনাত্মা —has completed the gigantic task of getting rid of his bondage to this will (তন্হা)—he has burst all the fetters, 'whether refined or gross.'—(Grimm, p. 333).

সেই জন্য সাংখ্যেরা মুক্তিকে 'অন্তরায়-ধ্বস্তি' বলিয়াছেন—মুক্তি অন্তরায়-ধ্বস্তিঃ ন পরঃ (সাংখ্যসূত্র, ৬৷২০)—অন্তরায়-ধ্বংসই মুক্তি কি অন্তরায়? কামনা বাসনা, শোকমোহ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, জরা মৃত্যু—(যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায়) অশনায়া-পিপাসে শোকং মোহং জরা মৃত্যুম্ অত্যে[ti] (বৃহ, ৩৷৫৷১)

বুদ্ধদেব এই মোক্ষকে নির্ব্বাণ বলিলেন কেন? তাঁহার নিজের মুখের বাণী শুনুন।

সেয্যথাপি ভিক্খবে! তেলং চ পটিচ্চ বট্টিং চ পটিচ্চ তেলপ্পদিপো ঝায়েয্য, তত্র পুরিসো ন কালেন কালং তেলং আসিঞ্চেয্য ন বট্টিং চ উপসংহরেয্য। এবং হি সো ভিক্খবে! তেলপ্পদিপো পুরিমন চ উপাদানস্স পরিযাদানা অঞ্ঞস্সচ অনুপাহারা অনাহারো নিব্বায়েয্য। এবং এব খো ভিক্খবে! সঞ্ঞোজনীয়েসু ধম্মেসু আদীনবানুপস্সিনো বিহরতো তন্হা নিরুজ্ঝতি, তন্হানিরোধা উপাদাননিরোধোপি এবং এতস্স কেবলস্স দুক্খখন্ধস্স নিরোধো হোতি *—সংযুক্ত-নিকায়, ২

'হে ভিক্ষুগণ! যেমন তৈল ও বর্ত্তি সংযোগে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপে যদি কেহ আর তৈল ও বর্ত্তি যোগ না করে, তবে সেই প্রদীপ যেমন উপাদানের অভাবে নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ যিনি সমস্ত সংযোজনের' (fetters of existence) অস্থিরত্ব উপলব্ধি করিয়া অনাহারে বিহরণ করেন, তাঁহার তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হয়, তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান (grasping) নিরুদ্ধ হয় এবং দুঃখের নিদান পঞ্চস্কন্ধের নিরোধ হয়।'

বুদ্ধদেব অন্যত্র বলিয়াছেন—

I teach the annihilation of craving, the annihilation of hatred the annihilation of delusion.†

অর্থাৎ লোভ, দ্বেষ ও মোহ—ইহাদের নির্ব্বাণই নির্ব্বাণ—নির্ব্বাণ নাস্তিত্ব নহে।

Nirvana is the dying out of the three fires of লোভ, দ্বেষ and মোহ— of desire, hatred and illusion—What is Buddhism, p. 60?

This epithet is Nirvana, 'the going out' that is to say the going out in the heart of the three fires of lust, ill-will and dullness.'—Rhys Davids, p. 151.

---

* সেয্যথাপি ভিক্খু! তেলং চ পটিচ্চ, বট্টিং চ পটিচ্চ, তেলপ্পদীপো ঝায়তি তস্স এব তেলস্স বট্টিয়া পরিযাদানা অঞ্ঞস্স চ অনুপাহারা অনাহারো নিব্বায়তি—মজ্ঝিম নিকায়—১৪০ সূত্ত

† 'Nibbana, Nibbana, so they say friend Sariputta! Now what means Nibbana?' 'That which is the vanishing of desire, the vanishing of hate, the vanishing of delusion—that, friend, is called Nibbana.'

—সংযুক্ত নিকায়, IV

সব্বরাগ দোস মোহ নিহিত নিংনীতকসাবো—He (the Delivered One) is entirely free from greed, hate and delusion.—মধ্যম নিকায়, III

এই যে লোভ, দ্বেষ ও মোহ—ইহারা তৃষ্ণা বা তন্হারই প্রকট মূর্ত্তি, সেই জন্য ত্রিপিটকে বহুবার 'তন্হা-নির্ব্বাণকে'ই নির্ব্বাণ বলা হইয়াছে।*

'All that is extinguished is the flaring flame of thirst (তন্হা) to remain in contact with the world.'—Grimm, p. 339.

অর্থাৎ উপনিষদের ভাষায়—সংসার-মোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ—শ্বেত, ৬৷১৬

অতএব যিনি মুক্ত, যিনি নির্ব্বাণী, তিনি বুদ্ধদেবের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারেন—

অহু পুব্বে লোভো, তদ্ অহু অকুসলং; সো এতরহি নত্থি ইচ্চে তং কুসলং। অহু পুব্বে দোসো, তদ্ অহু অকুসলং; সো এতরহি নত্থি ইচ্চে তং কুসলং। অহু পুব্বে মোহো তদ্ অহু অকুসলং; সো এতরহি নত্থি ইচ্চে তং কুসলং ইতি—অঙ্গুত্তর-নিকায় I।

'এক দিন লোভ ছিল—উহা অকুশল (অভদ্র); এখন তাহা নাই—অতএব ভদ্রস্থ হইয়াছি। এক দিন দ্বেষ ছিল—উহা অকুশল (অভদ্র); এখন তাহা নাই—অতএব ভদ্রস্থ হইয়াছি। একদিন মোহ ছিল—উহা অকুশল (অভদ্র); এখন তাহা নাই—অতএব ভদ্রস্থ হইয়াছি।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

---

*Desire, hate and delusion represent the three modes of manifestation of thirst. Accordingly in the Canon, we find frequent direct mention of Tanha-Nibbana, thirst-extinction.—Grimm, pp. 338-9.

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ও বর্ত্তমান জগৎ *

শরৎকালের সকাল, প্রবাসীর মনে সহজেই দেশের ভোরের শিশির-ভেজা ঘাসের কথা মনে পড়ে, নদীর তীরে কাশবনের উপর রৌদ্রছায়ার খেলা, আঙিনায় খঞ্জন পাখীর চপল নাচ, আসন্ন পূজোর ছবি নদী গিরি প্রান্তর অতিক্রম করে চোখের সামনে ফুটে ওঠে। কিন্তু পশ্চিম দেশের আকাশে মেঘেরা বারিবর্ষণ নিঃশেষ করে বহুদিন ফিরে গিয়েচে, সেখানে নীল আকাশে শাদা মেঘের টুকরো উদ্দেশ্যহীন ভাবে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ভেসে যায় না। এমনি দিনে সুরেশ তানপুরো নিয়ে রাগালাপে ব্যস্ত। দরজার ফাঁকে গুটিকয়েক করবী আর শিউলি গাছ দেখা যায়, তার দিকে চেয়ে সুরেশের মনে হল যে ললিতরাগের গান্ধার থেকে ধৈবতের করুণ মিড়ের সঙ্গে যেন এই স্নিগ্ধ শারদ প্রাতের নিগূঢ় যোগ আছে। যদিচ রাগবিশেষে কোন নির্দ্দিষ্ট রসের স্থাপনায় তার কোন আস্থা ছিল না, তবুও এ অনুভূতি তার তীব্র হয়ে উঠেছিল যে সাহিত্যে, ভাস্কর্য্যে, চিত্রকলায় মনের যে উচ্ছ্বাসকে মানুষ মূর্ত্ত করতে চায়, সঙ্গীতে মনের দুই কূল ছাপিয়ে তা উদ্বেল হয়ে ওঠে।

ললিতরাগের ধৈবত স্বরসঙ্গতির কারণে কোমল ও তীব্র ধৈবতের মধ্যে সঞ্চরণ করে, কোথাও তার স্থির থাকবার যো নেই। "প্যারি তোরে নৈন রগে মগে নিসপিয়া সৌংগ জাগে"—এই বিলম্বিত খেয়ালের আলাপে যখন মগ্ন হয়ে পড়েচে, তখন প্রবেশ করল তার বন্ধু, চোখে চশমা, মুখে সিগারেট, হাতে একখানা ইংরাজী বই। রমেশ ঢুকেই বল্ল—"সেই সৈঁয়া সৈঁয়া সুরু করেচ। ওস্তাদি গান এখন রাখ। মান্ধাতার আমলের রাগরাগিণী রেখে নবযুগের বাণী শোনা অভ্যাস কর।"

সুরেশ—নবযুগের বাণীটা কি ?

রমেশ—সেটা এখনও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি। তবে এটুকু বোঝা যায় তোমাদের রাগগুলি অত্যন্ত পুরোনো এবং অতিশয় পরিচিত হয়ে পড়েচে।

সুরেশ—এই ত সকালে গৌরী মিশির আর ছম্মন সাহেবের সঙ্গে মল্লার ও সারঙ্গের ঘর নিয়ে আলোচনা হল, কই তারা ত কিছু বল্ল না।

রমেশ—তোমার কথা শুনে রাগ হয়। তারা নিরক্ষর, এসব খবর কোথা থেকে পাবে ?

* হিন্দুস্থানী সঙ্গীত এ প্রবন্ধের সর্ব্বত্র হিন্দুস্থানী উচ্চ সঙ্গীতের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সঙ্গীত বলতে ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী এই কয়েকটি ধরে নিতে হবে।

সুরেশ—তবে তুমি কোথায় এ সব শুনলে ? রাগ পুরোনো হয়ে পড়লে ত এরাই প্রথম খবর পাবে।

রমেশ—শিক্ষিত লোকের চেয়ে তোমার গৌরী মিশির আর খাঁ সাহেবরা বোঝেন বেশী ?

সুরেশ—তাই বল, শিক্ষিত লোকের কাছে শুনেচ। আচ্ছা, এই সব শিক্ষিত লোকেরা হিন্দুস্থানী গান জানেন ?

রমেশ—তাঁরা বুদ্ধিমান, শুনলে বুঝতে পারেন না ?

সুরেশ—আমরা গান করি, ১৫।১৬ বছর শোনার ও রেয়াজের পর আমরা রাগের খবর পাই, আর তোমার শিক্ষিত লোকদের কাছে শুধু লেখাপড়ার জোরে দু-একবার শোনার পর রাগ সুপরিচিত হয়ে পড়ে, এতে যদি আমার সন্দেহ হয় ত সেটা কি গুরুতর অপরাধ হল ? কিন্তু সে কথা থাক, তোমার হাতে বইটা কি ?

রমেশ বইটীর মাঝামাঝি একটা পাতা খুলে বল্ল, "এইটে পড়ে দেখ।"

পড়বার বিশেষ কিছু ছিলনা, তবু সুরেশ চোখ বুলিয়ে দেখলে জনৈক ইংরাজ পর্য্যটক হিন্দুস্থানী উচ্চসঙ্গীতের সম্বন্ধে খবর পেয়েচেন যে সেটা static ও traditional এবং তা কোন উচ্চশিক্ষিতের কাছে। এরকম কিছু সুরেশের চোখেও পড়েচে, কিন্তু সে এসবে বড় একটা কান দিত না। সে জানত হিন্দুস্থানী উচ্চসঙ্গীতের গায়ক বা বাদক এরকম কোন আশঙ্কা কখনও প্রকাশ করে নি এবং এরা সামান্য হিন্দি উর্দ্দু জানলেও বুদ্ধিমান।

সুরেশ—Static ও traditional-এর উত্তর আমি পরে দেবো। কিন্তু যাঁরা বলচেন, তাঁদের সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ইংরেজ পর্য্যটকের কোন দোষ দিই না, এ মত তাঁর নিজের নয়, দেশ থেকে নেওয়া। তুমি যদি ইংরেজ ও ভারতীয়ের লেখা স্কুল ও কলেজপাঠ্য ইতিহাসের বইগুলো তুলনা কর, দেখবে প্রায় প্রত্যেক বিদেশী গ্রন্থকার হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের যথাসাধ্য খোঁজখবর নিয়ে লিখেচেন, কিন্তু ভারতীয়ের মধ্যে শতকরা একজনের সম্বন্ধেও একথা খাটে কিনা সন্দেহ। Sir W. Hunter ও Mr. Havell-এর বই দেখলে আমার কথা সুবোধ্য হবে। Sir William Jones সঙ্গীতের পুঁথি উদ্ধার করবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানী রাগের তৎকালীন প্রকারভেদের অনুসন্ধান করতে ভোলেন নি। বর্ত্তমানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সম্বন্ধে ইংরাজীতে যে কখানা বই পাওয়া যায়, তাদের গ্রন্থকারগণ, যেমন Capt. Willard, Fox Strangways, Mr. Clements ইত্যাদিরা সকলেই বিদেশী। হাজার সহানুভূতি ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বিদেশীর কাছে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত দুর্ব্বোধ্য হয়েচে, কিন্তু সে ত্রুটিটুকু স্বীকার করেও তাঁদের অনুসন্ধিৎসার প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে আমার নালিশ আছে। তাঁদের মধ্যে যাঁরা উচ্চসঙ্গীতের মজলিশে ব্রিজ খেলেন, খোশগল্প করেন এবং পান-ভোজনে ব্যস্ত থাকেন এবং নিতান্ত উত্যক্ত হলে গাইয়েকে পয়সার জোরে ক্রমাগত ঠুংরী ও গজল গাইতে বাধ্য করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই, যার যা রুচি। শিক্ষিতের মাঝে এক সম্প্রদায় আছেন, যাঁরা জানতে চান, বুঝতে চান, বোঝবার ক্ষমতা রাখেন।

রমেশ—এদের বিরুদ্ধে কথা বলবার আগে একথাটা তোমার মনে রাখা উচিত, বোঝবার মত করে তোমরা কখনও সঙ্গীতের কথা আলোচনা কর নি।

সুরেশ—কারুর বিরুদ্ধে কথা আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলিনে। তোমরা বাদবিসংবাদ বাধাবে, যদি প্রতিবাদ করি, বলবে ঝগড়াটে, এ অপবাদ দেওয়া তোমার সাজে না। কিন্তু তুমি যে অনুযোগ করেছ তা একবর্ণ অসত্য নয়। সঙ্গীত সম্বন্ধে লেখা মানে এদেশে অধিকাংশ স্থলে নাদব্রহ্মের দ্বাবিংশতি নাড়ীর ও খাঁ সাহেবদের অলৌকিক ক্ষমতার বর্ণন, অসম্বদ্ধ প্রলাপ ও অপরিপক্ক উদ্গীরণ। যদি কিছু বলতে যাও শুনবে 'বাপরে, ঋষিদের উপরে কথা'! ভারতের সুজলা সুফলা ভূমিতে ঋষিরা অতি সুলভের কোঠায় উপস্থিত হয়েচেন। যাঁদের লেখবার বা বোঝবার শক্তি আছে, তাঁদের হয় গান শোনা হয় না, না-হয় পুস্তকের অভাব ঘটে। নাট্যশাস্ত্র, সঙ্গীতরত্নাকর, রাগতরঙ্গিনী, সঙ্গীতপারিজাত, হৃদয়কৌতুক, হৃদয়প্রকাশ, রাগতত্ত্ববিবোধ, সদ্রাগচন্দ্রোদয়, রাগমালা, রাগমঞ্জরী, স্বরমেলকলানিধি, চতুর্দণ্ডিপ্রকাশিকা, সঙ্গীতসারামৃতম্, রাগলক্ষণম্, অনূপবিলাস, অনূপসঙ্গীতরত্নাকর, অনূপাংকুশ, রাগবিবোধ—এই কখানি বই পণ্ডিত ভাতখণ্ডের মতে সঙ্গীতশিক্ষার্থীর ব্যবহারে আসতে পারে। প্রায় সবগুলিই তিনি নিজ ব্যয়ে মারাঠি ও গুজরাটি অনুবাদের সঙ্গে প্রকাশ করেন, অধিকাংশই বিক্রী হয়ে যাওয়াতে অল্প কয়েকটী মাত্র কিনতে পাওয়া যায়। এগুলির পুনরায় ছাপা নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েচে। সবগুলিই পুস্তিকা বললেই হয়, সুতরাং ব্যয় অধিক হবে না। এ হল প্রাচীন সঙ্গীতের কথা, যার মূল্য বেশীর ভাগই ঐতিহাসিক। আধুনিক সঙ্গীতের সম্বন্ধে দু একখানা বই লেখা হয়েচে, যা পড়লে সঙ্গীতের যা কিছু বোধগম্য, তা বোঝা যায়। বাংলায় স্বর্গীয় কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গীতসূত্রসার' ও বাংলার বাইরে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় চারিখণ্ডে সম্পূর্ণ "হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-পদ্ধতি"। এগুলি তাঁর সর্ব্বত্র প্রচলিত স্বরলিপি-সম্বলিত চারিখণ্ড 'ক্রমিক পুস্তক' থেকে আলাদা।

রমেশ—দ্বিতীয়টী কোন ভাষায় লেখা ?

সুরেশ—মরাঠিতে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সম্বন্ধে এটা একমাত্র প্রামাণ্য ও সুলিখিত গ্রন্থ বললে অত্যুক্তি হয়না। কৃষ্ণধনবাবুর বই অনেকদিন আগে লেখা, অনেক অধুনা প্রকাশিত সংস্কৃত বই তিনি কাছে পান নি, তাই অনেক অসম্পূর্ণতা রয়ে গিয়েচে। রাগরাগিণী সম্বন্ধেও তিনি বিস্তৃত ভাবে লিখে যেতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর বই তীক্ষ্ণবুদ্ধির, বিশৃঙ্খলকে সুসম্বদ্ধ করার চেষ্টার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত।

রমেশ—তবে দাঁড়াল যে একখানা বই আছে তাও মরাঠিতে লেখা, আমাদের দোষ কতটুকু তুমি নিজেই ভেবে দেখ।

সুরেশ—অন্য কোন দেশ হলে এ বই এতদিন বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে যেত। মরাঠি আমি সামান্য বুঝি, এবং এটুকু বলতে পারি যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে এই সহজ, সরল এবং অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অমানুষিক পরিশ্রমের নিদর্শনটা অবোধ্য হবে না। এ ছাড়া 'লক্ষ্যসঙ্গীতম্' বলে একটা ছোট সংস্কৃত বই তিনি লিখেচেন, তার দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। বরোদা কনফারেন্সে অভিভাষণ ও কয়েকটা প্রবন্ধ ছাড়া পণ্ডিতজী ইংরাজীতে কিছু লেখেন নি।

রমেশ—আচ্ছা শিক্ষিতদের কথা না-হয় ছেড়ে দিলাম, কিন্তু জন-সাধারণ তোমাদের কতটুকু বুঝতে পারল ? মানুষের স্বাভাবিক জল বায়ু মাটির সংস্পর্শ ছেড়ে কৃত্রিম আবহাওয়ায় তোমরা সঙ্গীতকে লালন করলে, এখন দোষটা অন্যের ঘাড়ে ঝেড়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হতে চাও। পথের মানুষ যা বুঝল না, সংসারের গুটিকয়েক লোকের মধ্যে যার সমাপ্তি হল, তুমি বলবে তাই বড়।

সুরেশ—তোমার উক্তির পেছনে ফরাসী বিপ্লবের equality, fraternity ইত্যাদি বলশালী কথাগুলির ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। টলষ্টয়ের শেষ জীবনে আর্ট সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু গোটাকতক তথ্য তুমি সত্য বলে ধরে নিয়েচ, স্থির হয়ে বিচার কর, তোমার অভিজ্ঞতার সায় পাবে না। তোমার প্রথম কথা সকলের সব কথা বুঝতে হবে এবং দ্বিতীয় এই যে যেই কোন কিছু সাধারণের দুর্বোধ্য হতে আরম্ভ করল অমনি হল কৃত্রিম। সাধারণকে ভালবাস ক্ষতি নেই, বিশ্বপ্রেম কথাটা অত্যুক্তি নয়, কিন্তু যার যা আয়ত্তের বাইরে, সে ভার যদি তার উপর চাপাও, সেই মুহূর্ত্তে তা দুর্ভর হয়ে উঠবে। টাকা, জমি, সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য সমানভাবে বণ্টন কর আপত্তি নেই, কিন্তু জন্মগত অধিকারসূত্রে মানুষ যা পায় সেখানে হস্তক্ষেপ চলে না। পারিপার্শ্বিককে হাজার নিয়ন্ত্রিত করলেও তুমি শেলির মত কবি বা আইনষ্টাইনের মত বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি করতে পারবে না। তোমার প্রথম অভিযোগের উত্তর,

এই জগৎ যাঁদের বড় বলে মেনে নিয়েচে, তাঁরা সাধারণের বুদ্ধির বাইরে রয়ে গিয়েচেন। কিন্তু যদি বল সেই কারণে তাঁরা কৃত্রিম ত আমি প্রতিবাদ করব। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' বা 'ঘরে বাইরে' গ্রামের লোকে বুঝবে না কিন্তু এ কি তুমি বলতে পার, তাঁর বইয়ের সঙ্গে গ্রাম্য জীবনের অনুভূতির কোথাও যোগ নেই? কৃষক তার উপলব্ধি হয়ত ভাষায় সুন্দর করে প্রকাশ করতে পারে না, কিন্তু তার সুখ দুঃখ সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা, তার জীবনে প্রেম নিষ্ঠুরতা, মৃত্যুর অনুভূতির মূল সত্তা কি রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির থেকে পৃথক? হিন্দুস্থানী উচ্চসঙ্গীত ওস্তাদদের হাতে সংস্কৃত হলেও সঙ্গীতের যে বৈশিষ্ট্য ঐকান্তিকভাবে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে তা সে হারায় নি। ঠুংরী বলে যা গাওয়া হয়, তার পনরো আনা গ্রাম্য সঙ্গীতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বড় খেয়ালী ধ্রুপদীরা তা গাইতে সঙ্কোচ বোধ করেন না।

রমেশ—তবু একটা কর্ত্তব্য কি নেই? লোকে যদি শুধু নিজের প্রতিভাবিকাশে ব্যস্ত থাকে, সেটা কি নিছক স্বার্থপরতা নয়?

সুরেশ—জগতে অনেকগুলি নিয়ম আছে তা নিষ্ঠুর কিন্তু তা বলে অস্বীকার করলে শেষ পর্য্যন্ত শুভ হয় না। পাপিয়ার গান তোমার ভাল লাগা বা না-লাগার অপেক্ষা করে না, সে গেয়ে যায়, সেটা তার ধর্ম্ম। তুমি যদি তাকে মেরে ফেলতে চাও মার; কিন্তু সে কোনপ্রকারেই অন্তরে বোঝাবার মত কোন পরোপকার বা কর্ত্তব্য করতে পারবে না। তুমি ত দর্শনের অনুরাগী, শুনতে পাই স্ত্রীকেও যথেষ্ট ভালবাস। তাঁকে ক্যাণ্টের Critique কর্ত্তব্যপরায়ণ হয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে দেখতে পার। ভাল-বাসার, কর্ত্তব্যের কোন কথাই এখানে আসচে না। বিষয়টী নির্ভর করচে গ্রহীতার যোগ্যাযোগ্যতার উপর। হাজার বছর ধরে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত গড়ে উঠেচে, সেটা কিঞ্চিৎ দুরূহ হবেই। সমস্ত বিদ্যা সাধনার অপেক্ষা রাখে, আর গান শুনলেই বুঝতে পারা যাবে এমন কোন কথা নেই। কানে শুনতে পেলেই তা সহজ হয়ে যায় না, ঠিক করে শোনা শিখতে হয়, অভ্যাস করতে হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে শেষ কথা এখনও বলা হয় নি। সাধারণকে বোঝাবার জন্যে কোন বড় চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত হয় নি। মাত্র রাশিয়ায় তার সূচনা হয়েচে। এর ফলাফল কিছুদিন না গেলে বোঝা যাবে না। ললিতকলার চর্চ্চটা কতদূর ব্যাপক হতে পারে, এর প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি। লেলিন এদিকে কিছু ভেবেছিলেন, তাঁর স্ত্রীর লেখা জীবনী থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। জনপ্রিয় সাহিত্যের সম্বন্ধে যে কথাটা আছে, সঙ্গীতেও তা প্রযোজ্য হতে পারে—

"But while working hard to assure that he conveyed his ideas to the workers in the clearest and best possible form, Ilyich at the

same time remonstrated against all vulgarisation, all attempts to narrow the question down for the workers, to simplify its substance. Ilyich wrote in 'What is to be done?' (1901-1902) "Attention must be devoted principally to the task of *raising* the workers to the level of revolutionists, but without, in doing so, necessarily *degrading* ourselves to the level of the 'labour masses,' as the economists wish to do . . . . . . I am far from denying the necessity for popular literature for the workers, especially popular (but, of course, not vulgar) literature for the especially backward workers. . . . . You, gentlemen, who talk so much about the 'average workers,' as a matter of fact rather insult the workers by your desire to *talk down* to them, to stoop to them when discussing labour politics or labour organisation. Talk about serious things in a serious manner."

(Memoirs of Lenin by N. Krupskaya, p. 193).

এখন সেইজন্য কৃষক ও শ্রমিক সকলে নিয়মিত উচ্চ সঙ্গীতের concert-এ যেতে আরম্ভ করেচে। কিন্তু এত বড় বিশাল দেশে চট করে সবরকম সুব্যবস্থা হওয়া কঠিন, তাই এখনও যে সকলে পর্য্যাপ্ত সুযোগ পেয়েচে এমন বলা যায় না। ভারতের প্রত্যেক গ্রামে যদি একটা রেডিও সেট থাকে, রমেশ, কি বল তুমি?

রমেশ—লোকগুলো কিছু শুনতে পায়, অন্ততঃ কলকাতার বম্বের ব্রডকাষ্টিং-এর যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু রাশিয়ার সাহিত্যে ও নাটকে যূথবদ্ধ সমাজের মহিমা কীর্ত্তন ছাড়া সোভিয়েটরা আর যে কিছু লিখতে দেয় না, এখানে কি তোমার কথাটা খাটচে?

সুরেশ—মানুষের চিন্তাকে যেখানে সক্রিয় হতে দেয় না সে দেশে বাঁচার মত দুর্ভাগ্য কমই আছে। রাশিয়ার নিজের উপর নির্ভর এত কম কেন বুঝতে পারিনে। আর্টেও তার প্রোপাগাণ্ডা চালান চাই। লোকে অনুশাসন অনুযায়ী সাহিত্য লিখবে একথা ভাবতে ভয় করে। চিন্তা মানেই মনের স্বাধীনতা, একটা ছাড়া অন্যের কোন অর্থ থাকে না। কিন্তু আমরা অবান্তর বিষয়ে এসে পড়েচি। সঙ্গীতে ব্যক্তিক ও সামাজিক ভেদ করা কঠিন, নইলে আজ সারা রাশিয়ায় কমিউনিজম-মার্কা সঙ্গীত চলত।

রমেশ—মহাত্মাজী ত শুনি বলেন গানের মধ্যে ভজনই যথেষ্ট আর ছবির বদলে আকাশের তারা দেখলেই চলবে।

সুরেশ—মহাত্মাজীর মত কি আমি জানি না, কারণ তিনি এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভাবে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন নি। সেদিন কাগজে দেখলাম তায়াবজীর কন্যা উপবাসের সময় তাঁকে গান শুনিয়ে প্রীত করেচেন। লোকমুখে শুনতে পাই তিনি সুগায়িকা ও ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেয়ালী ফৈয়াস খাঁর শিষ্যা। সুতরাং উচ্চ অঙ্গের গান হয়ত ভাল বলতেও পারেন।

কিন্তু শিক্ষিত এবং সাধারণ নিয়ে তর্ক করতে করতে আমরা অনেক এসে পড়েচি, তোমার static ও traditional কথাটার উত্তর দিতে আমি ভুলে যাই নি। সাধারণের পক্ষে আমি এইটুকু বলতে উচ্চ সঙ্গীতের শ্রোতার ও গায়কের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাবে, সংখ্যাও কিছু বাড়বে।

রমেশ—শিল্পীর বেলায় কিছু কেন ?

সুরেশ—ওপথ চিরকালই কিঞ্চিৎ দুর্গম রইবে এমন ভাবা নয়। য়ুরোপে সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ যথেষ্ট, কিন্তু আর্টিষ্ট সেই বাড়ে নি, কিছু কমেচে। সেটার হেতু যোগ্য মানুষের অভাব যুগপ্রভাব, এ বলা শক্ত। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্চ কেন যারা ভালবাসে তারাও একরকম শিল্পী। মনস্তত্ত্বের বইতে পাওয়া যায় শ্রোতা ও গায়কের মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়ায় বিশেষ কোন পার্থক্য সাধারণ যদি এসব সুকুমারবৃত্তি থেকে বঞ্চিত থাকত ত কলাবিদ্যার প্রাণবিয়োগ ঘটত।

রমেশ—তোমার কথাগুলো অনেকটা প্রবোধবাক্যের মত শোনাচ্চে তবে হিন্দুর সংস্কারে অধিকার ভেদের কথা জড়িয়ে আছে, ক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ নেই। আর্টিষ্ট যা সুখ পায়, তার বদলে তার যে দাম দিতে সেটাও বিবেচ্য। কিন্তু এখন আসল কথায় আসা যাক।

সুরেশ—ভূমিকা দীর্ঘ হয়ে পড়েচে, বেলাও হল। আমার রাগালাপে ক্ষিপ্ত হয়ে থাকেন, দেরি হলে তাঁর মেজাজটা বিলক্ষণ তিক্ত হবে বলা বাহুল্য এবং সে কারণে বক্তব্যটী সংক্ষিপ্ত তোমার এবং আমার বিশেষ কল্যাণের সম্ভবিনা। Static ও traditional-এর বাংলা যদি 'চলৎশক্তিহীন' ও 'গতানুগতিক' করি, আপত্তি আছে ?

রমেশ—অনুবাদটা একটু নিরঙ্কুশ হয়ে পড়ল, যাক বোঝা যাক।

সুরেশ—প্রাচীন সঙ্গীতের সধ্বনি বিবরণ দেওয়া যায় না একেত সে সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম না ও দ্বিতীয়তঃ ফোনোগ্রাফ আবিষ্কার হয় নি। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত যে বরাবর চলে এসেচে, সভ্যতার সংঘাতে পুষ্ট হয়েচে, কোথাও অচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে একথা বোঝাতে হলে পুঁথির সাহায্য নিতে হবে। এ পরিচ্ছেদটা প্রমাণের জন্য হাজির করাতে অতিশয় সংক্ষিপ্ত হবে, সাঙ্গীতিক পরিভাষার আশ্রয় নিতে হবে, সুতরাং অস্পষ্ট হলে তুমি রাগ কোরো না। বেদে তিন প্রকার স্বরের উল্লেখ পাওয়া যায়। সাম, ঋক, গাথা

এক দুই তিন স্বরের সমষ্টি ছিল ও এক প্রকার ৪ স্বরের স্কেল ব্যবহার হত তার নাম ছিল স্বরান্তর। এইসব স্বরের পরস্পরের সঙ্গে কি সম্বন্ধ ছিল অর্থাৎ তারা আমাদের 'সা, রে, গা, মা'র মত ছিল, না অন্য কোন-প্রকার ছিল তাও বোঝা যায় না। সামবেদী ব্রাহ্মণেরা এখন খৃঃ পূঃ ১৫০০ বছর পূর্ব্বের গান করেন না, সুতরাং জানার কোন উপায় নেই। তারপরই আমরা ভরতের নাট্যশাস্ত্র পাই, সেটা পঞ্চম খৃষ্টাব্দে লেখা। এর মধ্যে ৪ স্বরের স্কেল বেড়ে ৭টী স্বরে পৌছেচে, কিন্তু রাগরাগিণী সম্ভবতঃ এসে উপস্থিত হয় নি। গান খুব সম্ভব ছিল, কোন স্কেলে স্বরগুলি পর পর গেয়ে যাওয়া। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রত্নাকরের সময় রাগের নাম পাওয়া গেল, নাট্যশাস্ত্র আর রত্নাকরের মধ্যে কোন বই পাওয়া যায় না। এখন আমরা রাগ বলতে যা বুঝি তখন তা গাওয়া হত না। যা গীত হত, তার ধরণ ছিল সম্ভবতঃ অনেকটা বর্ত্তমান দক্ষিণী সঙ্গীতের মতন, কম্পন ছিল বেশী। আমার একটী মরাঠা বন্ধু অনুমান করেন এর স্বল্প চিহ্ন এখনও বাংলা ও মরাঠী গ্রাম্য সঙ্গীতে পাওয়া যায়, কথাটা খুব অযৌক্তিক নয়। রত্নাকরের সময় নানাপ্রকার নিয়মের ভারে রাগ আড়ষ্ট ছিল, সেটা অবশ্য আমাদের মতে, নইলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা নিশ্চয় খুব হৃষ্টচিত্তে সে সব গাইতেন সন্দেহ নেই। নাট্যশাস্ত্র এবং রত্নাকরের শুদ্ধ স্কেল তাঁদের দুরধিগম্য জটিলতার কারণে বোঝা গেল না। ঠিক এই সময় থেকে মুসলমান প্রভাব আমাদের গানে পড়ে। তাঁরা কাঠামটী রাখলেন হিন্দু, কিন্তু গানের চাল দিলেন বদলে, স্বরগুলি স্থির হতে আরম্ভ করল। খুব সম্ভব এই কারণে হিন্দুস্থানী উচ্চ সঙ্গীতে কম্পন বা tremolo-র স্থান নেই বল্লেই হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর রাগতত্ত্ববিবোধেও পারিজাত রাগের আরোহ অবরোহের সূচনা পাওয়া যায়। খুব সম্ভব তার 'উদ্‌গ্রাহক' তানের মধ্যে বর্ত্তমান রাগের পকড়ে-র (সংক্ষেপে যে কয়টী স্বরকে সংহতিকে কেন্দ্র করে রাগ নিজেকে প্রকাশ করে যেমন বেহাগে নিসাগমপ, গমগ বা হমীরে গমধ, নিধ, সা) ছায়া পাওয়া যায়। পারিজাত তাঁর শুদ্ধ স্বরগুলি তারের দৈর্ঘ্যের অনুপাতে দিয়ে দিলেন, সুতরাং তাঁর শুদ্ধ স্কেল ও রাগগুলির স্বর পাওয়া গেল। এর পর দুশ বছর ইতিহাসের দিক থেকে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু স্কেল যে আবার বদলেচে, অনেক রাগ লুপ্ত হয়েচে, কিছু পরিবর্ত্তিত হয়েচে, কিছু নতুন তৈরি হয়েচে এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। গত ১৬।১৭ বছরের মধ্যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত যে বিস্তর বদলেচে একথা আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। এখনও কি বলতে চাও হিন্দুস্থানী গান আজ

অচল অনড় হয়ে স্থাণুর মত বিরাজ করচে। কিন্তু এসব কথা ছেড়ে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি যে static হলে কি হিন্দুস্থানী গান এক ঘেয়ে হয়ে আপনি মরে যেত না? জোর করে অচল জিনিষকে আর কোথায় চালান যায় কিনা জানি না, অন্ততঃ আর্টে এতদিন এ প্রবঞ্চনা চলত না এটা ঠিক।

রমেশ—কিন্তু স্বর ত তোমাদের মোটে বারটী, তাদের দিয়ে কত বৈচিত্র্যের স্বষ্টি তুমি করবে? লোকে সাধে traditional বলে

সুরেশ—বাংলা ভাষায় অক্ষরগুলির সংখ্যা পঞ্চাশের বেশী নয় কিন্তু তা দিয়ে শব্দবিন্যাসের অন্ত আছে? অঙ্ক কষে এ বৈচিত্র্যের সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না। গান যদি করতে ত বুঝতে পারতে রাগে বারটী স্বরের ব্যবহার কত বিভিন্ন ও বিচিত্র হতে পারে। তারপরে অনেক রাগে এ বারটী স্বর ছাড়া অন্য স্বরেরও দরকার হয়। এই জন্যেই কি গতানুগতিক বলতে চাও? সুরের মধ্য দিয়ে নিজের emotion প্রকাশ করাই সঙ্গীত, যদি অন্য কোন মধ্যবর্ত্তীর আশ্রয় নেও, তাকে অন্য নাম দিও। আমি এইটুকু বলতে চাই যদি static বলে স্বীকার না কর, তাহলে traditional-এর যুক্তি সেই সঙ্গেই ভেঙ্গে পড়ে। আমেরিকান সভ্যতার পেছনে tradition না থাকাতে কি অসুবিধা হচ্ছে সে তর্ক আজ নাই বা তুললাম।

রমেশ—যাক, ওকথা ছাড়, বাংলা গানে যে সুন্দর ভাব, কবিত্বের পরিচয় পাই, এ ত তুমি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে দিতে পারবে না।

সুরেশ—কবিত্ব একেবারে নেই একথা বোলোনা। প্রকৃতির, মানুষের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ, ভালবাসা, অভিমান, ঈশ্বরে ভক্তির বর্ণনা নিয়েই হিন্দুস্থানী গান। আমাদের সুসভ্য কানে তত উচ্চ কাব্যের খোরাক সে জোগায় না, কিন্তু মানুষের চিরন্তন আদিম প্রবৃত্তির বর্ণনা কোনদিনই নীরস হবে না। সূক্ষ্ম কাব্যরসপূর্ণ কবিতা হিন্দী লেখকগণ আরম্ভ করেচেন কিনা আমার জানা নেই, কিন্তু আমরা যারা গান করি শব্দমাধুর্য্যের অভাব কখনও বোধ করি না। কত গান ১৫০।২০০ বছর গাওয়া হচ্ছে, এখনও একটুও পুরোনো মনে হল না। কিন্তু কথার সংস্কৃত মাধুর্য্য যদি না থাকে, তাহলে সঙ্গীতের কি কোন ক্ষতি হল? সঙ্গীতের সম্বন্ধে তোমরা মস্ত ভুল কর, কথা ছাড়া নিজেকে প্রকাশ করবার emotion যেন সুরেতে থাকতে পারে না। কথায় তুমি নিজের যতটুকু বিকীর্ণ কর, সুরের আবেদন তার চেয়ে গভীরতর স্তরে গিয়ে স্পর্শ করে। বাংলা গানেও যে সুরই বেশী চাও, বাংলা গান থেকেই তা প্রমাণ করতে পারি। বাংলা গানে সুর যেই পুরোনো হয়, সেই মুহূর্ত্তেই লোকে তাকে ভুলে

আরম্ভ করে, শত কবিত্ব-সম্ভারও তাকে তুলে ধরে রাখতে পারে না। বাংলার প্রত্যেক গান তাই স্বল্পায়ু। কথার অংশ সঙ্গীতে নিতান্তই গৌণ। Lowes Dickinson তাঁর After Two Thousand Years নামে বইতে Plato এবং Philalethes-কে যথাক্রমে প্রাচীন গ্রীক ও বর্ত্তমান সভ্যতার প্রতিনিধিরূপে দাঁড় করিয়েচেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁদের মতামতটা উদ্ধৃত করলে মন্দ লাগবে না—

"PLATO—In them (Greek music), at any rate, you can hardly deny an ethical character since there the words determine the music.

PHILALETHES—Not so much as with you, for with us the music is more important than the words. And perhaps that is as well, for, as our songs are sung, we can seldom hear the words at all." (P. 158).

রমেশ—বাংলা গানে কত নতুন মিষ্টি সুর তৈরি হচ্ছে এটা তুমি স্বীকার কর কিনা।

সুরেশ—করি, তার খানিকটা হিন্দুস্থানী রাগ থেকে নেওয়া, খানিকটা গ্রাম্যসঙ্গীতের কাছে পাওয়া, বাকিটা বিলিতি মেলডির অনুকরণ। এতে আমি কোন দোষ দেখি না, সব দেশের গানেই এসব মিশেল থাকে। কিন্তু যদি বল নতুন সৃষ্টি ত আমি আপত্তি করব। বাংলা গান যদি য়ুরোপের নকল করে, হার্ম্মনি (স্বরসমূহের যুগপৎ সুমিষ্ট ব্যবহার) এসে পড়বে, যে ক্ষীণ চেষ্টা কখনও কখনও এদিক ওদিক দেখতে পাই। হার্ম্মনিতে য়ুরোপীয়ের সঙ্গে টেক্কা দিতে যাওয়া আর বামনের চাঁদে হাত দেওয়া একই কথা। মেলডির (স্বরসমূহের পর পর ব্যবহার) দিকে হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীত তার বিশাল সমৃদ্ধি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাংলা গানের সৌন্দর্য্য নেই এমন বলি না, নিজের স্থানটীতে অর্থাৎ বাংলার মর্ম্ম-স্থানে সে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত জগতে এরকম গান ছড়িয়ে আছে; চীনে আছে, কঙ্গোর অরণ্যে আছে, মেক্সিকোতে আছে, সুইস আল্পসে আছে ও ভারতে সর্ব্বত্র আছে। এগুলো হচ্ছে গান, রাগ ভিন্ন জিনিষ। পৃথিবীতে একমাত্র ভারতে মেলডির এইদিকে পরিণতি হয়েচে।

রমেশ—হিন্দুস্থানী গানে যদি হার্ম্মনি আসে?

সুরেশ—কি করে আসবে? রাগ মুখস্থ করে গাওয়া যায় না। প্রত্যেক গাইয়ে প্রতিবার একই রাগ গাইতে পারে, অথচ একরকম করবে না। স্রোতের গায়ে অলঙ্কার দিতে হলে, প্রতি মুহূর্ত্তে হার্ম্মনির সৃষ্টি করতে হয়, মানুষের তা সাধ্যাতীত। ভারতে গাইয়েরা রাগ মুখস্থ করেন না, বা অন্যের composition য়ুরোপীয়ের মত interpret করেন না। বস্তুতঃ দুই সভ্যতার সাঙ্গীতিক মনোভাব আলাদা।

রমেশ—তার মানে ভারতীয় রাগ কোনকালেই পুরাতন হবে না।

সুরেশ—ভবিষ্যতের কথায় অনুমান করাই ভাল, কোন স্থির সিদ্ধান্তে না আসাই শ্রেয়ঃ। কখনো হবে না একথা কি করে বলি? মানুষের রুচির স্থৈর্য্য কতটুকু তা কে বলতে পারে? অনেক সময় শুধু অত্যধিক পরিণতির ভারে মানুষ শ্রান্ত হয়ে পড়ে। তখন হাতের কাছে যা পায়, তারই মাঝে বিশ্রান্তি বিরাম চায়। আমার মনে হয় সাহিত্য, চিত্রকলার ললাটে ক্লান্তির যে গভীর রেখা পড়েচে, সঙ্গীতেও তাই হবে। য়ুরোপীয় সঙ্গীতে আরম্ভ হয়েচে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেও নতুন experiment-এর যুগ এল বলে।

রমেশ—তোমার কি মনে হয় না এ নিরুদ্ধ বেদনায় কোন নবসৃষ্টির আবির্ভাব সূচিত হচ্চে।

সুরেশ—নবসৃষ্টির আবির্ভাবকে একটু ঘুরিয়ে বললে দাঁড়ায় বর্ত্তমান সৃষ্টির মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ। জগতে অনেক সভ্যতার লোপের কত কারণ বার হয়। কেউ গেল বিভিন্ন সভ্যতার সংঘাতে, কেউ অনুন্নতের সঙ্গে বিবাহ করে, কেউ সাম্রাজ্য সামলাতে না পেরে, কেউ ম্যালেরিয়া, কেউ অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতির আক্রমণে, এমনি কত কি। আবার ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখি জাতি মরে যায়, তার মনের সম্পদ চারিদিকে বিকীর্ণ হয়। গ্রীসের দর্শন বিজ্ঞান স্থাপত্য, রোমের ব্যবহার-বিধি কি সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড়ে নি? ভারতে যদি হিন্দুস্থানী গান মরে যায়, সে পরবর্ত্তী সঙ্গীতের মাঝে কোথাও অবিনশ্বর হয়ে থাকবে এ আশা আমার আছে।

রমেশ—এর মধ্যে সব জাতগুলো যদি যুদ্ধ করে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে এসব বালাই বড় একটা থাকবে না। তবে সম্ভবতঃ মানুষ সে পথে যাবে না। কিন্তু হিন্দুস্থানী খেয়াল গাওয়া উঠে গিয়েচে, আর তুমি বেঁচে আছ এটা ভাবতে আমার কষ্ট হয়।

সুরেশ—মানুষের স্বভাব আজন্ম যাতে পুষ্ট হয় তাকে ছাড়তে পারে না। সে অনাগত ভবিষ্যতে আমি ব্যথা পেতে পারি, কিন্তু আশ্চর্য্য হব না।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

গদ্যের ছন্দ *

পদ্যের ছন্দ লইয়া প্রায় সমস্ত প্রধান ভাষাতেই অল্পাধিক চর্চ্চা হইয়াছে, এবং বিভিন্ন ভাষায় প্রচলিত কাব্যছন্দের রীতি নির্ণয়ের চেষ্টাও হইয়াছে। কিন্তু ছন্দ কেবল পদ্যে নয়, গদ্যেও আছে। ব্যাপক অর্থে ধরিলে, ছন্দ সমস্ত সুকুমার কলারই লক্ষণ। সুলিখিত গদ্যও যে সুন্দর হইতে পারে তাহা আমরা সকলেই জানি, এবং সেই সৌন্দর্য্য যে মাত্র অর্থগত বা ভাবগত নয়, তাহার যে বাহ্য রূপ আছে, ধ্বনি-বিন্যাসের কৌশলে তাহা যে 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করিতে ও আবেগের দ্যোতনা করিতে পারে, সে রকম একটা বোধও আমাদের অনেকের আছে। অর্থাৎ ছন্দোময় গদ্যের অস্তিত্ব আমরা অনেক সময়ে অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু গদ্যছন্দের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য তাদৃশ চেষ্টা হয় নাই, এবং ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও খুব স্পষ্ট নহে। Aristotle বলিয়া গিয়াছেন যে গদ্যেরও rhythm অর্থাৎ ছন্দঃ আছে, কিন্তু তাহা metrical অর্থাৎ কাব্যছন্দের সমধর্ম্মী নহে। গদ্য-ছন্দের ও কাব্য-ছন্দের পরস্পর পার্থক্য কিসে—এতৎসম্বন্ধে Aristotle-এর মতামত জানা যায় না। যাঁহারা Latin ভাষার বিশেষ চর্চ্চা করিয়াছেন তাঁহারা Cicero প্রভৃতি সুবক্তা ও সুলেখকগণের রচনায় ছন্দের সুস্পষ্ট লক্ষণ পাইয়াছেন এবং নিয়মিত cursus ব্যবহার ইত্যাদি রীতি লক্ষ্য করিয়াছেন। Latin ভাষার শেষ যুগেও Vulgate Bible ইত্যাদিতে ছন্দের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইংরাজী ধর্ম্মপুস্তকাদিতে Vulgate Bible-এর প্রভাব যথেষ্ট, এবং ছন্দোলক্ষণাত্মক গদ্য ব্যবহারেও সে প্রভাব লক্ষিত হয়। কিছুকাল হইতে ইংরাজী সাহিত্যরসিকবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ গদ্যের ছন্দ লইয়া আলোচনা করিতেছেন এবং তাহার ফলে ইংরাজী গদ্যছন্দ সম্পর্কে সমস্ত জিজ্ঞাসার তৃপ্তি না হইলেও এতদ্বিষয়ে ধারণা অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে। বাংলা গদ্যছন্দ লইয়া এ পর্য্যন্ত কেহ আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বাংলা গদ্যছন্দ সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি তথ্য আলোচনা করার চেষ্টা হইবে।

ইংরাজী উচ্চারণে accent-এর গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া accent-এর অবস্থানের উপরেই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে। ইংরাজী পদ্যছন্দের ন্যায় ইংরাজী গদ্যছন্দেও accentই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ধ্বনিলক্ষণ। কিন্তু বাংলায় যতির অবস্থানের উপরেই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর

* বর্ত্তমান প্রবন্ধে পদ্যছন্দ সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য করা হইয়াছে এবং যে সমস্ত পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার ব্যাখ্যা লেখকের 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' নামক গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

করে। দুই যতির মধ্যবর্ত্তী শব্দসমষ্টি বা পর্ব্বের মাত্রা অনুসারে বাংলা ছন্দোবিচার চলে। পদ্যছন্দ ও গদ্যছন্দ উভয়ত্রই এ কথা খাটে। ছন্দো গদ্যেরও উপকরণ—এক এক ঝোঁকে (impulse) সমুচ্চারিত শব্দসমষ্টি অর্থাৎ পর্ব্ব। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্—

"সত্য সেলুকস্! কি বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য এর গাঢ় নী আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়; আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন এর আকা ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি। প্রাবৃটে ঘন-কৃষ্ণ মেঘরাশি গুরু গম্ভীর গর্জ্জনে প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের মত এর আকাশ ছেয়ে আসে, আমি নির্ব্বা হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখি। এর অভ্রভেদী ধবল তুষার-মৌলি নীল হিমাদ্রি স্থিরভা দাঁড়িয়ে আছে। এর বিশাল নদ নদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দামবেগে ছুটেছে। এ মরুভূমি বিরাট্ স্বেচ্ছাচারের মত তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা কর্চ্ছে।"

(দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—চন্দ্রগুপ্ত, প্রথম দৃশ্য)

উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তির ভাষা গদ্য হইলেও তাহা যে ছন্দোম —এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। বাংলা গদ্যছন্দের ইহা খুব উৎকৃষ্ট উদাহরণ নয়। এতদপেক্ষা আরও চমৎকার ও আবেগময় ছন্দোবদ্ধ গদ্য—রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও কালীপ্রসন্ন ঘোষের গদ্য রচনায় পাওয়া যায়। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তির আবৃত্তির রীতি শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই বোধ হয় সুপরিচিত। সহর মফস্বলের রঙ্গমঞ্চে এমন কি অনেক বিদ্যালয়েও বহুবার এই কয়েকটি পংক্তির আবৃত্তি হইয়াছে। সুতরাং এই রচনার ছন্দ লইয়া আলোচনা করিলে তাহা সকলেরই প্রণিধান করা সহজ হইবে।

যতি মাত্রাভেদে দুই প্রকার—অর্দ্ধযতি ও পূর্ণযতি। গদ্যে এক একটি phrase বা অর্থবাচক শব্দসমষ্টি লইয়া, কখন কখন বা এক একটি শব্দ লইয়া এক একটি পর্ব্ব গঠিত হয়, এবং এবম্বিধ পর্ব্বের পর একটি অর্দ্ধযতি পড়ে। কয়েকটি পর্ব্ব সহযোগে গদ্যের এক একটি বৃহত্তর বিভাগ অর্থাৎ বাক্য বা খণ্ডবাক্য গঠিত হয়, এবং তাহার পরে এক একটি পূর্ণযতি পড়ে। উদ্ধৃত পংক্তি কয়েকটির পর্ব্ব বিভাগ করিলে এইরূপ দাঁড়াইবে।

[। চিহ্নের দ্বারা অর্দ্ধযতি এবং ॥ চিহ্নের দ্বারা পূর্ণযতি নির্দ্দেশ করা হইবে]

১ম বাক্য - সত্য, । সেলুকস্ ॥
২য় „ - কি বিচিত্র । এই দেশ ॥
৩য় „ - দিনে । প্রচণ্ড সূর্য্য । এর গাঢ়-নীল আকাশ । পুড়িয়ে দিয়ে যায় ॥
৪র্থ „ - আর । রাত্রিকালে । শুভ্র চন্দ্রমা এসে । তাকে । স্নিগ্ধ জোৎস্নায় । স্নান করিয়ে দেয় ॥

৫ম বাক্য - তামসী রাত্রে । অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে । যখন । এর আকাশ । ঝলমল করে ॥
৬ষ্ঠ „ - আমি । বিস্মিত আতঙ্কে । চেয়ে থাকি ॥
৭ম „ - প্রাবৃটে । ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি । গুরু-গম্ভীর গর্জ্জনে । প্রকাণ্ড দৈত্য-সৈন্যের মতন । এর আকাশ ছেয়ে আসে ॥
৮ম „ - আমি । নির্ব্বাক্ হয়ে । দাঁড়িয়ে দেখি ॥
৯ম „ - এর । অভ্রভেদী । ধবল তুষার-মৌলি । নীল হিমাদ্রি । স্থিরভাবে । দাঁড়িয়ে আছে ॥
১০ম „ - এর । বিশাল নদনদী । ফেনিল উচ্ছ্বাসে । উদ্দাম বেগে । ছুটেছে ॥
১১শ „ - এর । মরুভূমি । বিরাট্ স্বেচ্ছাচারের মত । তপ্ত বালুরাশি নিয়ে । খেলা কর্চ্ছে ॥

পদ্যের পর্ব্বের ন্যায় গদ্যের পর্ব্বও দুইটি বা তিনটি পর্ব্বাঙ্গের সমষ্টি। পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত পর্ব্বাঙ্গগুলির পরস্পর অনুপাত ও তুলনা হইতে-ই এক একটি পর্ব্বের বিশিষ্ট ছন্দোলক্ষণ জন্মে এবং স্পন্দনানুভূতি হয়। বাংলায় পদ্যের ন্যায় গদ্যেও ছন্দের হিসাব চলে মাত্রা অনুসারে। বাংলা গদ্যে মাত্রাপদ্ধতি পয়ারজাতীয় পদ্যের পদ্ধতির অনুরূপ; অর্থাৎ প্রত্যেক অক্ষর বা syllable এক মাত্রা বলিয়া ধরা হয়, কেবল শব্দের অন্ত্য অক্ষর হলন্ত হইলে তাহাকে দুই মাত্রা ধরা হয়। এক কথায়, গদ্যের মাত্রাপদ্ধতি বর্ণমাত্রিক। * এই পদ্ধতিই বাংলা উচ্চারণের সাধারণ ও স্বাভাবিক পদ্ধতি। তবে, মাত্রার দিক্ দিয়া বাংলা উচ্চারণের রীতি একেবারে বাঁধাধরা নয়, আবশ্যক মত আবেগের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে শব্দের অন্ত্য হলন্ত অক্ষর ছাড়া অন্যান্য অক্ষরেও দীর্ঘীকরণ করা যাইতে পারে।

গদ্যেও এক একটি পর্ব্বাঙ্গ সাধারণতঃ দুই, তিন বা চার মাত্রার হইয়া থাকে। কখন কখন এক মাত্রার পর্ব্বাঙ্গও দেখা যায়।

গদ্যে পর্ব্বাঙ্গ-মাত্রেই একটি বা ততোধিক গোটা মূলশব্দ থাকিবে। গদ্যে শব্দাংশ লইয়া পর্ব্বাঙ্গ গঠন করা চলে না। সুতরাং বলা বাহুল্য যে গদ্যের এক একটি পর্ব্বে কয়েকটি গোটা মূল শব্দ থাকিবে।

পদ্যের পর্ব্বের সহিত গদ্যের পর্ব্বের প্রধান পার্থক্য এই যে পদ্যে পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত পর্ব্বাঙ্গগুলি হয় পরস্পর সমান হইবে, না হয় তাহাদের

* পয়ারজাতীয় ছন্দের মাত্রাপদ্ধতি বর্ণমাত্রিক বলিয়া ইহার বিরুদ্ধে কেহ কেহ অভিযোগপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, ইহা লিপিকরদিগের চাতুরী হইতে উৎপন্ন। বাংলায় লিখনের একটি বিশিষ্ট প্রথা হইতে না কি ইহা উৎপন্ন। এমত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, ছন্দোবোধ দৃষ্টিগত নয়, শ্রুতিগত। লিপিচাতুর্য্য দিয়া কানকে ঠকান যায় না। বরং বলা যায় যে বাংলার স্বাভাবিক মাত্রাপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই বাংলার লিপিপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ঘটিয়াছে। সুতরাং পূর্ণকায় বর্ণসংখ্যা হইতে মাত্রাসংখ্যা বুঝা যায়।

মাত্রার ক্রম অনুসারে তাহাদিগকে সাজাইতে হইবে; কিন্তু গদ্যে নানা উপায়ে পর্ব্বের মধ্যে পর্ব্বাঙ্গগুলিকে সাজান যায়। আমাদের উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে নিম্নলিখিত ভাবে পর্ব্বাঙ্গ বিভাগ হইয়াছে, দেখা যাইতেছে।

		পর্ব্বসংখ্যা
১ম বাক্য -	[২] । [৪]	... ২
২য় " -	(১+৩-) ৪ । (২+২-) ৪	... ২
৩য় " -	[২] । (৩+২-) ৫ । (২+৪+৩-) ৯ । (৩+৪-) ৭	... ৪
৪র্থ " -	[২] । (২+২-) ৪ । (২+৩+২-) ৭ । [২] । (২+৩-) ৫ (২+৩+২-) ৭	... ৬
৫ম " -	(৩+২-) ৫ । (৩+৩+৪-) ১০ । [৩] । (২+৩-) ৫ । (৪+২-) ৬	... ৫
৬ষ্ঠ " -	[২] । (৩+৩-) ৬ । (২+২-) ৪	... ৩
৭ম " -	[৩] । (৪+৪-) ৮ । (২+৩+৩-) ৮ । (৩+৫?+২-) ১০ । (২+৩+৪-) ৯	... ৫
৮ম " -	[২] । (৩+২-) ৫ । (৩+২-) ৫	... ৩
৯ম " -	[২] । (২+২-) ৪ । (৩+৩+২-) ৮ । (২+৩-) ৫ । (২+২-) ৪ । (৩+২-) ৫	... ৬
১০ম " -	[২] । (৩+৪-) ৭ । (৩+৩-) ৬ । (৩+২-) ৫ । [৩]	... ৫
১১শ " -	[২] । (২+২-) ৪ । (৩+৫?+২-) ১০ । (২+৪+২-) ৮ । (২+২-) ৪	... ৫
		৪৬

এইবার বিশ্লিষ্ট উদ্ধৃতাংশের ছন্দোলক্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করার সুবিধা হইবে।

এখানে মোট ৪৬ টি পর্ব্ব আছে। তন্মধ্যে যে পর্ব্বগুলির দুই দিকে [ ] চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেগুলিতে মাত্র একটি করিয়া পর্ব্বাঙ্গ আছে। এইরূপ ১৩টি পর্ব্ব ১১টি বাক্যের মধ্যে আছে। মোটামুটি প্রত্যেক বাক্যে এইরূপ একটি পর্ব্ব থাকে ধরা যাইতে পারে। এইরূপ পর্ব্বে একটি মাত্র পর্ব্বাঙ্গ থাকে বলিয়া কোনরূপ ছন্দঃস্পন্দন ইহাতে পাওয়া যায় না, সুতরাং সূক্ষ্মবিচারে ইহাদের ছন্দের পর্ব্ব বলা উচিত নয়! বাস্তবিক পক্ষে ইহারা ছন্দের অতিরিক্ত (hypermetric) এক একটি শব্দ মাত্র। ইহাদিগকে বাক্যের মধ্যে যেখানে নূতন একটি ছন্দ-প্রবাহের আরম্ভ তাহার পূর্ব্বে পাওয়া যায়। কদাচ ছন্দ-প্রবাহের শেষেও ইহাদিগকে দেখা যায়। এই নিস্পন্দ শব্দগুলিকে ভর করিয়াই ছন্দ-তরঙ্গে ভেলা ভাসাইতে হয়, কখন কখন ছন্দের ভেলা আসিয়া এইরূপ শব্দগুলিতে ঠেকিয়া স্থির হয়।

পদ্যেও কখন কখন এইরূপ অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু গদ্যেই ইহাদের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত বহুল। *

বিশেষ করিয়া লক্ষ্যের বিষয় এই যে উদ্ধৃতাংশে নানা বিভিন্ন আদর্শে পর্ব্বের মধ্যে পর্ব্বাঙ্গের সন্নিবেশ হইয়াছে। পদ্যে তিনটি পর্ব্বাঙ্গের দ্বারা কোন পর্ব্ব গঠিত হইলে তাহাদের প্রথম দুইটি বা শেষ দুইটি পর্ব্বাঙ্গ সমান রাখিতে হয়, অপেক্ষাকৃত হ্রস্বতর বা দীর্ঘতর আর একটি পর্ব্বাঙ্গ পর্ব্বের আদিতে বা শেষে স্থান পায়, কিন্তু মধ্যে কদাচ তাহার স্থান হয় না। গদ্যে কিন্তু তাহা চলিতে পারে, এমন কি মধ্যলঘু বা মধ্যগুরু অর্থাৎ তরঙ্গায়িত ছন্দোযুক্ত পর্ব্বের ব্যবহারেই গদ্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ কানে ধরা পড়ে। উদ্ধৃতাংশে ১০টি পর্ব্বে তিনটি করিয়া পর্ব্বাঙ্গ আছে। তন্মধ্যে মাত্র তিনটির গঠনরীতি পদ্যরীতির অনুযায়ী ("অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে," "গুরু-গম্ভীর গর্জ্জনে," "ধবল-তুষার-মৌলি")। কিন্তু "শুভ্র চন্দ্রমা এসে" "তপ্ত বালুরাশি নিয়ে" ইত্যাদি পর্ব্বের ব্যবহার পদ্যে চলে না।

এতদ্ভিন্ন গদ্যে পরস্পর অসমান তিনটি পর্ব্বাঙ্গ লইয়াও পর্ব্ব গঠিত হইতে পারে, পদ্যে তাহা চলে না। এই ধরণের চারিটি পর্ব্ব উদ্ধৃতাংশে দেখা যায় ("এর গাঢ়-নীল আকাশ", "প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের মত", "এর আকাশ ছেয়ে আসে" "বিরাট্ স্বেচ্ছাচারের মত")। অসমান তিনটি পর্ব্বাঙ্গ থাকিলে বৃহত্তম পর্ব্বাঙ্গটি আদি, অন্ত বা মধ্য যে কোন স্থানে বসান যাইতে পারে। "এর গাঢ়-নীল আকাশ" এই পর্ব্বটিতে মধ্যে এবং "এর আকাশ ছেয়ে আসে" এই পর্ব্বটিতে অন্তে বৃহত্তম পর্ব্বাঙ্গটির স্থান হইয়াছে।

("প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের মত" ও "বিরাট্ স্বেচ্ছাচারের মত" এই দুইটি পর্ব্ব সম্বন্ধে একটি কথা বলা দরকার। আপাততঃ মনে হয় যেন ইহাদের সঙ্কেত ৩+৫+২, সুতরাং এই দুইটি পর্ব্বে যেন গদ্যছন্দের ব্যত্যয় হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের আবৃত্তি হয় ৩+৪+৩ এই সঙ্কেত অনুসারে, 'বিরাট্ স্বেচ্ছাচার এর্‌মত' এই ধরণে।)

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে গদ্যে নয়মাত্রার পর্ব্বের যথেষ্ট ব্যবহার আছে, কিন্তু পদ্যে নয়মাত্রার পর্ব্বের ব্যবহার দেখা যায় না। পদ্যে সাত মাত্রার পর্ব্ব যে ভাবে গঠিত হয়, তাহা ভিন্ন অন্য উপায়েও গদ্যে সাত মাত্রার পর্ব্ব রচিত হইয়া থাকে।

পদ্যছন্দ ও গদ্যছন্দের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পার্থক্য এই যে—পদ্যছন্দ ঐক্যপ্রধান এবং গদ্যছন্দ বৈচিত্র্যপ্রধান। পদ্যে এক একটি বৃহত্তর

* অনেক সময় পদ্যের মধ্যে গদ্যের আভাস আনার জন্য নূতন ধরণের বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয় এবং পদ্যের ব্যঞ্জনাশক্তি বৃদ্ধি হয়। ইহা সমস্ত ভাষাতেই ছন্দের একটি গূঢ় রহস্য। পদ্য ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ যোজনা করা গদ্যের আভাস আনিবার অন্যতম উপায়।

ছন্দোবিভাগের অর্থাৎ চরণের অন্তর্ভুক্ত পর্ব্বগুলি সাধারণতঃ সমান হয়, কেবল চরণের শেষ পর্ব্বটি পূর্ণ বিরামের পূর্ব্বে অবস্থিত বলিয়া অনেক সময় অপেক্ষাকৃত হ্রস্বতর হয়। যে স্থলে পর পর পর্ব্বগুলির মাত্রা সমান নয়, সে স্থলে কোন সুস্পষ্ট আদর্শের অনুসরণে তাহাদের মাত্রা নিয়মিত হয়। গদ্যে কিন্তু বৈচিত্র্যের-ই প্রাধান্য। পর পর পর্ব্বগুলি সমান না হওয়া কিম্বা কোন নক্সার অনুসরণে পর্ব্বের মাত্রা নিয়মিত না হওয়াই গদ্যের রীতি। বাক্যের অন্তর্ভুক্ত পর্ব্বগুলি সাময়িক আবেগের প্রকৃতি অনুসারে কখন কখন ক্রমে হ্রস্বতর, কখন কখন দীর্ঘতর হয়। কিন্তু বাক্যের শেষে পৌছিলে এইরূপ গতির প্রতিক্রিয়া হয়, প্রায়ই শেষ পর্ব্বে বিপরীত প্রবৃত্তি দেখা যায়। ইহাতেই গদ্যের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। এই ধরণের গতি হইতেই বিশিষ্ট গদ্যছন্দের লক্ষণ প্রকটিত হয়। উদ্ধৃতাংশের পর্ব্বগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ইহা বুঝা যাইবে।

প্রথম বাক্যটির দুইটি পর্ব্বই এক-শব্দ-যুক্ত এবং ছন্দঃস্পন্দনহীন। শুধু এই বাক্যটি হইতেই কোনরূপ ছন্দের অস্তিত্ব বুঝা যায় না। দ্বিতীয় বাক্যটিতে চারি মাত্রার পরস্পর সমান দুইটি পর্ব্ব আছে। দুইটি পরস্পর সমান পর্ব্ব থাকায় এই বাক্যটির ভারসাম্য রক্ষিত হইয়াছে। গদ্যে এইরূপ প্রতিসম বাক্যের ব্যবহার চলে, কিন্তু পদ্যছন্দেরই ইহা বিশিষ্ট লক্ষণ। সুতরাং ইহাতে বিশিষ্ট গদ্যছন্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যটি একত্র পাঠ করিলে এবং একই ছন্দ-প্রবাহের অংশ বলিয়া ধরিলে, গদ্যছন্দের লক্ষণ পাওয়া যায়। তাহা হইলে প্রথম বাক্যটিকে ৬ মাত্রার একটি পর্ব্ব এবং দ্বিতীয় বাক্যটিকে ৮ মাত্রার আর একটি পর্ব্ব বলিয়া ধরা যায়। সে ক্ষেত্রে গদ্যসুলভ উত্থানশীল (rising) ছন্দের ভাব আসিবে। তৃতীয় বাক্যটিতে একটি অতিরিক্ত শব্দের উপর ঝোঁক দিয়া ছন্দের প্রবাহ আরম্ভ হইয়াছে, পর পর পর্ব্বগুলি বিশিষ্ট গদ্যছন্দের আদর্শে অর্থাৎ তরঙ্গায়িত ভাবে (waved rhythm) সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ছন্দ-প্রবাহ প্রথমে উত্থানশীল এবং শেষে একটি উপান্ত্য পর্ব্বে পৌছিয়া পতনশীল হইয়াছে। এইরূপ পর্ব্ব সন্নিবেশ অন্যান্য বাক্যেও দেখা যাইবে। কোন কোন বাক্যে, যেমন ৪র্থ ও ৯ম বাক্যে, দুইটি প্রবাহ আছে। দুইটি প্রবাহের মধ্যস্থলে একটি ছেদের অবস্থান আছে। ছন্দের প্রবাহ কখন উত্থানশীল, কখন তরঙ্গায়িত। অনেক সময়ই ছন্দ-প্রবাহের ঝোঁক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার আছে। কদাচ যেমন ১০ম বাক্যে, পতনশীল ছন্দও পাওয়া যায়। ক্বচিৎ প্রতিসম পর্ব্বের যোজনা দেখা যায়, কিন্তু এ ব্যবহার গদ্যছন্দে খুব কম।

অন্যান্য আদর্শের ছন্দ-প্রবাহের মধ্যে পড়িয়া ইহার প্রভাব ক্ষীণ হইয়া থাকে।

পর পর পর্ব্বগুলি গদ্যে ঠিক একরূপ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহাদের মোট মাত্রাই সাধারণতঃ সমান থাকে না। যেখানে পর পর দুইটি পর্ব্বের মোট মাত্রা সমান, সে ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে পর্ব্বাঙ্গ সন্নিবেশের দিক্ দিয়া পার্থক্য থাকে। যেখানে সেদিক দিয়াও মিল আছে, সেখানে অন্ততঃ যুক্তাক্ষর ব্যবহারের দিক্ হইতে বৈষম্য আছে, এবং তদ্দারা সমান মাত্রার ও একই সঙ্কেতের দুইটি পর্ব্বের মধ্যে অসাদৃশ্য পরিস্ফুট হয়। এইরূপে গদ্যে বৈচিত্র্য রক্ষা হইয়া থাকে।

গদ্যে সাধারণতঃ এক একটি বাক্যেই ছন্দের আদর্শের পূর্ণতা হইয়া থাকে, সুতরাং স্তবক-গঠনের প্রয়াস থাকে না। তবে আবেগবহুল গদ্যে কখন কখন পর পর কয়েকটি বাক্য লইয়া একটি ছন্দের আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছে দেখা যায়। এ রকম স্থলে সেই আদর্শ তরঙ্গায়িত ছন্দের আদর্শের অনুরূপ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তরঙ্গায়িত ছন্দই গদ্যের বিশিষ্ট ছন্দ।

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

বিবাহ-বিধি

যে নিয়মে চন্দ্রসূর্য্য দেখা দেয়, বাতাস বহে, গাছে ফুল ফোটে, সেই নিয়মের শাসনেই মানুষের কাজ ও সমাজের গতি শাসিত হয়, ইহা বেশির ভাগ লোকে মানে না। আমাদের বিবাহ হয় নিজের ইচ্ছায়, না-হয় বড় জোর অভিভাবকদের ইচ্ছায়, আর স্বেচ্ছায় কত লোক অবিবাহিত থাকে; এ অবস্থা দেখিয়া অনেকে ভাবে এই যে চলিয়াছে সামাজিক বিধি যে, মেয়ে-পুরুষকে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে স্থায়ী জোড় বাঁধিতে হইবে আর সেই বৈধ নিয়মে জোড় না বাঁধিলে সন্তানেরা সমাজে আদৃত হইবে না, সে নিয়ম ইচ্ছা করিলেই উল্টাইয়া বা উঠাইয়া দিয়া সমাজকে কুশলে চালাইতে পারা যায়।

বিবাহ প্রথা যে এক সময়ে সুবিধার খাতিরে মানুষে চালাইয়াছিল, এই প্রবাদ অনেক দেশেই পাওয়া যায়। আমাদের প্রাচীন প্রবাদে পাই যে একদিন একজন ঋষি অস্থায়ী যৌন আকর্ষণে শ্বেতকেতুর মাকে শ্বেতকেতুর চোখের সাম্‌নেই ডাকিয়া নিলেন; শ্বেতকেতুর হইল লজ্জা ও ক্রোধ, আর তিনি তৎক্ষণাৎ এই অমোঘ বচন উচ্চারণ করিলেন যে, সমাজ ঐরূপ উচ্ছৃঙ্খল ভাবে আর চলিবে না,—সকলকে বিবাহের আইন মানিতে হইবে। বিবাহটা নাকি সেইদিন হইতে চলিত হইয়াছে। ইহারই অনুরূপ প্রবাদ পাই প্রাচীন মিসরে ও প্রাচীন চীনদেশে। গোড়ায় ছিল উচ্ছৃঙ্খলা বা স্বেচ্ছাচারিতা, তার পরে সামাজিক অবস্থার ফলে নানা দেশে নানা ধরণের বিবাহ-প্রথার উৎপত্তি হইয়াছিল, এই কথা ষাট সত্তর বছর আগে ইউরোপের কয়েকজন সমাজতত্ত্বজ্ঞেরাও বলিয়াছিলেন। এই পণ্ডিতদের মতের সমালোচনার আগে একটা প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার ইতিহাস দিতেছি, যে ভ্রান্ত ধারণায় মানুষে ভাবে যে, বিশ্বের সুসম্বদ্ধ সৃষ্টির পূর্ব্বে বিশ্বের উপাদানগুলি ছিল অতি বিশৃঙ্খল বা এলোমেলো অবস্থায় বা chaos রূপে; এই অবৈজ্ঞানিক ধারণা জন্মিবার কারণ দেখাইতেছি।

মানুষে যখন ঘর বাঁধে তখন এখানকার কাঠ সেখানকার পাথর মাটি বহু চেষ্টায় ও শ্রমে কুড়াইয়া আনে; প্রায় সকল প্রয়োজনের কাজেই মানুষকে অনেক জোড়া-তালি দিয়া কাজ গুছাইয়া নিতে হয়। নিজেদের কাজ বা সৃষ্টিকে উপমেয় ভাবিয়া লোকে মনে করে যে এলোমেলো উপাদান জুড়িয়াই বিধাতাকে সুসম্বদ্ধ বিশ্ব গড়িতে হইয়াছিল। যাঁহারা অল্পাধিক পরিমাণে বিশ্বের উপাদানের প্রকৃতি জানেন তাঁহাদের পক্ষে chaos কল্পনা করা অসম্ভব। ইথর বল বা শূন্যসাগর বল বা যে নামেই নামকরণ কর, দেখিতে পাইবে যে তাহারই মধ্যে অবিরাম কম্পন বা তরঙ্গ চলিয়াছে,

আর তাহার নির্দ্দিষ্ট বাঁধা গতিতে ফুটিয়া উঠিতেছে বিদ্যুৎ-গর্ভ কুঁড়ি, যে কুঁড়ির বিকাশে জন্মিতেছে পরমাণু। এই পরমাণুর অতি সূক্ষ্ম অণুতে অণুতে সেই ধর্ম্ম আজন্ম জড়াইয়া আছে, যাহার ফলে পরমাণুগুলিকে নিরন্তর বিশ্ব গড়িয়াই চলিতে হইবে,—অতি ক্ষুদ্র কাল্পনিক মুহূর্ত্তেও সে তাহার অঙ্গের নিয়ম বা ধর্ম্ম এড়াইয়া এলোমেলো অবস্থায় থাকিতে পারে না। আলো হউক, জল হউক হুকুমের অপেক্ষা না করিয়াই আদি অথবা অনাদিকাল হইতে আকর্ষণাদি নানা নিয়মে সুশৃঙ্খল সৃষ্টি উদ্ভাবিত করিয়া চলিয়াছে। ঐ যে পরমাণু নিত্য আপনার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিয়াছে উহাদেরই এক ধরণের যোগে যে আমাদের উৎপত্তি, আমাদের আপন-পর বুঝিবার চৈতন্যের উৎপত্তি ও জীবনের সকল শ্রেণীর কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তির উৎপত্তি, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ ভারতবর্ষ মাসিকে "মরণ ভোল" প্রবন্ধে দিয়াছি। উহার পুনরুক্তিতে পুঁথি বাড়াইব না।

এমন অনেক জীব আছে যাহাদের মধ্যে বিকাশের অল্পতার দরুণ সেই ধরণের চেতনা জাগে নাই যাহাতে আত্মবোধ জন্মিতে পারে; কিন্তু তাহারা বাঁচিয়া চলিয়াছে খাইয়া ও আত্মবংশ বাড়াইয়া চলিয়াছে আপনাদের শারীর উপাদানের টানে। শরীরে নানারকমের টান বা প্রবৃত্তি আছে আর সেই টান বা প্রবৃত্তির ফলেই তাহারা কাজ করে; কিন্তু সেই প্রবৃত্তির টান আত্মজ্ঞানরূপে বিকশিত চেতনার আওতায় ঘটে না বলিয়া সেই ভাবের জন্ম হয় নাই, আমরা যে ভাবের নাম দিয়াছি ইচ্ছা, সঙ্কল্প প্রভৃতি। উহারা ক্ষয়ের বা মরণের অবস্থার স্পর্শে আসিলে উপাদানের ধর্ম্মেই কোঁচ্‌কাইয়া দূরে যায়, আর স্থিতির অনুকূল অবস্থার স্পর্শে শরীর ফুলাইয়া অগ্রসর হয়; কিন্তু আমাদের মত ইচ্ছা বা সঙ্কল্প অনুভব করে না। এইজন্যই অন্য জীবের আলোচনা করিয়া খুঁজিয়া-পাতিয়া দেখিতে হইবে যে আমাদের যাহা বাঞ্ছনীয় ও কর্ত্তব্য তাহার অচ্ছেদ্য শিকড় কিভাবে রহিয়াছে আমাদের অপরিবর্ত্তনীয় উপাদান-ধর্ম্মে জড়াইয়া। অর্থাৎ বুঝিয়া নিতে হইবে যে আমাদের কোন্ শ্রেণীর ব্যবস্থাকে শরীর ও সমাজ ধ্বংস না করিয়া বদ্‌লাইতে পারা যায়, আর অন্যদিকে কিরূপ মৌলিক ব্যবস্থাকে বদ্‌লাইতে গেলে আমাদের ঝাড়ে-বংশে নিপাত হয়। তত্ত্বের খোঁজের গোড়ার কথায় সক্রেটিসের উপদেশ ছিল—know thyself, আপনাকে জান। এখানেও সেই কথা; জীবনের ও সমাজের কর্ত্তব্য বুঝিবার গোড়ায় আপনার উপাদানকে চিনিয়া নাও, আপনাকে চিনিয়া নাও।

জীব শ্রেণীর অতি নীচের স্তরে এমন অনেক জীব আছে যাহারা সারা শরীর দিয়া খায় ও পুষ্ট হয়, আর উপযুক্ত সময়ে তাহাদের শরীর ভাঙ্গিয়া দুখানা হয় ও সেইরূপে দুইটি জীবের উৎপত্তি হয়। এই প্রথায়

ঐ জীবদের বংশ বাড়িয়া চলে। এই জীবদের মধ্যে একের সঙ্গে অন্যের কোনও রকমের সহযোগিতার প্রয়োজন নাই; তবু উহারা এক দলে এক সঙ্গে বাস করে। নীচের দিকের এমন অন্য একটু উচ্চতর জীব আছে যাহাদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ ভেদ আছে আর বংশবৃদ্ধির জন্য স্ত্রীপুরুষেরা নির্দ্দিষ্ট কালে জোড় বাঁধে। আত্মজ্ঞানের চেতনাশূন্য এই জীবেরা কোনও নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে জোড় বাঁধে কি-না তাহা এখনও পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট ধরা যায় নাই; তবে যতটুকু জানা গিয়াছে, পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি। একে ত এই জীবগুলি বড় ক্ষুদ্র ও চেহারা দেখিয়া একটিকে অপরটি হইতে আলাদা করিয়া চিনিয়া রাখা কষ্ট; তাহার উপর আবার মানুষে যখন উহাদের গতি-বিধি পরীক্ষা করিতে বসে, তখন উহাদের স্বাভাবিক স্থিতির পদ্ধতি উল্টাইয়া যায়। মানুষেরা প্রায় জোর করিয়াই একটি পুরুষ জীবকে অন্য স্ত্রী জীবের সঙ্গে মিলায়; কিন্তু যদি ঐ জীবেরা মানুষের হস্তক্ষেপ না পাইত, তবে তাহাদের প্রাকৃতিক টানে কিভাবে একটি অন্যটির সঙ্গে জুটিত, তাহা ধরা যায় না। একথাটি কিজন্য বলিলাম, তাহা বুঝাইতেছি। এমন অনেক বড় বড় জীব আছে, যাহারা বন্য থাকিবার সময়ে একটি নির্দ্দিষ্ট প্রথায় জোড় বাঁধে, কিন্তু মানুষেরা যখন তাহাদিগকে গৃহপালিত করে, তখন আর সে নিয়ম পালিত হয় না। আমরা জোর করিয়া ঘোড়া, গরু প্রভৃতির পক্ষে প্রাকৃতিক ভাবে দল বাঁধিয়া থাকার সুবিধা উড়াইয়া দিয়াছি আর উহাদের বংশ-বৃদ্ধির জন্য আমাদের প্রয়োজনে যেমন খুসী তেমন করিয়া জোড় বাঁধিয়া দিই আর ঐ জন্তুরাও যৌন আকর্ষণে পরস্পরে মেলে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা ঠিকই বলিয়াছেন যে মানুষের শাসনে যাহারা প্রাকৃতিক অবস্থায় নাই ও যাহারা হইয়াছে degraded বা অধঃপতিত, তাহাদের দৃষ্টান্তে জীবের জোড় বাঁধিবার আইন ধরা কঠিন। তবুও গৃহপালিত পশুদের প্রাকৃতিক টান কিরূপ, তাহা যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহা বলিব। মানুষ জাতির মধ্যেও কোন কোন জাতি এমনভাবে কোণ-ঠেসা হইয়াছে যাহাতে তাহাদের নিজের দলের পুষ্টি ও প্রসার নষ্ট হইয়াছে। ইহারা দায়ে ঠেকিয়া যৌন আকর্ষণের টানে আপনাদের ক্ষুদ্র দলের মধ্যে এমনভাবে জোড় বাঁধে, যাহা আমাদের দৃষ্টিতে মানুষের বেলায় অস্বাভাবিক। ইহারা যে এই দায়েপড়া অবস্থার জন্য ধ্বংসের পথে চলিতেছে সে দৃষ্টান্ত পরে দিব। এখানে শুধু এইটুকু বক্তব্য যে এই সকল দৃষ্টান্তের অল্প উল্লেখের পর অন্যান্য জীবের মধ্যে লক্ষিত সুস্পষ্ট দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব।

প্রথম দৃষ্টান্ত দিতেছি সেই নীচের স্তরের জীবের যাহাদের আত্ম-জ্ঞান অস্পষ্ট, আর যাহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ জন্মিয়াছে। পণ্ডিত

Maupas এই শ্রেণীর জীবদের কয়েকটি বংশে ঠিক লক্ষ্য করিয়াছেন যে যদি উহাদের এক স্থানের দলের জীবেরা অন্য স্থানের দলের জীবদের কাছে যাইতে না পায়, আর যদি এক স্থানের স্ত্রী-জীবদের সঙ্গে দূরের অন্য পুরুষ-জীবদের জোড় বাঁধা না ঘটিতে পায় তবে ঐ জীবেরা ক্ষয়ের পথে বা মরণের পথে অতি শীঘ্র অগ্রসর হয়। এই জীবদের অপেক্ষা খানিকটা উন্নত মৌমাছিদের সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিত লক্ষ্য করিয়াছেন যে এক চাকের মাছিরা অন্য চাকের মাছিদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক রাখে, যদিও অন্য চাকের মাছিদের সঙ্গে জোড় বাঁধিয়া বাস করে না। নিজের দল ছাড়িয়া অপরিচিত অন্য দলের জীবদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করাই যে জীব-সাধারণের মধ্যে সাধারণ নিয়ম, তাহাই অনুসন্ধানের ফলে নিত্য নিত্য আবিষ্কৃত হইতেছে।

গৃহপালিত পশুদের অধঃপতিত অবস্থার কথা ও মানুষের ইচ্ছায় তাহাদের ক্ষণিক যৌনসম্বন্ধ-স্থাপনের কথা বলিয়াছি। যে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা এই পশুদের শরীরের ও গুণের উন্নতিসাধনে বিশেষভাবে ব্রতী তাঁহাদের মধ্যে এবিষয়ে কোনও মতভেদ নাই যে, যেখানেই যত কাছাকাছি রক্ত সম্পর্কে পশুদের যৌন সম্পর্ক হয় সেখানেই পশুদের বংশে তত পরিমাণে ক্ষয় দেখা দেয়। আবার ইহাও সযত্নে লক্ষ্য করিবার জিনিস যে কাছাকাছি রক্ত-সম্পর্ক না থাকিলেও এক পালের পশুরা আপনাদের মধ্যে যৌন সম্বন্ধ ঘটাইতে না পারিলেই অধিক সুখী হয়, আর অপরিচিত সমজাতীয় পশুদের প্রতি যৌন আকর্ষণ অধিক হয়। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ Heape লিখিয়াছেন—All breeders will agree that animals when brought into contact with strangers experience increased sexual stimulation। অনুবাদের প্রয়োজন নাই।

এবারে দিব পক্ষী-জাতির মধ্যে জোড়-বাঁধার দৃষ্টান্ত বা স্থায়ী বিবাহের দৃষ্টান্ত। যে সকল পণ্ডিত অতি নিপুণভাবে পক্ষী-জাতির আচরণ-বিধি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ঠিক বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে Marquis de Brisay, Brehm ও Hermann Muller-এর পাকা অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনাইব। আমরা সকলেই লক্ষ্য করি যে পাখীরা তাহাদের জাতি অনুসারে দল বাঁধে আর এক সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে ও এক গাছে রাত্রি কাটায়। যাহাকে বলে কাজের বেলায় সহযোগিতা পাওয়া, ইহাদের মধ্যে তাহার ত কোন প্রয়োজন নাই; কারণ উড়িতে শিখিবার পর যে যাহার নিজের খাদ্য সংগ্রহ করে ও বিপদে পড়িলে নিজের চেষ্টাতেই মুক্তির পথ খোঁজে। যৌন আকর্ষণে

যে এক-এক জোড়া পাখীকে কাছাকাছি থাকিতে হয়, তাহাও ত বছরের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট কালে ঘটে। তবুও পক্ষী-জাতিদের বেশির ভাগ একসঙ্গে দল বাঁধিয়া থাকে ও ঝাঁক বাঁধিয়া ওড়ে। আমরা এক জাতির এক পাখীকে অন্য পাখী হইতে আলাদা করিয়া চিনিয়া রাখিতে পারি না, তাই কি নিয়মে কে কাহার সঙ্গে জোড় বাঁধে তাহা ধরিতে পারি না। আন্দাজে ভুল করিয়া ভাবি যে এক জোড়া পাখী এক বাসায় যে এক জোড়া ডিম পাড়িল তাহারই পুরুষ ও মেয়ে ছানা বড় হইবার পর বুঝি এক সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষরূপে জোড় বাঁধে। যে সকল পণ্ডিতদের নাম করিয়াছি তাঁহারা নিপুণ পরিদর্শনে দেখিয়াছেন যে মুরগী জাতীয় ও আর দু-একটি জাতীয় পাখী ছাড়া পাখীদের মধ্যে ভাই-বোনে জোড় বাঁধা নাই। পাখীরা বড় হইয়া যখন দল বাঁধিয়া উড়িয়া বেড়ায় তখন এক বাসার পাখীরা অপরিচিত অন্য বাসার পাখীদের সঙ্গে জোড় বাঁধে। একবার জোড় বাঁধিবার পর বা বিবাহ হইবার পর ইহাদের বিবাহ ভঙ্গ হয় না ও আশ্চর্য্য এই যে জোড়ার একটা মরিয়া গেলে অপরটি অনেক সময়েই সারা জীবন বিবাহ করে না। Captain Forsyth একবার সম্বলপুরের পশ্চিমভাগে একজোড়া চখা-চখী দেখিয়া গুলি করিয়াছিলেন ও তাঁহার গুলিতে একটি মরিয়াছিল। অপরটির দুঃখ-যাতনা দেখিয়া সেটিকে মারিয়া ফেলিবার জন্য একুশ দিন ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু পারেন নাই। তিনি ঘুরিয়া দেখিয়াছিলেন যে বিপত্নীক বা বিধবা পাখীটি নদীর চড়ায় চখা-চখীদের দলের কাছে অথচ দল হইতে দূরে একা বসিয়া থাকিত। ঘুঘুদের ও পায়রাদের জোড় বাঁধা ও প্রেমের কথা আমাদের দেশে অনেকে আন্দাজে খানিকটা লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রেমের একনিষ্ঠ আকর্ষণে যে একা মানুষেরাই ধন্য নয় তাহা এক পণ্ডিতের ইংরেজী উক্তিতে এইভাবে আছে—This absorbing passion for one is not confined to the human race। পক্ষী জাতির মধ্যে অসম্পর্কিত বিবাহ ও দাম্পত্য প্রেমের গভীরতা অত্যন্ত অধিক দেখিয়া পণ্ডিত Brehm বিস্ময়ে বলিয়াছেন যে যথার্থ একনিষ্ঠ বিবাহ (monogamy) পক্ষী জাতিতেই সর্ব্বাধিক লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার উক্তিটি ইংরেজীতে এইরূপ আছে—Real genuine marriage can only be found among birds।

শরীরের স্বাভাবিক টানের আগ্রহকে চেতনার মধ্যে ইচ্ছারূপে সাজাইয়া হউক আর নাই হউক জীবদের মধ্যে এই যে বিবাহের গতি ও পদ্ধতি চলিয়াছে তাহার অচ্ছেদ্য মূল শরীরের সেই উপাদানের ধর্ম্মে চলিয়াছে, যে উপাদানের নাম জৈবনিক বা germplasm। এই জৈবনিক নিম্নতম হইতে উচ্চতম জীব পর্য্যন্ত সকলের জীবনে সর্ব্ববিধ কর্ম্মের ভিত্তি;

ঐ ভিত্তিকে না বদ্‌লাইলে অর্থাৎ শরীরকে না মারিয়া ফেলিলে ঐ টান ও টানের পদ্ধতিকে কাহারও বদ্‌লাইবার সাধ্য নাই। জৈবনিকের এই লীলা নানা ইতর জন্তুর মধ্যে লক্ষ্য করা গেল; এখন দেখিব সেই জীবদের আচার যাহারা মানুষদের পূর্ব্বপুরুষদের একটু দূর সম্পর্কে পিতৃব্য ও ভ্রাতৃব্য স্থানীয় অর্থাৎ শিম্পাজী, গরিলা প্রভৃতি কিম্পুরুষ বা বনমানুষদের আচারের উল্লেখ করিব। শিম্পাঞ্জী, গরিলা প্রভৃতি যে জীবনে স্থায়ী জোড় বাঁধে ও এক এক পরিবার সন্তান-সন্ততি নিয়া একসঙ্গে বাসা বাঁধিয়া থাকে ও নানাস্থানে বিচরণের সময়েও বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষেরা বড় বড় সন্তানগুলিকে সঙ্গে করিয়া বেড়ায়, ইহা সকল পরিদর্শকেরাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। যে সংস্কার নীচ জীব হইতে কিম্পুরুষ পর্য্যন্ত সকলের শরীরে ও মনে বদ্ধমূল, তাহা যে কিম্পুরুষদের কিঞ্চিৎ দূর সম্পর্কিত আদি মানবের সহজজ্ঞান বা সংস্কাররূপে স্থায়ী ছিল, তাহা স্বীকার না করিবার যুক্তি পাওয়া যায় না। আদিম কালের মানুষের খাঁটি আদিম সমাজ আর নাই,—তাহাদের উত্তরাধিকারীদেরও সমাজ অনেক লক্ষ বছর আগে শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের আচার প্রভৃতিও পরবর্ত্তী সময়ে পরিবর্ত্তিত সমাজে খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নয়; তবে যে ধারা জৈবনিকের ধর্ম্মে সারা জীবশ্রেণীতে বহিয়া আসিয়াছে তাহা যে জৈবনিকে গড়া মানুষের উত্তরাধিকারক্রমে চলিয়া আসে নাই, একথা কিছুতেই বলা চলে না।

মনুষ্যেতর প্রায় সকল জন্তুর মধ্যেই সন্তান-সঞ্চার করাইবার এক-একটা নির্দ্দিষ্ট কাল বা ঋতু আছে; কিন্তু মানুষের মধ্যে এই কাল বা ঋতু সারা বছর ধরিয়াই চলে, বলিতে পারা যায়। অন্য জন্তুর পক্ষে সম্ভব হইতে পারে যে কেবল নির্দ্দিষ্ট কালে স্ত্রী-পুরুষের মিলন হইলেই চলে, কিন্তু মানুষের বেলায় একেবারেই তাহা নয়। তবুও দেখা যায় যে অন্য জীবেরা নির্দ্দিষ্ট কালে মিলিবার সম্ভাবনার উপরে নির্ভর করিয়া আলাদা আলাদা থাকে না; একেবারেই যৌবনে স্থায়ী জোড় বাঁধিয়া চলে ও প্রয়োজনের বেলায় সেই জোড়-বাঁধা জীবেরাই বংশ বৃদ্ধি করে, আর অনিশ্চিতভাবে উপযোগী ভবিষ্যৎ মিলনের পথ চাহিয়া থাকে না। সন্তান পালনের কাজের সময়টুকু পর্য্যন্ত নীচের শ্রেণীর সকল জীব জোড় বাঁধিয়া বসিয়া থাকে না — সারা ভবিষ্যতের জন্য জোড়-বাঁধা বজায় রাখে। কাজেই মানুষের বেলায় বিশেষ করিয়া স্বীকার করিতে হইবে যে যাহারা প্রতিনিয়ত যৌন আকর্ষণের টান অনুভব করে ও যাহাদের পক্ষে অনেক বছর ধরিয়া সন্তান পালনের কাজ চালাইতে হয় তাহারা ভবিষ্যতের অনিশ্চিত উপযোগী মিলনের অনিশ্চিত আশায় না থাকিয়া যৌবনেই পাকা জোড় বাঁধে বা স্থায়ী বিবাহ

করে। যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে প্রাণের টান বা আকাঙ্ক্ষার অনুরূপে মানুষে স্ত্রী বা পুরুষ সঙ্গী পাইতে পারে না বা সন্তানদের রক্ষক পাইতে পারে না।

পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই অনুন্নত ও উন্নত মানব-সমাজ পরিদর্শন করিয়া সমাজের ক্রমবিকাশের যে আইন বা নিয়ম কিছুদূর পর্য্যন্ত ধরা গিয়াছে, সেই নিয়মের আলোকে মানুষের বিবাহ-পদ্ধতির বিকাশ ও বিচিত্রতার আলোচনা করিতেছি। বিবাহের সংস্কার ও পরিবার-পালনের সংস্কার যে আদিম মানুষ পাইয়াছিল উত্তরাধিকারসূত্রে, অর্থাৎ সুবিধার বিচার করিয়া কোন এক সময়ে নূতন প্রথা গড়ে নাই—তাহা স্বীকার করিবার অনুকূলে অনেক কথা বলা হইয়াছে। এবারে প্রথমে মানুষের যৌন আকর্ষণের প্রবৃত্তির বিশিষ্টতার কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

আগেকার কালে মানুষেরা যখন বনে পাহাড়ে স্বচ্ছন্দজাত সামগ্রীর উপর নির্ভর করিত অথবা অল্প পরিমাণে চাষের কাজ করিতে শিখিয়াছিল, তখন এক-একটি পরিবারের পোষণের জন্য অতি অধিক স্থানের প্রয়োজন হইত। একটা বড় জেলার মত আয়তনের স্থান অল্প কয়েকটি আলাদা-আলাদা পরিবারের পক্ষে হয়ত যথেষ্ট হইত না; কাজেই একটি পরিবার হইতে অন্য পরিবার অনেক দূর দূরে বাস করিতে বাধ্য হইত। কোন একটা বিশেষ বড় বনে শিকারের কাজে সফল হইবার জন্য যখন অনেক লোকের প্রয়োজন হইত, তখন অনেক স্থানের অনেক মানুষকে এক সঙ্গে জুটিতে হইত ও শিকারের পরে আপনাদের ভাগ নিয়া যে যাহার দূর স্থানে চলিয়া যাইত। ঠিক এই রকমে দূরে দূরে বাস করা ও সময়ে সময়ে মেলার প্রথা এখনও উড়িষ্যার জঙ্গলের পাবুদিয়া ভুইঞাদের মধ্যে আছে ও প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে জুয়াঙ্গ প্রভৃতি ক্ষয়শীল জাতির মধ্যে ছিল। ইহা আমার নিজের দেখা কথা। কি ভাবে এক-একটি গ্রামে কেবল একটি পরিবারের এক ঘর মানুষকে বাস করিতে দেখিয়াছিলাম, তাহা ১৮৮৫ অব্দে তখনকার 'পতাকা' নামক পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম। অতি প্রাচীনকালে এই ধরণের স্থিতির সময়ে তরুণ-তরুণীরা যৌন আকর্ষণে পড়িত তখন, যখন দৈবে অপরিচিত স্থানের তরুণী-তরুণদের সঙ্গে দেখা-শোনা হইবার সম্ভাবনা হইত। মনের প্রকৃতির কিরূপ মৌলিক অবস্থার ফলে, দূরের অপরিচিতদের সঙ্গে দেখা হওয়ার উপর যৌন-অনুরাগের বিকাশ নির্ভর করিত, তাহা বুঝিয়া নিতে হইবে।

শিশুরা মা-বাপের আশ্রয়ে যখন বাড়ে, তখন মা-বাপের মনে যে শ্রেণীর দয়া-মিশ্রিত স্নেহ জন্মে তাহা যে অন্য সম্পর্কের স্নেহ-মমতা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, আর সেই ধাতুর স্নেহের সহিত যে অন্য ধাতুর মমতার আকর্ষণ

জুড়িতে পারে না তাহা সকল বৈজ্ঞানিকেরাই স্বীকার করেন ও সাধারণ সকল লোকেই স্বীকার করিবে। অন্যদিকে অসহায় অবস্থায় যে ধরণের স্নেহ-মমতায় শিশুরা বাড়িয়া উঠিবার সময় মা বাপের প্রতি প্রাণের গভীর টান বাড়াইয়া চলে, সেই টানের বা আকর্ষণের ধাত্ বা ধাতু অন্য যে কোন ধরণের আকর্ষণের প্রকৃতি হইতে এত স্বতন্ত্র যে স্বাভাবিক নিয়মে সে আকর্ষণের গায়ে অন্যবিধ আকর্ষণ লাগিতেই পারে না। এই কথাটিও সর্ব্ববাদিসম্মত ও মনস্তত্ত্বের পরীক্ষায় সম্পূর্ণ স্বীকৃত। তবুও ইহার উল্লেখ করিতে হইল এই জন্য যে ফ্রয়েড্ ও তাঁহার দুই-একজন চেলা ইহার বিরুদ্ধে একটি কুপরীক্ষিত কথা বলিয়াছেন। এখানে সে তর্ক তুলিব না; তবে এইটুকু বলিয়া রাখি যে অনেক বড় বড় দক্ষ পণ্ডিতেরা ঐ মতের অসারতা ও ভুল ভালভাবেই দেখাইয়াছেন। বাপ-মায়ের প্রতি মনের যে ভাব সৃষ্টি করিয়া ও পুষিয়া শিশুরা যৌবনের সীমা পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছে, সেই ভাবের গায়ে (আর কিছু না হউক, কেবল অধিক পরিমাণে বয়োধিকদের প্রতি) এমন ভাব আসিয়া জোড়া লাগিতে পারে না যে ভাবের প্রথম অঙ্কুর হয় যৌবনের বিকাশে। ফ্রয়েড পরীক্ষা করিয়াছেন বিকৃত মস্তিষ্কদের মনের অবস্থা, আর সে পরীক্ষাও হইয়াছে অতি কুপরীক্ষিত। অন্যান্য অনুরাগের প্রাকৃতিক বিকাশের ইতিহাসে পাঠকেরা এই মতবাদের অসারতা পরিপূর্ণ ভাবে দেখিতে পাইবেন।

পূর্ব্বেই অনেক নীচ শ্রেণীর জীবদের জোড় বাঁধার প্রকৃতির আলোচনায় উল্লেখ করিয়াছি যে যৌন আকর্ষণ বাড়ে অপরিচিত বা stranger-কে দেখিয়া, ও নিজের দল বা বাসা ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াই বহু শ্রেণীর জীবকে যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে দেখা যায়। যদিও পৃথিবীময় সকল জাতির সকল সমাজেই এই অভিজ্ঞতা ও সংস্কার আছে যে প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের মধ্যে কখনও ভাই-বোনে প্রেমের আকর্ষণ জন্মে না, তবুও Westermarck প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদেরা বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় দেখাইয়াছেন যে ভাই-বোন ত অতি দূরের কথা, স্বাভাবিক অবস্থায় শিশুরা যাহাদের সঙ্গে অতি পরিচিত, যাহাদের সঙ্গে একত্র খেলা করিয়া বাড়িয়াছে তাহাদের প্রতিও যৌন আকর্ষণ জন্মে না। যৌন আকর্ষণ যে যৌবনে অপরিচিতের নূতন মুখ দেখিয়া প্রথম জন্মে, আর ঐ ভাব যে সঙ্গীদের প্রতি সঞ্চারিত স্নেহ-সৌহার্দ্দ্য প্রভৃতির সম্পূর্ণ অননুরূপ, তাহা বুঝাইবার জন্য তাঁহার বিজ্ঞানসম্মত ভাষায় Havelock Ellis এইরূপ লিখিয়াছেন—Between those who have been brought up together from childhood all the sensory stimuli of vision, hearing and touch have been dulled by use, trained to

the calm level of affection, and deprived of their potency to arouse erethistic excitement which produces sexual tumescence। এই সকল কারণেই যাহাকে বলে incest বা অবৈধযোগ তাহার প্রতি মানুষের আছে স্বাভাবিক গভীর ঘৃণা, যাহাকে পণ্ডিতেরা ইংরেজীতে বলিয়াছেন deep-seated natural aversion।

যৌবনের প্রথম বিকাশে প্রেমের নূতন ভাব বাড়ে নূতন মুখ দেখিয়া। যুবকের চোখে তখন নূতন যুবতী রক্ত-মাংসে গড়া জীবের কিছু উপরে; she is a phantom of delight—সে আনন্দের মানস-প্রতিমা। একসঙ্গে বাসের প্রয়োজনে এই আকর্ষণের কথা বাপ-মাকে জানাইতে হয়, কিন্তু প্রেমের ধর্ম্ম এই যে একথা নিয়া তরুণ-তরুণীরা দশজনের সঙ্গে আলোচনা করিতে পারে না; নিজেদের কথা গোপনে রাখে, যেযুগে এদেশে প্রেমে পড়ার প্রকৃতি সামাজিক অবস্থার দরুণ জানা ছিল না, সেই যুগের কবিতাতেই রাধাকে 'সখি রে, সখি রে' বলিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিতে দেখি। মানুষের প্রকৃতিতে যে এই ব্রীড়া স্বাভাবিক, তাহা এ প্রসঙ্গে অন্য কথা বুঝিবার সময়ে প্রয়োজন হইবে। Companionate Marriage-এর অবৈজ্ঞানিক জজ্ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে মেয়েরা তাহাদের একাধিক পুরুষ-সেবার গোপন প্রেম-লীলার কথা অসঙ্কোচে তাঁহাকে বলিয়াছে। এই মেয়েরা যে প্রকৃতির স্বাভাবিকতা আত্মব্যবহারে ধ্বংস করিয়া লজ্জা ছাড়িয়াছে তাহা প্রেমের ভাবের বিশ্লেষণে দেখিতে পাইব। জজ্ গ্রন্থকার যৌন সম্পর্কের লজ্জার ভাবকে তুচ্ছ করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি অনায়াসে যে কোন মুহূর্ত্তে যে কোন লেখকের সমক্ষে নগ্ন হইতে পারেন। এই উক্তিটুকুই প্রমাণ করিতেছে যে তিনি স্বাভাবিক প্রেম-বিকাশের ও লজ্জার উৎপত্তির ইতিহাস একবিন্দুও জানেন না। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অতি নিভৃত জঙ্গলেও অসভ্য জুয়াঙ্গেরা গাছের পাতা গাঁথিয়া পরিয়া চিরকাল লজ্জা নিবারণ করিয়াছে। বিবাহের ইতিহাসের প্রসঙ্গে এবিষয়ের পূর্ণ বিচার এখন না করিলেও চলে, তবে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রেমের আকাঙ্ক্ষার বিকাশে যে নূতনত্বটুকু হয় প্রেমিকদের প্রার্থনীয় ও আকর্ষণের বস্তু, তাহার সঙ্গে এই লজ্জার ভাবও অনেকখানি জড়াইয়া আছে।

আমাদের সমাজে বিবাহ হইত প্রেমের আকাঙ্ক্ষা জন্মিবার পূর্ব্বেই—শৈশবে; 'বিবাহ হইত' লিখিয়াছি এইজন্য যে এখন সরদা আইন পাস হইয়াছে। শৈশবে বিবাহ হইবার পর বৌকে আসিয়া থাকিতে হইত স্বামীর বাড়ীতে বা শ্বশুর বাড়ীতে; যে কারণেই হউক নিয়ম ছিল ও আছে যে, বৌকে সর্ব্বদাই ঘোমটা দিয়া চলিতে হইবে। পরোক্ষভাবে ইহাতে এই উপকার হইত যে স্বামীটি বাড়ীর বোনেদের মত বাল্যেই তাহার স্ত্রীকে

সর্ব্বদা কাছাকাছি পাইয়া তাহার প্রতি যৌন আকর্ষণের ভাবটুকু নির্ম্মূল করিতে পারিত না; ঘোমটায় নূতনত্ব রক্ষা করিত। নূতনত্বে আকর্ষণ জন্মে, ইহা প্রায় সকলেই বুঝি; কাজেই এ বিষয়ের অতিরিক্ত আলোচনা করিব না।

অল্প পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে আদিমকালের সমাজে যখন এক-এক পরিবারের লোক আপনাদের দলের অন্যান্য পরিবারের বাসস্থান হইতে দূরে বাস করিত, তখন তরুণ-তরুণীরা কোন-কোন প্রয়োজনে আপনার বাসগৃহ হইতে দূরে গিয়াই প্রেমে পড়িবার সুবিধা পাইত। আকর্ষণ পাকা হইলে যখন বিবাহ হইত তখন বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন পরিবারের অবস্থা ও সুবিধা অনুসারে বরকে বা তরুণ পতিকে হয় তাহার মা-বাপের ঘরে পত্নীকে আনিয়া বাস করিতে হইত, না হয় শ্বশুরের ঘরে গিয়া থাকিতে হইত, আর না হয় ত নিজে একখানি নূতন গ্রাম বসাইবার মত নিজের বাসভবনের কিছু দূরে পত্নীকে নিয়া নূতন ঘর-সংসার পাতিতে হইত। যে-যে বিভিন্ন অবস্থায় এই ভিন্ন-ভিন্ন রকমের ব্যবস্থা হইত, তাহা এখানে খুঁটাইয়া না বলিলে চলে। এই যুগের তরুণ-তরুণীরা এমনভাবে আপনাদের ঘর-সংসারের কাজে লাগিত, যাহাতে দূরের অন্যান্য পরিবারের যুবক-যুবতীদের সঙ্গে (কালে-ভদ্রে ছাড়া) মিলিয়া মিশিয়া আলস্যে সময় কাটাইবার বা দীর্ঘ সময় ধরিয়া গল্প-গাছা করিবার সময় পাইত না। যেখানে তরুণ-তরুণীরা আলাদা নূতন সংসার পাতিত সেখানে ত দিন-রাত্রি নিজেদের কাজে সময় কাটাইত। তাহার পর ঘাড়ে পড়িত শিশু-সন্তান পালনের ভার। না ছিল তখন একালের মত যখন-তখন অপরিচিতদের সঙ্গে বৈঠক বসাইবার সুবিধা, আর না ছিল কাজকর্ম্মে ব্যাপৃতদের মধ্যে অস্বাভাবিক রকমে যৌনভাবের নূতন-নূতন উত্তেজনা পাইবার সুবিধা। সময়ে-সময়ে আনন্দের উৎসবে নানা দলের লোকে মিলিত বটে, কিন্তু এই সকল নানা-বয়সী লোকের দঙ্গলে উপরে লিখিত ঘটনাগুলি ঘটিতে পারিত না। ঐ উৎসবের সময়ে নূতন তরুণ-তরুণীদের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি হইলে তাহারা সুবিধামত দেখা-শোনা করিয়া প্রেম বাড়াইত, কিন্তু যাহারা বিবাহিত হইয়া নিজেদের নূতন দায়িত্বের কাজে লাগিত তাহারা কাজ-কর্ম্ম ফেলিয়া নূতন প্রেম বাধাইবার প্রবৃত্তি ও সুবিধা পাইত না। অতি সেকালের এই সকল অবস্থার চাপে (স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশেও বটে) সমাজের প্রথম যুগে একনিষ্ঠ বিবাহ প্রথাই (monogamy) বিকশিত হইয়াছিল। বেরার প্রদেশের সীমান্তে সাতপুরা পাহাড়ের কুর্কু সম্প্রদায়ের লোকেরা ও সম্বলপুর রাঁচী পর্য্যন্ত প্রসারিত প্রদেশে ঐ কুর্কুদের জ্ঞাতি মুণ্ডা প্রভৃতি জাতির লোকেরা সর্ব্বদাই একনিষ্ঠ বিবাহ-

রীতি চালাইয়া আসিয়াছে; কেবল রাঁচী অঞ্চলে হিন্দুদের প্রভাবে ক্বচিৎ-ক্বচিৎ ঐ প্রথার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এই জাতির লোকেদের বিবরণ আমি যে গ্রন্থে লিখিয়াছি তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে উহাতে আদিম জাতির গতি-বিধির অনেক কথা আছে।

একালের উন্নত ও জটিল সমাজে স্ত্রী পুরুষে যেভাবে ঘরে বসিয়াই সুড়সুড়ি দেওয়া সাহিত্য পড়িয়া ও অন্য দশ রকমে উদ্‌ভ্রান্ত হইতে পারে, সে অবস্থা যখন ছিল না তখনও প্রবল জাতির পীড়ন-প্রভৃতিতে অনেক স্থানের অসভ্য জাতির লোকেরা নিতান্ত কোণ-ঠেসা হইয়া পড়িয়া স্বাভাবিক বিকাশের সুবিধা হারাইয়া যৌনসম্বন্ধে অনেক স্বৈরাচারের ও দুরাচারের হাতে পড়িয়াছে। এ বিষয়ে মেলানেসিয়ার দৃষ্টান্ত অতি উপযোগী। বিখ্যাত পণ্ডিত মালিনওস্কি উহাদের স্বৈরাচারের বহু দৃষ্টান্ত দিয়াছেন; কিন্তু ঐ মনীষী গভীরভাবে সকল অবস্থা বুঝিয়া লিখিয়াছেন যে এখনও উহারা স্থায়ী বিবাহকেই জীবনের আদর্শ মনে করে ও অনেক দুরাচারের মধ্যেও একনিষ্ঠ বিবাহের আদর্শকে যথার্থ আদর্শ মনে করে। প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আদিম যুগে স্বাভাবিকভাবে একনিষ্ঠ বিবাহই জন্মিয়াছিল আর ঐ প্রথাই মানুষের মনে সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে আদর্শরূপে রহিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ হরবর্ট্ স্পেন্সর সমাজতত্ত্ব লিখিবার সময়ে ভুলভাবে সংগৃহীত স্বেচ্ছাচারের বিবরণই বেশি পাইয়াছিলেন; তবুও গভীরভাবে সকল অবস্থার বিচার করিয়া প্রায় ৬৫ বৎসর আগে লিখিয়াছিলেন যে, মানব সমাজের গতি একনিষ্ঠ বিবাহের দিকে ও মানুষেরা ভবিষ্যতে ঐ বিবাহপ্রথা পাইয়াই ধন্য হইবে।

সমাজের কি-কি অবস্থায় প্রাচীনকাল হইতেই নানাস্থানে একনিষ্ঠ বিবাহের বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল তাহার আলোচনাতেও একনিষ্ঠ বিবাহের স্বাভাবিকতা আরও সুস্পষ্ট হইবে। কোথাও দেখা দিয়াছিল ও এখনও চলিয়াছে বহুপত্নীগ্রহণের বহু বিবাহ, আর কোথাও চলিয়াছিল ও চলিতেছে বহুপতিত্ব। এই সকল প্রথার উৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করিয়া আলোচনা করিতে হইবে যে, সামাজিক উন্নতির জন্য একনিষ্ঠ বিবাহই শ্রেষ্ঠতম কি-না ও একালের কোন-কোন সভ্য সম্প্রদায়ের মতের অনুসারে বিবাহ-প্রথা উড়াইয়া দিয়া বা শিথিলতর করিয়া মানুষের সমাজ রক্ষা করা চলে কি-না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ *

হর্বর্ট্ স্পেন্সর নাকি গদ্য-পদ্যের প্রভেদ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে ওই দুই রচনারীতির তারতম্য কেবল মুদ্রাকরের মর্জ্জির উপরে প্রতিষ্ঠিত: একপাতা ছাপা গদ্যের চারদিকে যে পাড় থাকে, তা সমান্তর, আর পদ্যের কিনারা বন্ধুর। আমি অবৈজ্ঞানিক মানুষ; হয়তো সেইজন্যেই ওই ধরনের মৌল ব্যাখ্যায় আমার অবিদ্যা না-কেটে, মন হাস্যমুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রণালী-দুটির পার্থক্য আমার কাছে যতই সুস্পষ্ট হোকনা কেন, গদ্য-পদ্যের মধ্যে কোনো প্রকৃতিগত বিরোধ আমি অদ্যাবধি আবিষ্কার করতে পারিনি; বরং অনেক সময়ে ভেবেছি যে ওই দুই ধারার পরিপূর্ণ সঙ্গমই সাহিত্য-তীর্থ-নামে বিদিত। এ-মতটি প্রথমে যদিও অতিরঞ্জিত ব'লে বোধ হয়, তবু এর সমর্থন শুধু সময়সাপেক্ষ। গদ্যবিলাসীরাও লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে রচনাবিশেষের আবেদন যখন বুদ্ধিবিবেচনার পাহারা এড়িয়ে, একেবারে তাঁদের অন্দরের দ্বারে ঘা দেয়, তখন তার থেকে কাব্যকে পৃথক করা কেমন যেন আর সার্থক মনে হয়না। কাব্যামোদীও অনুরূপ অভিজ্ঞতায় ভুক্তভোগী। প্রায়ই এমন কবিতা তাঁর হাতে এসে পড়ে, যার মধ্যে, ছন্দ-মিল-উপমা-অনুপ্রাসের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও, কাব্যের লেশমাত্র মিলেনা, যার রাজকীয় অলঙ্করণের ফাঁকে ফাঁকে দৈনন্দিন দাস্যের গদ্যময় দীনতা মুহুর্ম্মুহু উঁকি পাড়তে থাকে। এত কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে রসের নিমন্ত্রণে জাতিভেদ নেই, সেখানে গদ্য পদ্য উভয়েরই সমান অধিকার, বিচার্য্য কেবল প্রবেশপ্রার্থীর মহানুভবতা, আবেগের গভীরতা এবং কার্য্যকারণের সুসঙ্গতি। এবং সাহিত্য যেহেতু মূলত জীবনেরই প্রতিবিম্ব, সেকালে, আমার মতে, গদ্য-পদ্যের যে-সমন্বয় সাহিত্যে দৃষ্ট হয়, তার দৃষ্টান্ত জীবনেও সুলভ। মলিয়ের্-এর একজন নায়ক শুনে স্তম্ভিত হয়েছিলেন যে তিনি আজীবন না-জেনে গদ্য ব'লে আসছেন। আমাদের মতো আষ্টপ্রহরিক মানুষেরা হৃদয়াবেগের তাগিদে বৎসরে যতবার কবিতায় কথা বলি, তার তালিকাও কিছু কম বিস্ময়কর হবেনা।

উপরে যা বললুম তাতে গদ্য-পদ্যের ঐক্য প্রমাণিত হলোনা জানি; এবং সে-চেষ্টাও আমার নেই, কারণ সকল সভ্য মানুষই এদের দ্বৈধ স্বীকার ক'রে এসেছে। যতদূর মনে পড়ে, এমন কোনো ভাষা নেই যাতে এই দুই সংজ্ঞার বাহকরূপে কেবল একটিমাত্র শব্দকে দেখা যায়।

* পরিশেষ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত (বিশ্বভারতী)
পুনশ্চ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত (বিশ্বভারতী)

এবং আমি যেহেতু ভাষার অতিমর্ত্ত্যতা মানিনা, মনে করি মানুষে অন্যান্য প্রয়োজনসিদ্ধির উপায়ের মতো ভাষাও আবশ্যিকতার চাপে গ'ড়ে ওঠে, তখন আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য যে এ-দুটো অভিধা মধ্যে অর্থের বৈষম্য সহজ ব'লেই ওদের আক্ষরিক চিহ্ন বিভিন্ন হয়েছে। কিন্তু গদ্য ও পদ্য সাধারণত যতই স্বাবলম্বী হোক, তাদের স্কন্ধে যখন রসসৃষ্টির দায়িত্ব এসে পড়ে, তখন আর এই সুনির্দ্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ থাকেনা ; তখন তারা তাদের স্বকীয় মূলধন একত্র ক'রে যে-যৌথ কারবার পাতে, তাই জনসমাজে পায় কাব্য-আখ্যা। কাব্য যে মানবচৈতন্যের শুদ্ধতম অবস্থা, এ-প্রসঙ্গে আজ বোধহয় আর মতভেদ নেই। অর্থাৎ কাব্যের মধ্যস্থতায় যে-বস্তুকে চেনা যায়, তার মধ্যে আর প্রতর্কের স্থান থাকেনা। সে-পরিচয়ের বাচনিক অভিব্যক্তি হয়তো নেতি নেতি হতে পারে, কিন্তু তার কেন্দ্র নঙর্থক নয়, একটা অতিনিশ্চিত উপলব্ধির উৎস। কাব্যলব্ধ বস্তু অনেক সময়েই অনির্ব্বচনীয়, কিন্তু অজ্ঞেয় সে কোনোকালেই নয়। কথাগুলো হয়তো মরমীদের অতিশয়োক্তির মতো শোনাচ্ছে; কিন্তু তাহলেও ব্যাপারটার সঙ্গে কার্য্যত আমরা সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত,—প্রায় সকল জাদুকরই তাদের ভেল্‌কিবাজি সম্পন্ন করে এই উপায়ে। ব্যাস-বাল্মীকির বংশধরদের মতো ভানুমতীর শিষ্যেরাও তাদের চিরাচরিত করকৌশলকে হয় সঙ্গীতের আচ্ছাদনে, নয় অনর্গল বক্তৃতার আড়ালে এমনি অসূর্য্যম্পশ্য ক'রে তোলে যে তাকে অলৌকিক ভাবা ছাড়া মোহমুগ্ধ দর্শকের গত্যন্তর থাকেনা। সুনিয়ন্ত্রিত ধ্বনির সাহায্যে দর্শক বা পাঠকের মনে একটা আবিষ্ট তন্ময়তার সৃষ্টি হয়, যেটা স্বপ্নাবস্থার অনুরূপ। এই ধরণের অর্দ্ধসুপ্তি সঞ্চারণ ক'রেই সাপুড়ে আনে সাপকে বশে, হিষ্টিরিয়া রোগীকে হিপ্‌নোটিষ্ট্‌ চালায় স্বাস্থ্যের পথে, কারণ এ-অবস্থার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এর অনিকামতা, এর বাধ্যতা ও ব্যঞ্জনা-প্রবণতা। তবে পালনীয় আদেশমাত্রের যেটা সনাতন লক্ষণ, এখানেও তার ব্যতিক্রম চলেনা,—অর্থাৎ এক্ষেত্রেও আজ্ঞাকারীর মনে আত্মপ্রত্যয় এবং আজ্ঞায় সহজবোধ্য নিশ্চয়তা একেবারেই অপরিহার্য্য। কাব্যের গদ্যময় অংশ এই প্রাঞ্জল বিজ্ঞাপনের কাজে ব্যাপৃত থাকে, এবং পদ্য নেয় পূর্ব্বোক্ত সমাধি উৎপাদনের ভার। Cover her face, mine eyes dazzle, she died young—জাতীয় একটা নিরালম্ব পঙক্তি যদি হঠাৎ বাস্তব জীবনে শোনা যায়, তবে তাকে পাগলের প্রলাপ ব'লে মনে হ'লেও হতে পারে। কিন্তু এই লাইনের অহৈতুক প্রভাব নিয়ে অরসিকেরা যখন হাসাহাসি করেন, তখন তাঁরা ভুলে যান যে ওয়েব্‌ষ্টর কেবল ওই কটা কথাকে পরপর সাজিয়েই ক্ষান্ত হননি, ওই বাণী যাতে

দৈববাণীর মতো অমোঘ হয়ে ওঠে, তার ব্যবস্থাও করেছেন পূর্ব্বগামী পদ্যের মোহময় কল্লোলে। শেকস্‌পীয়রের রচনারীতিও অনুরূপ। সেখানেও পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, দৃশ্যের পর দৃশ্য এই প্রস্তুতিতেই অতিবাহিত হয়। তার পরে যখন পাঠকের মন সেই উদাত্ত ধ্বনিহিল্লোলে তন্দ্রালু হয়ে পড়ে, তখন আসে কবির দুনির্ব্বার প্রত্যাদেশ—Absent thee from felicity awhile। ততক্ষণে তার অন্তরের সমস্ত বাধা অন্তর্হিত হয়ে গেছে, সুতরাং তখন এই অকিঞ্চিৎকর শব্দ-কটাকেই পাঠক ওঙ্কারের মতো প্রাথমিক ব'লে ভাবতে বাধ্য ; সে মনে করতে বাধ্য যে হ্যাম্‌লেটের চিরপ্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অঙ্কেও, কিছু দিনের জন্যে নয়, চিরকালের মতো, যবনিকাপতন হলো।

ধ্বনিরচনা মুখ্যত পদ্যের কর্ত্তব্য হ'লেও, গদ্য সে-সম্পদে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, এমন ধারণা অমূলক। তবে এক্ষেত্রে উভয়ের তুল্যমূল্য নয়। পদ্যের ধ্বনি সাধারণত সমমাত্রিক ও সুনিয়ন্ত্রিত ; কিন্তু গদ্য সর্ব্বত্রই বৈচিত্র্যময়, তার উত্থান-পতন অর্থ ভিন্ন অন্য কোনো বিধান মানেনা। এই স্বাধীনতার দরুণ গদ্যের কোনো লোকসান হয়নি, একথা বললে অন্যায় হবে. কিন্তু এতে ক'রে তার লাভের অঙ্ক যে লোকসানের হিসাবকে বহু পশ্চাতে ছেড়ে গেছে, তাও একান্ত নিঃসন্দেহ। কারণ বিজ্ঞানজগতে অনর্থ আজ যতই সম্মান পাকনা কেন, ললিত কলায় এখনো অর্থই অগ্রগণ্য ; এবং গদ্য যেহেতু অর্থপ্রধান, তাই কনিষ্ঠ হয়েও শক্তিতে ও সম্ভাবনায় সে আজ পদ্যের অগ্রণী। অবশ্য পদ্য এখনো একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েনি, ভাবের ছায়াময় রাজ্যে আজও সেই পুরোধা ; এবং যৌবন-সুলভ চাপল্যের চালনে গদ্যও যখন কালেভদ্রে এই রাজত্বের সীমানায় এসে পড়ে, তখন তাকেও জ্যেষ্ঠের কাছ থেকেই এখানকার হালচাল-সম্বন্ধে উপদেশ নিতে হয়। কিন্তু কাম্য যেখানে বর্ণনা, প্রয়োজন যেখানে সংবাদের, সন্দেহভঞ্জনই যেখানে একমাত্র উদ্দেশ্য, যেখানে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে ব্যবধান এত গভীর যে ঘনিষ্ঠতার স্বপ্ন শুদ্ধ বিড়ম্বনা, যেখানে সংক্রমণ অসাধ্য, সম্ভব কেবল জ্ঞাপন, সেখানে গদ্যের প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। জগৎ এক স্তরে ঢালাই করা হয়নি ; তার মৌলিক তত্ত্ব জানতে হ'লে হয়তো সমাধিলব্ধ দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাই ব'লেই, উপরের স্তরগুলো অবজ্ঞেয় নয়. বরং সংখ্যাভূয়িষ্ঠ। সুতরাং জীবনের দর্পণ হয়ে ওঠাই যদি কাব্যের চরম সার্থকতা হয়, তবে সেই প্রতিবিম্বে স্থূল স্তবকগুলোরও স্থান হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

বলাই বাহুল্য যে গদ্য-পদ্যের স্বভাব যদি সত্যই বিভিন্নধর্ম্মী হয়, তবে বিশুদ্ধ গদ্য অথবা বিশুদ্ধ পদ্য দিয়ে উক্ত জীবননিষ্ঠ কাব্য কোনোমতেই

রচিত হতে পারেনা। তার জন্যে প্রয়োজন এমন এক বাহকের যার মধ্যে কোনো বাচবিচার নেই, যাতে খুসিমতো গদ্য থেকে পদ্যে এবং পদ্য থেকে গদ্যে যাতায়াতের পথ পরিষ্কৃত হয়ে গেছে। কাব্যের এই ধাতুসঙ্করে নির্ম্মিত আধারটির নামই মুক্তচ্ছন্দ—Free Verse। এতে নূতন পুরাতন সকল বয়সের সুরাই ইচ্ছামতো মেশানো চলে, অথচ পাত্র ফাটবারও কোনো ভয় থাকেনা। এ-ছন্দকে উপলক্ষ্যের তাগিদে পদ্যের নিয়মে দরবেশী নৃত্যে নামানো যায়, আবার অবস্থান্তর ঘটলে গদ্যের দীর্ঘায়িত গম্ভীর গতিও এতে বেমানান হয়না। ও সন্ন্যাস গ্রহণ করেনি বটে, কিন্তু তাই ব'লেই যে সময়ে সময়ে গৈরিকধারণ করেনা এমন কথা বলতে পারিনা। তবে সঙ্গে সঙ্গে এও অনেক দেখেছি যে অলঙ্কারের বাহুল্যে ওর অঙ্গে তিলার্দ্ধ স্থান অনাবৃত নেই। ওর কণ্ঠে "সাধারণ মেয়ে"-র সুস্থ সরল উক্তিও যেমন অব্যাহত বেজে ওঠে, "বিশ্বশোক"-এর মহানুভবতাও তেমনি শোভন লাগে। ওর প্রশস্ত পথে "ছেলেটা"-ও খেলে বেড়ায়, আবার "শিশুতীর্থ"-এর যাত্রীরাও মিছিল ক'রে এগিয়ে চলে। ওর প্রাঙ্গণে "মাঝে মাঝে মরচে-পড়া কালো মাটি"-র সীমান্তেই দেখা যায় "রক্তবর্ণ শিখরশ্রেণী রুষ্টরুদ্রের প্রলয়-ভ্রূকুঞ্চনের মতো"। অল্প কথায় ওর "গর্জ্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও তরলতালে" শোনা যায় "চিরকালের স্তব্ধতা আর চলতিকালের চাঞ্চল্য।" ভাষার সহজ বৈচিত্র্য এ-ছন্দকে শক্তি যোগায়, তাই সহস্র স্বৈরাচরণের মধ্যে সে কেবল এইটুকুর হিসাব রাখে যে তার লম্ফঝম্পে যেন অর্থগৌরবের কোনো হানি না-হয়। এই কারণেই হয়তো গদ্যের সঙ্গে এর বেশি মিল, কিন্তু তাহলেও পদ্যের সঙ্গে এর অহি-নকুল সম্বন্ধ নয়। পূর্ব্বেই বলেছি যে আমার বিবেচনায় প্রাত্যহিক জীবনেও পদ্যের স্থান খুব নগণ্য নয়। কাজেই মুক্তচ্ছন্দেও পদ্যের প্রভাব প্রচুর, এমন-কি হয়তো এতদূর পর্য্যন্ত বলা যায় যে এতে যে-গদ্য ব্যবহৃত হয়, তাও একেবারে সাংসারিক গদ্য নয়। কারণ কবিতার প্রসঙ্গ যতই সামান্য হোক, তার তলায় তলায় একটা অসাধারণ আবেগের উৎস থাকেই থাকে ; এবং আবেগজাত বাক্য যেহেতু উচ্ছ্বসিত বাক্য, তাই মুক্তচ্ছন্দের ভাষাও গৃহকর্ম্মের ভাষা নয়, মানুষের উন্নীত চৈতন্যের ভাষা।

মুক্তচ্ছন্দের প্রশস্তি প'ড়ে, অনেকেই হয়তো বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, এই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিটি তো অতি আধুনিক শিল্পের দান, সাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তবে কি কাব্য আর কখনো জীবনের প্রতীক হয়ে ওঠেনি? বলাই বাহুল্য আদিকবিরা তাঁদের কাব্যে জীবনকে যে সম্পূর্ণতা দিয়েছিলেন, অর্ব্বাচীনেরা তার ত্রিসীমানাতেও পৌছতে পারেনি। অবশ্য এই বৈকল্যের

জন্যে আধুনিক লেখকদের দায়ী করা হয়তো অনুচিত ; এমন হতে পারে যে ইতিমধ্যে জীবন এত বহুলাঙ্গ হয়ে পড়েছে যে কোনো একটা রচনায়—এমন-কি বিভিন্ন শিল্পের সম্মিলিত উদ্যোগেও—তাকে চিত্রিত করা অসম্ভব। কিন্তু দোষ যদিও বা সত্যস্তন লেখকদেরই হয়, তবু তাদের পদ্ধতি সত্যসত্যই নিরপরাধ। পুরাতন কবিতার কলাকৌশলের সঙ্গে মুক্তচ্ছন্দের তুলনা করলে, কোনো দ্বন্দ্ব ধরা পড়বেনা ব'লেই আমার বিশ্বাস। এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে জগৎ কখনো দাঁড়িয়ে থাকেনা, কালক্রমে শৈবাল বনস্পতির আকার ধরে। অচেতন বিবর্ত্তনেই যখন এই ফল ফলে, তখন এত বৎসরব্যাপী সজ্ঞান অনুসন্ধানের শেষে বর্ত্তমান কাব্যের বহিরে'খায় যদি অল্পাধিক পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তবে বিস্মিত হওয়া অসঙ্গত। আসলে সাহিত্যের সত্তা অবিকৃতই থেকে গেছে, এবং এ-যুগের ভাবুকেরা কাব্যের তরফ থেকে যে-স্বাধীনতার দাবি করছেন, তা ঐতিহ্যের পরিপন্থী নয়। আচারলুপ্ত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহঘোষণায় সেকালের কবিরা একালের কবিদের চেয়ে কিছু কম তৎপর ছিলেননা ; এবং এইজন্যে শেক্‌স্পীয়র-প্রমুখ প্রথম এলিজাবেথীয় নাট্যকারগণ কতখানি লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন, তা ইংরেজিনবিশমাত্রেই জানেন। কিন্তু তাতেও তাঁদের আগ্রহ কমেনি, তা সত্ত্বেও তাঁরা বুঝেছিলেন যে স্থান-কাল-ঘটনার গতানুগতিক ঐক্যের চেয়ে জীবন্ত নাটকের আবশ্যকতা অনেক বেশি। এমন-কি, সারি-প্রবর্ত্তিত অমিত্রাক্ষরের অভাবনীয় সম্প্রসারণ দেখে, মনে হয় যে ছন্দসম্বন্ধেও আমাদের মনোভাব তাঁদেরই অনুবর্ত্তী। অবশ্য সে-যুগে, আজকালকার মতো, একই কবিতায় গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণ চলতোনা। কিন্তু একই দৃশ্যে, একই চরিত্রের মুখে সাধুভাষা ও সাধুচ্ছন্দের সঙ্গে অপভাষা ও অপচ্ছন্দের যে-উদার রাখীবন্ধন অনায়াসে সাধিত হতো, এই বিপ্লবের দিনেও তার অনুকরণ অসম্ভব। যদিও তখনকার গীতিকবিতায় সাম্প্রতিক আত্ম-নির্ভরতা ছিলোনা, তবু ছন্দকে তাঁরা কখনো কারাগাররূপে দেখেননি, তাকে গণ্য করেছিলেন কাব্যপ্রেরণার প্রণালীরূপে। ফলে এলিজাবেথীয় কাব্য কখনো গণিতের বশ্যতা স্বীকার করেনি। সে-শাসন সুরু হলো মিল্‌টনের আমলে। তাঁর মহাকাব্যও নবাবিষ্কৃত অমিত্রাক্ষরে লিখিত ; কিন্তু প্যারাডাইস্ লষ্ট্-এর ছন্দ প্রবীণ শেকস্‌পীয়র ও নবীন বোমণ্ট্-ফ্লেচারের ছন্দের জ্ঞাতি, এমন কল্পনাও কষ্টকর। অবশ্য ওই কবিত্রয় সম্ভবত বাধ্য হয়েই ছন্দোমুক্তি বরণ করেছিলেন, কারণ তাঁদের আবেগপুঞ্জ শেষের দিকে এতই বিশৃঙ্খল হয়ে উঠেছিলো যে অমিত্রাক্ষরের পাঞ্চপর্ব্বিক স্বাচ্ছন্দ্যেও তাকে কুলানো যায়নি। সুতরাং এঁদের নাম না-নিয়ে, যদি মার্লোর মতো সাম্যবিলাসী ছান্দসিকের সঙ্গেই মিল্‌টনের তুলনা করি, তবু

একটা অকারণ বিষণ্ণতার পীড়নে মন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে ; একটা অজানা অবরোধের আশঙ্কায়, এত বড় মহাকবিকে ছেড়ে, প্রাণ চায় হেরিকের মতো গ্রাম্য কবির আসঙ্গ ; বুদ্ধি যদিও নতশিরে মানে যে লুপ্তস্বর্গের বার্ত্তা কেবল এঁর কাছেই মিলতে পারে, তবু অন্তর খোঁজে মার্ভেল্-এর ফুলবাগানের খোলা হাওয়া, যেখানে পার্থিবার ছলাকলা মাটির গন্ধের সঙ্গে মিশে এই ধূলির ধরণীকেই স্বর্গাদপি গরীয়সী ক'রে রেখেছে।

জানি, মিল্টনকে খর্ব্ব করার প্রবৃত্তিও হাস্যকর, এবং সে-প্রয়াস আমার নেই। তাঁর প্রদীপ্ত প্রতিভা ও অতুলনীয় সাফল্যের কথা না-পাড়লেও, কেবল তাঁর অধমর্ণদের অফুরন্ত তালিকার দিকে চাইলেই সে-মহত্ত্বের ঠিকানা পাওয়া যাবে। এ-ঋণ এমনি বিশ্বব্যাপী যে অখ্যাত বাঙলা সাহিত্য সুদ্ধ তার দায় এড়াতে পারেনি। কিন্তু তাহলেও একথা বলা নিশ্চয়ই মার্জ্জনীয় যে তাঁর কাব্যাদর্শের তনুবাত শিখরে আমার মতো জড়বাদীর স্বচ্ছন্দ বিহার স্বতই সংক্ষিপ্ত। মিল্টনী কাব্যের নির্ব্বিকার গাম্ভীর্য্যে মানুষী দুর্ব্বলতার স্থান নেই ; তার মর্ম্মে নীতিকারের নিশ্চিন্ত নির্ব্যূঢ়তা নিত্য বিরাজমান ; তার সম্ভ্রান্ত বন্ধুমণ্ডলীর মুখপাত্র স্বয়ং বিধাতা। কাজেই যে-নাট্যশালায় মিল্টনী ট্রাজিডির অভিনয় হয়, সেখানে মর্ত্ত্যচারীর প্রবেশ কোনোমতেই সহজসাধ্য নয়। অবশ্য অনেকে বলেন যে একটা অলৌকিক গরিমাই মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণ। আমি কিন্তু এ-মত গ্রহণে অক্ষম। কথাটা যদি একেবারে মিথ্যা নাও হয়, তবু তার একাদশদর্শিতা নিঃসন্দেহ। আমি অন্তত যে-মহাকাব্য-দুটির সঙ্গে সুপরিচিত—মহাভারত ও ইলিয়ড্—তাদের পরিপ্রেক্ষিতে মিল্টনী পবিত্রতার ছায়া নেই। এই কাব্য-দুটির বাণী মুখ্যত অনুবাদের মধ্যে দিয়েই আমার কাছে পৌঁছেছে, তাই তাদের ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করা আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা হবে। কিন্তু তাহলেও এ-সম্বন্ধে আর কোনো তর্ক চলেনা যে ওই আদি কবিদ্বয়ের দৃষ্টি বর্জ্জনের দিকে নিবদ্ধ ছিলোনা, অঙ্গীকারের জন্যেই উন্মুখ ছিলো। তাঁরাও কিছু তাঁদের কাব্য থেকে দেব-দেবীদের বাদ দেননি, বরং এমন এক প্রাক্তন যুগের বৃত্তান্ত লিখেছিলেন যখন সংসারের তুচ্ছতম ব্যাপারগুলিও অমর অধিকর্ম্মাদের উৎপাত থেকে অব্যাহতি পেতোনা। তবু অনুবাদের সময়ে দেখা গিয়েছে যে এই অতিমর্ত্ত্য অতিথিদের উক্তি-প্রত্যুক্তি সাধুভাষা ও পদ্যছন্দের সংস্পর্শে কেমন যেন মূল্যহীন হয়ে পড়ে। অথচ চলিত ভাষার অনাড়ষ্ট চরণ যেই পাষাণীর অঙ্গস্পর্শ করে, অমনি তার এতদিনের জড়তা কেটে যায়, অমনি বুঝি চিরন্তনী ঘুমিয়ে পড়তে পারে, কিন্তু মৃত সে কখনই হবেনা। এ-সত্য কেবল ইলিয়ড্

অনুবাদকেরাই অনুভব করেননি, যিনিই প্রাচীন কাব্যকে ভাষান্তর করার প্রয়াস পেয়েছেন, তাঁরই অভিজ্ঞতা অনুরূপ। ষোড়শ শতকে ইংরেজি ভাষা যখনও সংহত ও সংস্কৃত হয়ে ওঠেনি, তখন সে-দেশের অনুবাদশিল্প উৎকর্ষের যে-স্তরে পৌঁছেছিলো, আজকের পরিবর্দ্ধিত ভাষাজ্ঞান সত্ত্বেও আমরা তার অনেক নিচে প'ড়ে আছি। সুতরাং এমন মনে করা অনুচিত নয় যে অপ্রচলিত হয়ে প'ড়ে যত শব্দ আজ আভিধানিক জাদুঘরে সংস্কৃতির নিদর্শনরূপে সযত্নে রক্ষিত হচ্ছে, কর্ম্মজীবনে তাঁদের অত ঘটা ছিলোনা। দূরত্ব চিরদিনই গৌরবপ্রসূ, কাজেই মহাভারতাদির ভাষাকে যদি কোনো আধুনিক অনবদ্য ব'লেও ভাবেন, তবু সমসাময়িকদের চোখে সে ভাষা যে অতিশুদ্ধির পরিচায়ক ছিলো, এমন বিশ্বাস খুব সম্ভব পোষণীয় হবেনা।

সে যাই হোক, এতদিন অপ্রতিহত প্রতাপে অনাচার ক'রে এসে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে কাব্য হঠাৎ তার অমায়িক অবৈধতা পরিত্যাগ করলে। এই উৎক্রান্তির ইষ্টানিষ্টের ভার যদিও মুখ্যত মিল্টনকেই বহন করতে হবে, তবু আসলে তিনি উপলক্ষ্যমাত্র। এলিজাবেথীয় যুগের আতিশয্যের পরে তথাকথিত ধ্রুপদী আদর্শের প্রাদুর্ভাব শুধু স্বাভাবিক নয়, অবশ্যম্ভাবীও বটে। উপরন্তু ইতিমধ্যে সাহিত্যের "শ্রমবিভাগ"-ও অনেক দূর এগিয়েছিলো। ড্রাইডেনের অধ্যবসায়ে আড়ষ্ট ইংরেজি গদ্যে যে-অপূর্ব্ব সংবেদনশীলতার সাক্ষাৎ মিললো, তার পরে পদ্যকে সর্ব্বশক্তিমান মনে করার আর সার্থকতা রইলোনা। দেখা গেলো, গল্প বলা, তর্ক করা, শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি অনেক কর্ত্তব্য, যা এতদিন অগত্যা পদ্যের সাহায্যে কায়ক্লেশে সেরে নিতে হতো, তা গদ্যের দ্বারা অতি সহজে ও শোভন উপায়ে সম্পন্ন হয়। উপরন্তু ঠিক এই সময়েই জীবনের স্থূল দিকটাও খুব বিস্তৃত হয়ে পড়লো। রিনেসেন্সের পর থেকে কৌতূহলী মানুষ যে-সকল নূতন ক্ষেত্রে কর্ষণ আরম্ভ করেছিলো, তাতে অভাবনীয় ফল ফল্‌লো, এবং বোঝা গেলো যে ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির আবিষ্কার পদ্যের মারফতে কোনোমতেই লোকসমক্ষে উপস্থিত করা যাবেনা। এ-অবস্থায় গদ্যের পদবৃদ্ধি অনিবার্য্য। তখনকার সাহিত্যিকেরা যদি সত্যই কঠোরহৃদয় ব্যাবহারিক মানুষ হতেন, তবে অকারী মন্ত্রতন্ত্রের সঙ্গে অব্যবহার্য্য পদ্যকেও তাঁরা বিস্মৃতির পিঁজরাপোলে পাঠাতে দ্বিধা করতেননা। কিন্তু অতখানি অকৃতজ্ঞতা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হলোনা, তাঁরা ঠিক করলেন যে সভ্যতার এই অতিজীবিত সেবকটিকে অজ্ঞাতবাসে না-পাঠিয়ে, তাকে দৈনিক জীবনযাত্রা থেকে ছুটি দেওয়া হবে ; কিন্তু যখন উৎসব-অনুষ্ঠানের সময় আসবে, তখন মিছিলের শীর্ষস্থান অলঙ্কৃত করবে সে-ই।

আমার বিশ্বাস মুদ্রাযন্ত্রের বহুল প্রচলন এই সঙ্কল্পের অন্যতম কারণ। যতদিন অলি-গলিতে ছাপাখানার আবির্ভাব হয়নি, যতদিন সাহিত্যের পাণ্ডুলিপি কেবল গ্রন্থাগারেই বিরাজ করতো, ততদিন কাব্যের ইচ্ছাবিহার অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিলো, কারণ ততদিন যারা কাব্যের মজলিসে আসন পেতো, তারা অধিকাংশই বিশেষজ্ঞ, কাব্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে সুপরিচিত, তার দুর্ব্বলতার সম্বন্ধে সচেতন, কাব্যপাঠে সুদক্ষ। কিন্তু এখন থেকে যারা ভিড় ক'রে এলো, পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার ধৈর্য্য তাদের ছিলোনা। সাহিত্য তাদের অবসরের সাথী হয়ে উঠলো, এবং যেহেতু সে-যুগের প্রলোভন যে-মাত্রায় বেড়েছিলো, অবসর সে-অনুপাতে বাড়েনি, তাই লেখকের প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়কে প্রত্যক্ষ করার মতো সময় তারা ক'রে উঠতে পারলেনা, আভরণের পারিপাট্যকে প্রকর্ষতার চিহ্ন ব'লে ভুল করলে। এই শ্রেণীর পাঠক, বিশেষ ক'রে এই শ্রেণীর অনুকারকের কাছে স্বাধীনতা সহজেই স্বেচ্ছাচারে পরিণত হতে পারে, কাজেই সন্ত্রস্ত কবিরা কাব্যকে বিধিবদ্ধ করার চেষ্টায় আত্মোৎসর্গ করলেন। ফলে হিরোয়িক কাপ্‌লেটের শৃঙ্খল নির্ম্মাণ হলো, স্থান-কাল-ঘটনার নির্ব্বাসিত সঙ্গতি রঙ্গালয়ে পুনঃপ্রবেশ করলে, বিবেচকেরা জানালেন যে ট্রাজিডির জাতিরক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণকে রাজসিক আড়ম্বরে বর্ম্মাবৃত করা। সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের ভাষাও এত গম্ভীর হয়ে উঠলো যে জনসাধারণ শ্রুতিমাত্রেই বুঝলে এই রুচিসমাহিত সমাজে শৈথিল্যের উপক্রম সুদ্ধ দণ্ডিত হবে। দুর্ভাগ্যবশত এত ক'রেও অভিষ্টসিদ্ধি হলোনা, ফল দাঁড়ালো ঠিক উল্‌টো। হয়তো সংস্কৃতি কাব্যের প্রকৃতিবিরোধী। অন্ততপক্ষে এটা নিশ্চয় যে ড্রাইডন-পোপের পরে ইংরেজি কাব্যের অতি উর্ব্বর ভূমিও, বহুদিন পর্য্যন্ত উষর রয়ে গেলো। আত্মপ্রকাশের প্রণোদনা যাদের সক্রিয় ক'রে তুললে, তারা বরণমালা দিলে গদ্যের গলায়। অন্যেরা গ্রে-র আক্ষেপকে সার্থক ক'রে, অব্যক্তির সোনার খনিতে গেলো মৌরসি স্বত্বের খোঁজে। অবশ্য ব্লেকের মতো দু-একজন হঠকারী গোল বাধাতে ছাড়লেনা বটে, কিন্তু সমসাময়িক সুধীমণ্ডলী তাতে বিচলিত না-হয়ে, তাদের ঔদ্ধত্যকে উন্মত্ততা ব'লে ক্ষমা করলেন; এবং অতিবড় খেয়ালীকেও একথা মানতে হবে যে তাদের কবিত্ব-সম্বন্ধে সহধুরীদের মত যতই ভ্রান্ত হোক, তাদের চিত্তবিকার-সম্বন্ধে সেকালের সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নয়।

এর পরের ইতিহাস সুবিখ্যাত। আঠারো শতকের শেষ দশায় ফরাসীদেশে যে-উপনিপাত সুরু হলো, তার ধাক্কা রুচিবাগীশেরা সামলাতে পারলেননা, কণ্ঠাগত-প্রাণে স্বীকার করলেন যে উপেক্ষিত বর্ব্বরেরা সত্যই যদি ক্ষেপে ওঠে, তবে স্বয়ং বিধাতারও নিস্তার নেই। ফলে কলিন্স্‌-এর

গৌরব পোপের প্রতিপত্তিকে ছাড়িয়ে গেলো, ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ্‌ চলতি ভাষাকে কাব্যের ভূষণ ব'লে প্রচার করলেন, অভিজাত বাইরণ দিগ্বিজয়ে বাহির হলেন, রথপতাকায় বর্ণ্‌স্‌-এর কৃষকী প্রবচন লিখে। দেখতে দেখতে গদ্যের চাহিদা কমে, পদ্যের প্রসার বেড়ে গেলো, শুভবাদীরা জোর গলায় হাঁকলেন যে কাব্যসম্ভারে উনিশ শতক এলিজাবেথীয় যুগকেও হার মানাবে, এবং যেন তাঁদের আত্মশ্লাঘার শাস্তিস্বরূপ, মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে এমন এক কবির দেহান্তর ঘটলো যিনি শেক্‌স্‌পীয়রের সমকক্ষ না-হলেও, পদমর্য্যাদায় ঠিক তাঁর নিচেই আসন পেলেন। এর পরে কাব্যকে ঠেকিয়ে রাখা দায় হলো। নিরবচ্ছিন্ন সুসময়ের ফলে কবিরা আবার উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলেন। গদ্য-পদ্যের পুনর্বিবাহে পৌরহিত্য ক'রেও ব্রাউনিঙ জাতিচ্যুত হলেননা, টেনিসন্‌ গ্রাম্য ভাষায় কাব্যরচনার প্রয়াস পেলেন, এবং স্বয়ং সুইন্‌বর্ণ্‌ বিদ্রোহী হুইট্‌ম্যানকে কাব্যের ত্রাণকর্ত্তা ব'লে উপাধি দিলেন। অবশ্য মুক্তচ্ছন্দের এই আদিপুরুষটির যথার্থ মূল্য ইংলণ্ড সেদিনেও বোঝেনি, আজও ঠিক বোঝেনা; এবং অল্প দিন যেতে-না-যেতেই সুইনবর্ণ্‌ সেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপত্রের প্রত্যাহার ক'রে, নিজের অমার্জ্জনীয় ভুল নিষ্কুণ্ঠ-চিত্তে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাহলেও সুইনবর্ণের পরে যে-কবিদের আবির্ভাব হলো, তাদের কাব্যাদর্শে একটা অভাবনীয় অভিনবত্ব দেখা দিলে। ইয়েট্‌স্‌-প্রতিষ্ঠিত "রাইমার্স্‌ ক্লাব"-এর সভ্যেরা যে-কবিতা লিখতে লাগলেন তার অঙ্গে গদ্যের পাপস্পর্শ হয়তো লাগলোনা, কিন্তু সুইন্‌বর্ণের রসালু বহুলতাও প্রশ্রয় পেলেনা। রক্ষণশীলেদের উপহাস কুড়িয়ে তাঁরা ঘোষণা করলেন যে কাব্য ততটা পাঠ্য নয়, যতটা শ্রাব্য। এই অনভ্যস্ত আদর্শে কাব্যের সঙ্গে জনগণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ তো স্বীকৃত হলোই, উপরন্তু লিখিত সাহিত্যের যেটা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, অর্থাৎ অচলয়াতন পারিভাষিকতা, তাও কেটে গিয়ে সঞ্জীবিত কাব্য আবার ঋজু, স্বচ্ছ ও স্বাবলম্বী হয়ে দাঁড়ালো। দেখা গেলো যে কাব্যকে আবৃত্তির যোগ্য ক'রে তুলতে হলে, তার অলঙ্কারের ভার হালকা করা দরকার। সুতরাং ছন্দের গ্রন্থী আলগা ক'রে, ভাষার স্বাভাবিক ধ্বনিবৈচিত্র্যকে অব্যাহতি দেওয়া হলো, রূপকের মোহ কাটিয়ে প্রত্যক্ষের অনুসন্ধান চললো, অপরিচয়ের অসীম বিস্ময় অত্যাসঙ্গের পরিতৃপ্তির কাছে মাথা নোয়ালো। অবশ্য এত করা সত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কবিরা ছন্দোমুক্তিতে পৌঁছতে পারলেননা; তার জন্যে আরো পনেরো-বিশ বছরের দেরি ছিলো। তবু এই বিদ্রোহবাহিনীর শিরোমণিদের অকালমৃত্যুর পরেও, সাইমন্‌স্‌ ফরাসীদেশ থেকে যে-নববিধানের নমুনা ইংরেজি কাব্যে আমদানি করতে লাগলেন, তা দেখে আর সন্দেহ রইলোনা পরিবর্ত্তন আসন্ন। এর পরের ঘটনা

আর ইতিহাসের অঙ্কারূঢ় নয়, সমসাময়িক পক্ষপাতের অন্তর্গত। আধুনিক কাব্যপ্রচেষ্টা এখনো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি। কাজেই তার ভবিতব্য-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া নিশ্চয়ই মূঢ়তা হবে। তবে একটা কথা বোধহয় ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়েছে ; সে হচ্ছে এই যে কাব্য আর মুক্তি, এ-দুয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, বরং এরা পরমাত্মীয় ; যদি নিরাসক্ত ভাবে সাধনা করা যায় তবে অরাজকতার মধ্যে দিয়েও কাব্যের নির্দ্বন্দ্ব লোকে উপনীত হওয়া যাবে।

কাব্যের স্বরূপ-সম্বন্ধে আমার উদ্ভট অনুমান যে কেবল ইংরেজি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণেই প্রমাণিত হবেনা, তা আমি জানি। অপরাপর সাহিত্যকে সাক্ষী ডাকা আমার সাধ্যের অতীত। কিন্তু তাহলেও একটা অন্ধ ধারণা আমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারিনা যে সমস্ত পাশ্চাত্য কাব্যই আমার সমর্থন করবে। প্রাচীর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, কারণ এ-অঞ্চলে মানুষের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তি কেবল আধ্যাত্মচিন্তাতেই নিমগ্ন থেকেছে। ফলে এদেশের কাব্য হয় চিত্তবিনোদনের নিঃসার উপাদান, নয় তত্ত্বদর্শনের আধার। কাজেই যেখানে অচিন নূতনের অগমন-আশঙ্কায় আমাদের আমোদ-প্রমোদে বিঘ্ন ঘটেছে, সেখানে কবি এতটুকুও আমল পায়নি; আবার যেথায় উপদেশকে সারগর্ভ মনে হয়েছে, সেথায় উপদেশবাহকের বিষয়ে আমরা নিরুৎসুক থেকেছি। এতাদৃশ আবেষ্টন উচ্চাঙ্গের শিল্প-সৃষ্টির প্রতিকূল, কারণ জীবনের সকল হিসাবনিকাশের মতো ললিত কলার খতিয়ানেও দেনা-পাওনায় যোগবিয়োগ হয়ে কেবল শূন্যই অবশিষ্ট থাকে। তবু যতদূর জানি ও শুনেছি, তাতে মনে হয় পূর্ব্বের উদাসীনতাও আর অটল নেই। চৈনিক জীবনের সর্ব্বত্র প্রথাপসারণের ফলে যে-সর্ব্ব-নাশের সূত্রপাত হয়েছে, চীনে কবিতায় তার ছায়া দেখিনি ; এবং জাপানী সাহিত্যের অভিজ্ঞতা অন্যরূপ নয় ব'লেই আমার বিশ্বাস। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের সঙ্গে আমি পরোক্ষভাবেও পরিচিত নই, তাই তাদের বিষয়ে মন্তব্য করা আমার অসাধ্য। কিন্তু বাঙলা সাময়িকীতে বাকবিতণ্ডার বহর ও ঝাঁঝ দেখে মনে হয় যে এদেশ পাণ্ডববর্জ্জিত হলেও, কালাতিক্রান্ত নয়। অবশ্য বাঙলা কাব্যে খুব বেশি ভাঙাচোরার দরকার হয়নি, কারণ তার গতানুগতিক সঙ্কীর্ণতা কোনোদিনই অত্যধিক ছিলোনা। কিন্তু এই ব্রাত্যতার কতখানি স্বেচ্ছাকৃত আর কতটা আবশ্যিক, তা বলা কঠিন। আমার বিবেচনায় উনিশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙলা গদ্যের নামমাত্র জানা ছিলোনা ব'লেই এখানকার ছান্দসিকেরা বাধ্য হয়ে পদ্যকে অবারিত-গতির অধিকার দিয়েছিলেন। নচেৎ যারা সমাজের শ্রদ্ধা হারাবার ভয়ে নিজেদের কামাগ্নিকে দেবতার আড়ালে লুকাতে দ্বিধা করেনি, তারা

যে কেবল ছন্দের বেলায় স্বায়ত্তশাসনের নির্দ্দেশ মানবে, এমন ভাবা সহজ নয়। প্রাচ্যের অন্যান্য সাহিত্যের মতো বঙ্গসাহিত্যেও জীবনের প্রভাব অত্যল্প ; কিন্তু যখন তার বংশকরিকার কথা স্মরণ করা যায়, তখন মনে হয় এই অনধিক সংস্পর্শই যথেষ্ট বিস্ময়কর। কারণ বাঙলা সাহিত্যের উৎপত্তি সংস্কৃত সাহিত্যের ছায়ায়, এবং সে-সাহিত্যের গর্ব্বই হচ্ছে এই যে তার ভাষা দেবভাষা, অর্থাৎ মানুষের অকথ্য ভাষা। নৃতত্ত্ববিদেরা ব'লে থাকেন মন্ত্র বিবর্ত্তিত হয়েই কাব্যে দাঁড়িয়েছে। এক সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের বিধিবদ্ধ আচারনিষ্ঠা দেখেই এ-সিদ্ধান্তকে সমীচীন মনে হবে। অবশ্য আর্য্যাজাতীয় দু-একটা ছন্দ শুনে, এমন ভুল হয়তো মাঝে মাঝে হয় যে সংস্কৃত কবিদের সহিষ্ণুতাও বুঝি অসীম ছিলোনা। কিন্তু সে-মরীচিকার আয়ু সামান্য, ঈষদ্ মনোযোগেই ধরা পড়ে আর্য্যার আপাত-স্বাচ্ছন্দ্যও একটা অকাট্য পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। ব্যায়ামকুশলী সৈন্যদলের কুচকাওয়াজে যেমন থেকে থেকে এক-একটা সুনিয়ন্ত্রিত ও আয়াসসাধ্য শৈথিল্যের ফাঁক আসে, এও ঠিক তেমনি। নেপথ্য থেকে প্রযোজক ইঙ্গিত করেছেন, তাই অনুগত নর্ত্তকের দল পূর্ব্বাভিনীত ভঙ্গীতে সার ভেঙে, শিক্ষানুরূপ উপায়ে বৈচিত্র্য-উৎপাদনের চেষ্টা করছে।

আমাদের বিধিলিপিতে এতখানি দুর্দ্দশা লেখা ছিলোনা বটে, তবু পয়ারের পদ্মমধু খেয়ে বঙ্গভারতীও নেহাৎ অল্প বিব্রত হননি। তবে দেবীর পুণ্যবল বোধহয় অশেষ ছিলো, তাই পরদেশী প্রচারকদের প্ররোচনায় একদিন হঠাৎ এক নূতন কালাপাহাড় সদর্পে মন্দিরে প্রবেশ ক'রে সরস্বতীকে বনেট পরিয়ে দিলেন, এবং পোষাকের এমনি গুণ যে সঙ্গে সঙ্গে পাষাণীর নিঃসাড় দেহে যাবনিক চাপল্যের হিল্লোল উঠলো। দুর্ভাগ্যক্রমে মাইকেলের বিপ্লবপ্রবৃত্তি যতটা ছিলো, কবিপ্রতিভা ততখানি ছিলোনা ; কাজে ই মেঘনাদ-বধ যে-পরিমাণে গর্জ্জন করলে, তার তুল্য বর্ষণে অপারগ হলো। মাইকেলের উপরে মিলটনের প্রভাবও অত্যল্প ছিলোনা। এবং রুগ্ন কাব্যকে প্রকৃতিস্থ করার জন্যে এই কবিরাজের চিকিৎসা যেহেতু শ্রেষ্ঠ উপায় নয়, তাই মাইকেল কেবল ছন্দকে অমিত্রাক্ষর ক'রেই ক্ষান্ত হলেন, বুঝলেননা যে ভাষা প্রাকৃত না-হলে প্রকৃত কাব্য লেখা অসম্ভব। তবু মাইকেলের সমর্থনে একথা অবশ্যস্বীকার্য্য যে ভাষা-সম্বন্ধে তিনি কোনোকালেই উদাসীন ছিলেননা। তৎকালীন পুঁথিগত বাঙলা তাঁর চোখে অচল ঠেকেছিলো ; এবং সজীব ভাষার সন্ধানে তাঁকে যদি শেষ পর্য্যন্ত সংস্কৃত শব্দকোশেরই শরণাপন্ন হতে হয়ে থাকে, তাহলে শুধু তাঁকেই একদেশদর্শী বললে চলবেনা, অসংস্কৃত বাঙলার আত্যন্তিক দৈন্যও মেনে নিতে হবে। অবশ্য এই দারিদ্র্যের জন্যে আমরা লজ্জা অনুভব করতে

বাধ্য নই, কারণ অত শতাব্দীর অবজ্ঞায় যে অপাঙক্তেয় হয়েছিলো, সেই কাঠবিড়ালী যদি লঙ্কাবিজয়ের দিনে গায়ের ধুলা ঝেড়ে সেতুবন্ধের এক-আধটা ছিদ্রও ভরাতে পেরে থাকে, তবে সেটাই তার প্রচ্ছন্ন জীবনীশক্তির পরিচয়, অন্য সমস্তই একান্ত বাহ্য। উপরন্তু মাইকেল-সম্পর্কে একথাও মনে রাখা কর্ত্তব্য যে তিনি ইংরেজিশিক্ষার প্রথম যুগের মানুষ, এবং নিজ বাসভূমে পরবাসী হওয়াই ছিলো তখনকার চিৎপ্রকর্ষের পরাকাষ্ঠা। সুতরাং এমন সন্দেহ হয়তো অনুচিত নয় যে মাইকেল বাঙলা ভাষাকে ভালোবাসতেন বটে, কিন্তু তার প্রকৃতি বুঝতেননা, তাই তিনি বঙ্গভারতীর সেবাই ক'রে গেছেন, তাকে সুস্থ করতে পারেননি। এ-অনুমান মিথ্যা হলেও এটা অন্তত সত্য যে বাঙলা আক্ষরিক ছন্দকে স্বভাবত ত্রৈমাত্রিক মনে করায় যতখানি বৈদেশিকতার আভাস আছে, বাঙলা ভাষাকে সংস্কৃতের গোত্রজ ব'লে ভাবায় সে-পরিমাণের বিধর্ম্মিতা নেই। কিন্তু এ-আলোচনার মূল্য খুব বেশি নয়, কারণ মাইকেলের ছিদ্রান্বেষণ আমার অনভিপ্রেত। আমি জানি যে মহাকবি না-হলেও নিয়ামক হিসাবে তিনি অদ্বিতীয়, এবং যতদিন বাঙলা কাব্যের অনুকম্পায়ী জুটবে, ততদিন তাঁর নামকীর্ত্তনে লোকাভাব হবেনা। কারণ মাইকেল শুধু মৃয়মাণ বাঙলা কাব্যকে উদ্দীপিত ক'রেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েননি, বাঙালী কবিকে তরজাওয়ালার দল থেকে প্রথম অব্যাহতি দিয়েছিলেন তিনিই। তাঁর অব্যবহিত পরেই বঙ্গাকাশে যতগুলি জ্যোতিষ্কের উদয় হয়েছিলো, তারা নিতান্তই আকাশ-প্রদীপ। তবু বাঙালী মনীষীরা এই নগণ্যদের জন্যে যে-অকৃপণ সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা নিশ্চয়ই মৃন্ময় দ্রোণের চরণে একলব্যের অর্ঘনিবেদনের মতো।

মাইকেলকে পথপরিচায়ক হিসাবে না-পেলে বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হতোনা, এমন কল্পনাও পাগলামি, কারণ তাঁর সমান কবি শতযুগে একবার জন্মায়, এবং তাদের আগমন ধূমকেতুর মতোই স্বয়ম্বশ ও স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু তাহলেও একথা অতিসত্য যে মাইকেল ও বিহারীলালের বৈফল্যের দৃষ্টান্ত তাঁর সামনে জাজ্জ্বল্যমান না-থাকলে, তাঁকে অনেক অকিঞ্চিৎকর পরিশ্রমে বহু শক্তি ব্যয় করতে হতো। ভুললে চলবেনা যে শুধু আবেগাতিশয্য বা অফুরন্ত কল্পনা দিয়ে কাব্যরচনা হয়না, তার জন্যে রূপায়ণও অপরিহার্য্য। আমার মনে হয় রূপই কবিতার প্রধান উপকরণ, এবং এ-রূপ যদি যথার্থই উপযোগী রূপ হয়, তবে কল্পনার ন্যূনত্বেও বিশেষ আসে যায়না। অবশ্য ঐশ্বর্য্যমাত্রেই বর্জ্জনীয় নয়। কিন্তু যেমন অর্থশাস্ত্রবিদদের মতে প্রভূত সঞ্চয়ের চেয়ে যথেচ্ছ অপচয়ও ভালো, তেমনি মস্তকে সুমেরু প্রমাণ কল্পনা বয়ে বেড়ানো ততটা প্রয়োজন নয়, যতটা প্রয়োজন নিজের কল্পনাকে পরের কাজে লাগানো। এ-তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের কাছে চিরদিনই সুস্পষ্ট, তাই তাঁর সাহিত্যে

প্রসঙ্গ ও প্রকরণের যে-নিবিড় সহযোগ দেখি তা অন্যত্র দুর্ল্ভ মনে হয়। বলাই বাহুল্য এই সামঞ্জস্যবিধানের অধিকাংশ ভারই প্রসঙ্গকে বইতে হয়, কারণ প্রসঙ্গ দৈবের দান, তার ক্ষেত্রে পরিগ্রহণ ও পরিবর্জ্জন ছাড়া কোনো মধ্যপন্থার অবকাশ নেই। অতএব যা তাকে ধারণ করে, অর্থাৎ ছন্দ, ভাষা ও প্রতীক, স্থিতিস্থাপকতা চাই তাতে। এইখানেই পূর্ব্ববর্ত্তীদ্বয়ের পরীক্ষার—হয়তো ভ্রান্ত পরীক্ষার—ফল রবীন্দ্রনাথের শ্রমলাঘবের সহায়তা করেছিলো। সত্যে পৌঁছানোর পথ যদিও একটি, তবু তার স্থিতি গোলকধাঁধায় হওয়াতে, বারম্বার পথচ্যুতি প্রায় অবশ্যম্ভাবী। কাজেই বিপথগুলো যদি পদচিহ্নে পরিপূর্ণ থাকে, তবে ঠিক পথটাকে চিনে নেওয়া সহজ হয়ে পড়ে। অবশ্য প্রথম চেষ্টাতেও কেউ কেউ অদৃষ্টক্রমে নান্যপন্থায় পদার্পণ করেন বটে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো সদাসচেতন শিল্পীর সম্বন্ধে এই দৈবানুগ্রহ কেমন যেন নিষ্প্রয়োজন মনে হয়। তাই যখন দেখি যে রবীন্দ্রনাথকে হাতড়ে বেড়াতে হলোনা, প্রথম যৌবনেই তিনি চিত্রাঙ্গদার মতো অনবদ্য কাব্যের সাহায্যে বঙ্গসাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের এলেকায় উত্তীর্ণ ক'রে দিলেন, তখন কেবল চিত্রাঙ্গদা-লেখককে ধন্যবাদ জানিয়েই খালাস হতে পারিনা, সেই প্রাক্‌রৈবিক কবিদেরও প্রণাম করি, যাঁদের গবেষণায় বাঙলা ভাষা ও ছন্দের স্বরূপ অত অনায়াসে রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা দিলে।

কাব্যের ধনিকতন্ত্রে জন্মে রবীন্দ্রনাথ অনুপার্জ্জিত সম্পত্তির আয়ে বিত্তশালী ব'লে খ্যাত হয়েছেন, এমন উদভ্রান্ত ধারণা আমার নেই। তাঁর কর্ম্মযোগের সঙ্গে যাঁরাই পরিচিত, তাঁরাই জানেন রবীন্দ্রসাহিত্যের অতুল ঐশ্বর্য্য কি অক্লান্ত চেষ্টা ও অবিরত আত্মত্যাগের ফল। নিজের স্বাচ্ছন্দ্যকে কী পরিমাণে অবদমিত করলে, তবে তাঁর মতো ছন্দস্বচ্ছন্দ হওয়া যায়, তা অকবিদের শুদ্ধ বোঝা উচিত। তাছাড়া প্রকৃতি ও পুরুষকারের পরিণয়েই যে প্রতিভার সম্ভব হয়, এ-তথ্যও আজ সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু এ-সমস্ত স্বীকার ক'রেও এমন বিশ্বাস হয়তো যুক্তিসঙ্গত যে রবীন্দ্রনাথ কালের আনুকূল্য থেকে একেবারে বঞ্চিত হননি। মহাকবির আবির্ভাব লগ্নসাপেক্ষ, এ-কথা মানার জন্যে জ্যোতিষশাস্ত্রে আস্থা অনাবশ্যক। মহত্ব, তা সে যে-প্রকারেরই হোকনা কেন, সুযোগব্যতীত ব্যক্ত হয়না; এবং সাহিত্যিক মহত্ব প্রকাশের সুসময় হচ্ছে ভাষার শৈশবাবস্থা। সম্প্রতিবিদরা মুখে যতই বড়াই করুন, মনে তাঁরাও জনসাধারণের সঙ্গে একমত যে প্রগতির পথে মহাকবির সংখ্যা ক্রমেই ক'মে আসছে। মানুষের বুদ্ধি ও সামর্থ্য যখন অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবর্দ্ধমান, তখন শুধু তার কাব্যানুভূতিতেই ক্ষয় ধরেছে, এমন বিশ্বাস টিঁকবেনা। তাই আমরা মনে করতে বাধ্য যে

কাব্যের উপাদানে এখন আর সে-নমনীয়তা নেই, যাতে মহাকবির মহানুপ্রেরণা মূর্ত্তিমান হয়ে উঠতে পারে। এই সিদ্ধান্ত যাঁদের কাছে অলীক ব'লে ঠেকবে, তাঁদের অতীত ইতিহাস স্মরণ করতে বলি। সফোক্লিস্, লুক্রিশিয়স্, শেক্‌স্‌পীয়র, গোয়টে, এবং সম্ভবত কালিদাস, এতগুলি মহাকবির মধ্যে কেউই যে পরিপুষ্ট ভাষার পরিচর্য্যা করেননি, তা নিছক দৈবযোগ হতে পারেনা। তাঁরা প্রত্যেকেই যখন এসেছিলেন, তখন তাঁদের স্ব স্ব ভাষার বয়ঃসন্ধিকাল, গতানুগতিকের শাসন তখনো সুরু হয়নি, বার্দ্ধক্যের স্থবিরতা তখনো কল্পনাতীত, সম্মুখে শুধু সম্ভাবনার অবাধ প্রান্তর। অথচ অতীত তখন আর নিতান্ত নগণ্য নেই, তার পরিণতির পূর্ব্বাভাস ইতিমধ্যেই সূচিত হয়ে গেছে, অসংখ্য ভুলভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে সে প্রত্যুষের অনিশ্চয়তা ছেড়ে সবেমাত্র প্রভাতের আত্মস্থ আলোকে এসে পৌঁছেছে। এ-অবস্থায় মহাকবির আগমন যেমন বাঞ্ছনীয়, তেমনি স্বাভাবিক ; এবং রবীন্দ্রনাথের জন্মলগ্নেও আমি এই ঘটনাচক্রের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই।

এখনি যা বললুম, তার থেকে যদি কেউ ভাবেন যে আমি আধুনিক কবিদের সুযোগের প্রতীক্ষায় নিষ্ক্রিয় হয়ে ব'সে থাকতে উপদেশ দিচ্ছি, তবে ভুল হবে। সে তো দূরের কথা, আমি বরং মনে করি যে অত্যধিক কালনিষ্ঠাই আধুনিক কাব্যের প্রধান শত্রু। এমন লেখক কোনোদিনই বিরল নয়, রচনাশক্তির প্রাখর্য্যে যাঁরা প্রথম শ্রেণীতে স্থান পেতে পারেন ; কিন্তু তাঁদের অহমিকার মাত্রা শ্রেষ্ঠ কবিদেরও হার মানায়। তাই যদি কখনো সুযোগের সাহায্যে তাঁরা সমকালীন পাঠকের শ্রদ্ধায় অধিকারী হন, তাহলে সেই শ্রদ্ধা হারাবার ভয়ে তাঁদের রূপকারী বিচারবুদ্ধি পঙ্গু হয়ে পড়ে। ফলে যে-উপায়ে একদিন পাঠকের হৃদয় জয় করেছিলেন, তাকে জরাজীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য জেনেও তাঁরা উপায়ান্তর উদ্ভাবনে অক্ষম হন, এবং এই অক্ষমতার জন্যেই অকৃতজ্ঞ পাঠকের পক্ষপাত হারান। কাব্যের সত্তা কি, এ নিয়ে অনেক তর্ক হয়ে গেছে, কিন্তু মীমাংসা হয়নি। কাজেই সে-প্রসঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয় না-ক'রে, শুধু এইটুকু বলাই নিরাপদ যে কল্পনামূলক সাহিত্যমাত্রই যখন বৈচিত্র্য-ব্যতিরেকে বাঁচতে পারেনা, তখন তাকে বাদ দেওয়া কাব্যের পক্ষেও নিশ্চয়ই অকল্যাণকর। প্রত্যেক উৎকৃষ্ট কবিতাই কালোপযোগী হতে বাধ্য, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিতার আরও একটা বাড়তি গুণ থাকে, যেটা কালাতিরিক্ত। সুযোগ যেমন আসে, তেমনি যায়, সুতরাং তার সহযোগ ভিন্ন যদি শ্রেষ্ঠ কাব্য লেখা না-ই যায়, তবে মহাকবিকে এমন কোনো মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা আয়ত্ত করতে হবে, যাতে অতীত সুযোগ প্রয়োজনমতো পুনর্জ্জীবিত হয়ে উঠতে পারে। মহৎ কাব্যের এই ঐন্দ্রজালিক লক্ষণটিকেই আমি উপরে বৈচিত্র্য নাম

দিয়েছি। এই বৈচিত্র্য পশ্চিমদেশের ঐকতান সঙ্গীতের মতো, একটা সমষ্টিগত রূপ তার অবশ্যই আছে, এবং সেটাই সর্ব্বপ্রথমে শ্রোতাকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করে। কিন্তু এইখানেই তার আবেদনে পূর্ণচ্ছেদ পড়েনা ; বহুবার শুনে যখন তার সমগ্র বহিরেখা শ্রোতার স্মৃতিপটে অঙ্কিত হয়ে যায়, তখন সুরু হয় তার বিশ্লেষণ, প্রত্যেক অঙ্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার, প্রত্যেক যন্ত্রের স্বরসঙ্গতির বিবরণ, প্রত্যেক সুরের সার্থকতার পরিমাপ। যে-শিল্পসৃষ্টি এই দ্বিরায়তনিক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পারে, সাময়িক শিল্পের আপাতরমণীয়তা হয়তো তাতে থাকেনা, কিন্তু একটা আত্মসমাহিত উৎকর্ষ তাকে অতিপরিচয়ের অবজ্ঞা থেকে রক্ষা করে। এ ছাড়া অন্য উপায়েও বৈচিত্র্য সৃজন চলে। হিন্দুসঙ্গীতের নির্দ্দেশে সমগ্র কাব্যজীবনকে নানাবিধ রাগরাগিণীর মধ্যে ভাগ ক'রে দিলে কবির ব্যয়কুণ্ঠা সূচিত হয় বটে, তবু সে-রীতি ইতিহাস-অনুমোদিত। কিন্তু ভৈরবীর তানে খ্যাতিসূর্য্য উদিত হয়েছিলো ব'লে যে-সুগায়ক সারাদিন কেবল ভৈরবীই ভাঁজতে থাকেন, তাঁর আসরে শ্রোতার সংখ্যা যে অচিরেই শূন্যে এসে ঠেকবে, তা বলাই বাহুল্য।

দুঃখের বিষয় কথাগুলো লেখায় যতটা সুবিদিত ব'লে লাগছে, কার্য্যত ততটা সুস্পষ্ট নয়। এমন-কি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্, শেলি, টেনিসন ইত্যাদির মতো প্রথম শ্রেণীর কবিরাও কাব্যে বিচিত্রতার মূল্য বোঝেননি ; তাঁরা কাব্যকে তাঁদের নির্ব্বিকার ব্যক্তিত্বের ভারবাহীরূপে ব্যবহার করেছিলেন। ফলে উদ্দেশ্যে, আদর্শে ও প্রতিভায় শেক্‌স্‌পীয়র-প্রমুখ নৈর্ব্যক্তিক কবিদের সমকক্ষ হয়েও, এঁরা সম্ভবত লোকোত্তর অমৃত-লোকের বহিঃপ্রান্তেই থেমে গেছেন। শিল্প-সম্বন্ধে নৈর্ব্যক্তিক বিশেষণ নিয়ে অনেক বাকবিতণ্ডা হয়ে গেছে, তাই এইখানেই ব'লে রাখা ভালো যে ঐ শব্দের দ্বারা আমি কোনো অমানুষিক লক্ষণের ইঙ্গিত করছিনা, শুধু সেই ধরণের শিল্পসামগ্রীর কথা বলছি, যাতে লোকশিক্ষার চেয়ে লোকরঞ্জনের চেষ্টাই বেশি পরিস্ফুট। উদগ্র ব্যক্তিবাদীদের সঙ্গে আমিও বিশ্বাস করি যে কবিও যখন মানুষ, সেকালে অন্যান্য মানুষের মতো কবির ভাবনাবেদনাও তাঁর ক্রিয়াকলাপে অল্পবিস্তর প্রকাশ পেতে বাধ্য। তাহলেও এমন কাব্য আমি অনেক দেখতে পাই যার প্রবর্ত্তনা কবি-পরিচিত নয়, কেবল সৃষ্টি। আমার বিবেচনায় "টেম্পেষ্ট্" মুখ্যত নাটক হিসাবেই লিখিত হয়েছিলো। শেক্‌স্‌পীয়রের তৎকালীন অভিজ্ঞতা যে ওই রচনায় স্থান পায়নি, তা হলফ ক'রে বলতে পারবোনা বটে, কিন্তু এটা নিশ্চিত জানি যে টেনিসনের জীবনকাহিনীর ছায়াতিরিক্ত হয়েও "আইডিল্‌স্ অফ দি কিঙ্" যে-ভাবে টেনিসনকে ধরিয়ে দেয়,

প্রস্পেরো কখনো ঠিক তেমনি ক'রে আত্মবিস্মৃত হয়না। সে যাই হোক্, এই রকমের আরও অনেক উদাহরণ দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে উক্ত নৈর্ব্যক্তিক লক্ষণ ব্যতীত কাব্য উপাদেয় হতে পারে কিন্তু অমর হয়না, কারণ নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে বৈচিত্র্যের সম্বন্ধ অতিঘনিষ্ঠ। ব্যক্তি সব সময়েই সীমাবদ্ধ, তার মজ্জায় মজ্জায় যত বিদ্রোহই থাকুকনা কেন, স্থান-কালের দাসত্ব তার অবশ্যকর্ত্তব্য। উপরন্তু মনস্তাত্ত্বিকদের কাছে শোনা যায় যে একটা ঐকান্তিক একাগ্রতা ছাড়া ব্যক্তিত্বের আর কোনো অর্থ নেই। ফলে নিজের ভিতর থেকে সাহিত্যিক বৈচিত্র্যের পথ্যসংগ্রহ কবির সাধ্যাতীত, কাব্যকে সে যদি চিরন্তনের প্রকোষ্ঠে পৌঁছে দিতে চায়, তবে উৎকেন্দ্রিক হওয়া ছাড়া তার গতি নেই। বিশ্ব অবশ্যই অমিত নয়, কিন্তু মানুষের শক্তির পরিমাণ এত নগণ্য যে এই সঙ্কীর্ণ জগৎকেই তার অনন্ত লাগে; ঘটনার ঘুরন্ত চক্রের দিকে চেয়ে সে এতই দিশাহারা হয়ে পড়ে যে একই ঘটনা বহুবার ফিরে আসছে কিনা তা বোঝবার তার সামর্থ্য থাকেনা। কাজেই যে-কবির বক্তব্য ব্যক্তিকে ছেড়ে বিশ্বকে আশ্রয় করে, তার সাহিত্যে বৈচিত্র্যের পরিমাপ অপেক্ষাকৃত অধিক। এবং শ্রেষ্ঠ কাব্যের ব্যঞ্জনা যেহেতু সর্ব্বদাই বিষয়ের সঙ্গে দুচ্ছেদ্যসূত্রে আবদ্ধ থাকে, তাই এই জাতীয় বিশ্ববান্ধব মহাকবিদের রচনায় শিল্পপ্রকরণের কোনো গতানুগতিক আকার দেখা যায়না। যাঁরা মমত্ববোধকে কাব্যের যজ্ঞানলে আহুতি দিতে পেরেছেন, নিরর্থ প্রথাকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে করা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। মহত্তের এতাদৃশ নিয়মলঙ্ঘনই রসিকসমাজে আর্ষপ্রয়োগ-নামে পরিচিত; এবং প্রাচীন গ্রীস থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাচীন ভারত পর্য্যন্ত এই প্রয়োগ একদিন যেমন প্রশ্রয় পেয়েছিলো, আধুনিক পশ্চিম থেকে সুরু ক'রে আধুনিক পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আজও তার তেমনি সমাদর।

আমার মতে রবীন্দ্রনাথও এই আর্ষপ্রয়োগক্ষম কবি, এবং সেইজন্যেই তিনি আবাল্য তাঁর কাব্যকে মুক্তির বিজন পথে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছেন। রবীন্দ্রকাব্যে প্রসঙ্গ-পদ্ধতির যে-অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখা যায়, সেটা হয়তো খুব বড় কথা নয়, কারণ প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য কবিই তাঁদের প্রসঙ্গকে যে-পরিমাণে বিস্তৃত করেন, পদ্ধতিকেও বদলান সেই অনুপাতে। যা রবীন্দ্র-প্রতিভার অত্যাশ্চর্য্য লক্ষণ, সে হচ্ছে তাঁর প্রণালীর অদ্ভুত অস্থৈর্য্য, তাঁর অশেষ পরিবর্ত্তন ও অনবতুল বৃদ্ধি। অপর প্রথম শ্রেণীর কবিদের রচনায় একটা সুনির্দ্দিষ্ট ধারা দেখা যায়: একটা সীমাবদ্ধ সরণী বেয়ে তাঁরা উৎকর্ষে উপনীত হন, এবং একবার গন্তব্যে পৌঁছলে তাঁদের আর কোনো দ্বিধা, দ্বন্দ্ব বা চাঞ্চল্য থাকেনা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে এই কঠিন

সন্তোষ অবর্ত্তমান; তাঁর কাব্যের ক্ষিপ্রস্বভাব দেখে মনে হয় তিনি পরিপূর্ণতায় আস্থা রাখেননা। "মানসী"-র কৃতিত্ব অসামান্য, এবং শুধু সেই পুস্তকের জোরেই তিনি বিশ্বসাহিত্যে বরেণ্য হতে পারতেন। কিন্তু সে-প্রকরণ যখন "কল্পনা"-য় এসে চূড়ান্তে পৌঁছলো, তখন কবি হঠাৎ তাতে বীতরাগ হয়ে পড়লেন। তার পরের বই "ক্ষণিকা" যে-পরীক্ষার ফল, তাতে কোনো লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি কেন স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হন, তা বোঝা শক্ত। অবশ্য পিছনের পানে চেয়ে আজ মনে হয়, রবীন্দ্রসাহিত্যের রত্নাকরেও এই মধ্যমণিটির জোড়া মিলবেনা; কিন্তু যেদিন "ক্ষণিকা"-র প্রথম কবিতা লিখিত হয়েছিলো, সেদিনে এমন প্রত্যয়ের কোনো কারণ ছিলোনা, বরং বিপদের আশঙ্কা ছিলো সমূহ। ততদিন রবীন্দ্রনাথ কাব্যরচনার চিরাচরিত পথেই চলেছিলেন, এবং "কল্পনা" বন্ধ করার পরে যে-ঝঙ্কার পাঠকের কানে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, সে হচ্ছে সংস্কৃতির ধ্রুপদ। এতাদৃশ কবির পক্ষে কৃষ্ণকলির কাঁকণের আওয়াজকে ছন্দোবদ্ধ করার চেষ্টা শুধু দুঃসাহসিকতা। এই অগ্নিপরীক্ষায় কেবল তিনিই আত্মসমর্পণ করতে পারেন, যাঁর মনে অহমিকার পাপ নেই; যিনি নিজের ইষ্টের চেয়ে কাব্যের মঙ্গলকে অধিক কাম্য মনে করেন।

"ক্ষণিকা"-প্রণেতার মনোবিকলন এখানে অবান্তর। ক্ষণিকার উদ্ভব যে-চিত্তবৃত্তি থেকেই হয়ে থাক, ওই পুস্তক প্রকাশের পরে আর কোনো সন্দেহ রইলোনা যে কাব্যের সঙ্গে ভাষাশুদ্ধির কোনো জন্মগত যোগ নেই। কিন্তু ছন্দসম্বন্ধে এখনো সংশয় রয়ে গেলো। একথা ঠিক, রবীন্দ্রনাথের হাতে ছন্দ কখনো নিগড় হয়ে ওঠেনি, বেজেছে নূপুরের তালে। তাঁর কৈশোরিক কবিতার ছন্দবৈচিত্র্য যদিই বা কারুর কাছে অনবধানতা-প্রসূত ব'লে ঠেকে, মানসীর "নিষ্ফল ক্রন্দন"-এ যে কবি সজ্ঞানেই ছান্দসিকদের উপেক্ষা করেছিলেন, তা নিশ্চয়ই সর্ব্ববাদিসম্মত। অবশ্য বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি এই স্বচ্ছন্দ ছন্দকে আর ব্যবহার করেননি; তাহলেও ছন্দের গাণিতিক রূপ তাঁর কাছে কত তুচ্ছ, তার দৃষ্টান্ত হিসাবে "বর্ষশেষ"-এর মতো ঘনসম্বদ্ধ ধ্রুপদী কবিতার উপান্ত্য স্তবকটি উল্লিখিত হতে পারে। এই স্বাধীনতার সঙ্গে যথার্থ মুক্তচ্ছন্দের আকাশ-পাতাল তফাৎ আছে, তাতে সন্দেহ নেই, এবং একথা রবীন্দ্রনাথেরও জানা ছিলো। তাই দেখি "গীতাঞ্জলি"-তে ভাষার প্রকৃতিসম্বন্ধে গবেষণা শেষ ক'রে, "বলাকা"-য় তিনি ছন্দের স্বরূপসন্ধানে নামলেন। "বলাকা"-র ছন্দ একেবারে বন্ধনমুক্ত হলোনা। সেখানে তেমন হওয়াও হয়তো বিপজ্জনক ছিলো, কেননা, বলাকার বিচরণ মর্ত্তসীমার বাইরে, সেই নিরালম্ব লোকে যদি মাধ্যাকর্ষণের নির্দ্দেশও না-থাকে, তবে কবির জয়যাত্রা সহজেই মহাপ্রস্থানে পরিণত

হতে পারে। কিন্তু মিলের টান এবং পদক্ষেপের সমতা অটুট রেখেও, এ-ছন্দ এমন একটা ওজসের পরিচয় দিলে, যা দেখে আর সন্দেহ রইলোনা যে স্বর্গবিজয়ের দিনে বাঙালী কবিকে আর অস্ত্রের জন্য ভাবতে হবেনা। মানুষের যেগুলো উর্দ্ধগ আবেগ, তার অভিব্যক্তিতে এই ছন্দ যে-রকম যোগ্যতা দেখিয়েছে, অন্যত্র, এমন-কি ইংরেজি অমিত্রাক্ষর ছন্দেও, তার তুলনা নেই। গদ্য থেকে বহু দূরে হয়েও, এ-ছন্দ স্বকীয় গতিভঙ্গিতে ও ধ্বনিগৌরবে এতই সংযত যে আবেগের হিল্লোল এর তলায় কখনো হারিয়ে যায়না। তাই ভাবপ্রধান কাব্যরচনায় এর ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। দুর্ভাগ্যক্রমে জগৎ কেবল ভাবের উপাদানেই নির্ম্মিত হয়নি, তাতে বস্তুর দৌরাত্ম্যই সর্ব্বব্যাপী। এই রুক্ষ, অভব্য বস্তুতন্ত্রের সংসর্গে "বলাকা"-র গম্ভীর শালীনতা কেমন যেন ব্যর্থ হয়ে আসে ; মনে হয় বেয়াদবের সঙ্গে ঘর করার জন্যে দারকার এমন এক মুখরাকে যে অমর্য্যাদায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়বেনা, অপমানের সুদ সুদ্ধ ফিরিয়ে দিতে পারবে। "পলাতকা"-য় রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় ছন্দের সৃষ্টি করলেন। এর মধ্যে ছন্দসম্বন্ধে আর কোনো ভেদবুদ্ধি রইলোনা, যতিস্থাপনা প্রায় অর্থানুসারেই চলতে লাগলো। মিল এখনো পরিত্যক্ত হলোনা বটে, কিন্তু আভরণের বহর এতটা কমিয়ে আনা গেলো যে নিছক গদ্যের সহায়তা ছাড়া আর সংক্ষেপের সম্ভাবনা রইলোনা। সে-পর্ব্বেরও আর দেরি ছিলোনা। "পলাতকা" লেখার সময়ে সময়েই রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ গদ্যে কবিতা রচনা সুরু করেছিলেন। এগুলি "লিপিকা"-র প্রথমাংশের অন্তর্গত।

"লিপিকা" প্রকাশের পর দেখা গেলো হর্বর্ট্ স্পেন্সর্ একেবারে মিথ্যা বলেননি। ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাককে যদিই বা কেউ ময়ূরের সঙ্গে ভুল করে, তবু গদ্যবেশী কাব্যকে তার যথার্থ উপাধি দিতে সকলেই নারাজ। কবির নিজের মনেও হয়তো এই বইসম্বন্ধে দ্বিধা ছিলো, কারণ তাঁর গ্রন্থাবলীর তালিকায় এর নাম গদ্যেরই পর্য্যায়ভুক্ত। কিন্তু আকারে এবং জাতিবিচারে তাদের স্থান যেখানেই হোক, "পায়ে চলার পথ", "রাত্রি ও প্রভাত" ইত্যাদি লেখাগুলিকে যে-মুহূর্ত্তে চেঁচিয়ে পড়া যায়, অমনি তাদের কাব্যরূপ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের অপরাপর গদ্যরচনার সঙ্গে তাদের প্রভেদ কত গভীর। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই সব্যসাচী, এবং তাঁর গদ্য তাঁর পদ্যের কাছে যে-হিসাবে ঋণী, তাঁর পদ্যও তাঁর গদ্যের কাছে সেই অনুপাতেই কৃতজ্ঞ। তাহলেও অন্যত্র, যেমন "ক্ষুধিত পাষাণে", কাব্যের অধিকাংশ উপকরণ ধার নিয়েও তাঁর গদ্য কাব্য হয়ে ওঠেনি, কাব্যগন্ধী থেকে গেছে ; অথচ "লিপিকা" সজ্ঞানে সরলতার দিকে চ'লেও কাব্যাদর্শে পৌঁছেছে। এই অসাধ্যসাধন কি ক'রে সম্ভব

হলো, তা বলা আমার কর্ম্ম নয়। কিন্তু "লিপিকা"-র একটা সুবিদিত বৈশিষ্ট্যের বিচার করলে হয়তো এই রহস্যের খানিকটা উদ্‌ঘাটিত হবে। সকলেই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে রবীন্দ্রনাথের গদ্য তাঁর পদ্যের মতোই উপমারহুল, কিন্তু তাঁর গদ্য-উপমার সঙ্গে তাঁর পদ্য-উপমার কোনো মিল নেই। গদ্যে তিনি উপমা প্রয়োগ ক'রে থাকেন সাধারণত অর্থের খাতিরে, এখানে উপমার সাহায্যে বক্তব্য স্পষ্টতর হয়। কিন্তু কাব্যে উপমার উৎপত্তি ভাবসঙ্গতি অথবা ধ্বনিমাধুর্য্যের তাগিদে। এ-জাতীয় উপমায় অর্থ তো স্পষ্ট হয়না বটেই, এমন-কি অনেক সময়ে প্রাঞ্জলতার অভাব ঘটে। তাহলেও এতে কাব্যের ক্ষতি হয়না, কারণ কবিতাপাঠে যুক্তি হয়তো অনাবশ্যক, শুধু নিষ্ঠাই অপরিহার্য্য ; এবং কাব্যে উপমার একমাত্র কর্ত্তব্য হচ্ছে পাঠকের নিষ্ঠাকে ডাক দেওয়া। নিষ্ঠা যুক্তির আদেশে আসেনা, আসে প্রত্যক্ষতার আকর্ষণে ; তাই ব্রহ্মের নির্গুণতা-সম্বন্ধে শঙ্করভাষ্যই লিখিত হয়, পূজা পায় মনসা, শীতলা, তারকেশ্বরের মতো জাগ্রত দেবতা। এই সনাতন সত্যের নির্দ্দেশেই আধুনিক বিজ্ঞাপনবিশেষজ্ঞেরা বিজ্ঞাপন-চিত্রে বিজ্ঞাপিত বস্তুর স্থান ক্রমশই সংক্ষেপ ক'রে আনছেন। দেখা গেছে ছবিটি যদি দ্যোতনাপূর্ণ হয়, তবে পণ্যসামগ্রীর গুণকীর্ত্তনের প্রয়োজন থাকেনা, বরং তর্কের কোনো সুযোগ না-পেয়ে দর্শকের মন কল্পনা-প্রবণ হয়ে ওঠে, এবং এ-অবস্থায় সে যে-দ্রব্যের নাম শোনে, তাকে ভোলা আর সহজ হয়না। কবিও তাঁর উপমা ব্যবহার করেন এই রকমে। বলাকার পক্ষধ্বনি শব্দময়ী অপ্সররমণীর অনুষঙ্গে বেশি পরিস্ফুট হওয়া দূরে থাকুক, বরং একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু ওই কথাকটার জাদুতে পাঠক চিত্ররচনায় এমনি মনোনিবেশ করে, যে এ-অসঙ্গতির সম্বন্ধে সচেতন হওয়া তার সাধ্যে কুলায়না। তখন হয় সে সমস্ত কবিতাটিকে বিনাপ্রশ্নে গ্রহণ করে, নচেৎ সজোরে আবেশ কাটিয়ে, মাথা নেড়ে বলে : একেবারে প্রলাপ! "লিপিকা"-র উপমা এই জাতীর স্বপ্নময় উপমা, তার সার্থকতা অর্থগত নয়, চিত্রগত। সাধারণ কবিতায় ছন্দ যেমন ধ্বনিসাম্য বজায় রেখে পাঠককে মোহাবিষ্ট ক'রে তোলে, "লিপিকা"-য় তেমনি উপমা আলেখ্যের সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে তার তর্ক-প্রবৃত্তিকে ঘুম পাড়ায়। সেইজন্যেই "লিপিকা"-র বেশ যাই হোক, কাব্যই তার স্বরূপ।

আমার বিচারে "লিপিকা" অমূল্য পুস্তক। তার কারণ শুধু এ নয় যে এতদিন পর্য্যন্ত বাঙলা মুক্তচ্ছন্দের একমাত্র নিদর্শন কেবল এই গ্রন্থেই পাওয়া যেতো ; উপরন্তু প্রাকৃত বাঙলার প্রভূত শক্তি ও যথার্থ সৌন্দর্য্য প্রথম এইখানেই আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও "লিপিকা"-র

দুর্ব্বলতা নিতান্ত অল্প নয় ; এ-কবিতাগুলির প্রসঙ্গ-নির্ব্বাচনে কবি বেশ একটু শুচিবায়ুর পরিচয় দিয়েছিলেন। আমি জানি বিষয়ের উপরে প্রভুত্ব চলেনা ; সে আসে তার নিজের খেয়ালমতো : সময়ে সময়ে পৃথিবী পর্য্যটন ক'রেও তার সাক্ষাৎ মিলেনা, আবার মাঝে মাঝে তার উৎপাতে স্নানাহারের অবকাশ সুদ্ধ মুছে যায়। তাছাড়া রূপকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেতন হলেও, তাঁর কাব্য মুখ্যত প্রেরণাপ্রসূত। কিন্তু এ-সমস্ত মনে রেখেও "লিপিকা"-র সম্বন্ধে নালিশ চোকেনা, প্রশ্ন ওঠে, বিষয়ই যদি প্রথার গণ্ডি ছাড়াতে পারলেনা, তবে ছন্দকে জীবন্মুক্ত করার সার্থকতা কোথায় ? এবং একথা না-মেনে উপায় নেই যে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের দিক থেকে ছন্দোবদ্ধ "পলাতকা" যে-উদারতা দেখাতে পেরেছে, ছন্দোমুক্ত হ'য়েও "লিপিকা" তাতে বঞ্চিত। সুতরাং সিদ্ধান্ত করতে হয় এই পুস্তকের সাফল্য-সম্বন্ধে কবির নিজের মনেও দ্বিধা ছিলো। বাঙলা কবিতার ছন্দোমুক্তি এতদূর পর্য্যন্ত সইবে কিনা, তা তাঁর জানা ছিলোনা ব'লেই, তিনি "লিপিকা"-র কবিতাগুলিকে গদ্যাকারে ছেপেছেন ; সেইজন্যে বেছে বেছে এমন প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, যা সকল রকমে নির্গুণ হয়েও, কেবল কৌলিন্যের জোরেই রসোত্তীর্ণ হতে পারে। "লিপিকা"-র পরবর্ত্তী পুঁথি-কখানিতে এ-সন্দেহ আরো বদ্ধমূল হয়। "শিশু ভোলানাথ", "প্রবাহিণী", "পূরবী", "মহুয়া" প্রভৃতিতে দেখি যে রসের দিক দিয়ে রবীন্দ্র-প্রতিভা যদিও শুধু এগিয়েই চলেছে, তবু প্রকরণ ও পরীক্ষার প্রতি কবির যেন আর দৃকপাত নেই। তার মানে এ নয় যে এই বইগুলির কাব্যসম্ভার বা কলাকৌশল শিথিল, তার মানে শুধু এই যে এগুলির রচনারীতি নবাবিষ্কৃত নয়, পুরাতন রীতিরই পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যে-পথেই চলুন তাঁর অব্যর্থ প্রয়াণ প্রতিবারই অমৃতলোকে এসে থামে। উপরোক্ত পুস্তকগুলিতেও সে-নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে এই আভিজাতিক নন্দনে যাদের সাক্ষাৎ মিলে, তারা প্রায় সকলেই উর্ব্বশীর গোত্রসম্ভূত, তাদের মুখে অনন্তযৌবনের অপার সৌন্দর্য্য নিশ্চয়ই বিদ্যমান আছে, কিন্তু অজানার অভ্যাঘাত তাদের চোখে নেই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতো নিরুদ্দেশযাত্রীর পক্ষে এই অচলায়তন উৎকর্ষে স্তিমিত হয়ে বসে থাকা বেশিদিন সম্ভব হলোনা, তিনি আবার স্বর্গ হতে বিদায় নিলেন। কিন্তু এবারে বোধহয় আর অমরাবতীর চক্ষু নিরশ্রু থাকেনি, নিঃসঙ্গ হয়নি কবির প্রত্যাবর্ত্তন ; স্বয়ং কবিতালক্ষ্মী তাঁর আকর্ষণে এই ধূলির ধরণীতে নেমে এসেছেন। অবশ্য দেবীর কণ্ঠে সেই অভ্যস্ত মন্দারমালা নেই, তাঁর মৃন্ময় দেহ নিঃসঙ্কোচে অদিব্য ছায়াপাত ক'রে চলেছে ; কিন্তু আমাদের মতো মোহান্ধেরাও তাঁর দিকে চেয়েই

বুঝতে পারি যে বহিরাঙ্গে সনাতন আড়ম্বর না-থাকলেও, তাঁর অন্তরে আছে কাব্যের তন্মাত্র। আমি এমন কথা বলছিনা যে "পরিশেষ" ও "পুনশ্চ" রবীন্দ্রকাব্যের চূড়ান্ত। শুনেছি কবি পার্ব্বত্য প্রদেশ পছন্দ করেননা; তাঁর ভালো লাগে সমভূমির সার্ব্বত্রিক উর্ব্বরতা। এ-খবর যদি তাঁর রুচিসম্বন্ধে মিথ্যাও হয়, তবু তাঁর সাহিত্যের সম্পর্কে উপমাটি খুব প্রযোজ্য, কারণ সেখানে যে-উচ্চাবচতা দেখা যায়, সে হচ্ছে অধিত্যকার বন্ধুরতা, শিখর-গহ্বরের উত্থান-পতন তাতে নেই। কিন্তু এ-সমস্ত স্বীকার ক'রেও, এমন মনে হওয়া অন্যায় নয় যে এই গ্রন্থ-দুখানিতে রবীন্দ্রনাথ ভাষা, ধ্বনি ও প্রসঙ্গের দিক দিয়ে যেখানে পৌঁছেছেন, তার পরে আর এগুনো অসম্ভব। সাত্ত্বিক কবিমাত্রেই গদ্য-পদ্যের বিরোধ দূর করবার চেষ্টা করে এসেছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হননি। এত দিন পরে রবীন্দ্রনাথের অধ্যবসায়ে হয়তো সে-বিবাদের নিষ্পত্তি হলো। যে-বিচিত্রতার প্রয়োজনে মহাকাব্য গীতিকবিতার কাছে হার মেনেছিলো, তার সিদ্ধি হয়তো এইখানে। কারণ এই প্রকাশভঙ্গী জীবনের মতোই পরিবর্ত্তনশীল, এর বিশ্বব্যাপ্তি বায়ুর অনুকারী, ক্ষুধায় এ সর্ব্বভুক অগ্নির তুল্য। কিন্তু সেইজন্যেই তার আসঙ্গ নিরাপদ নয় ; চিত্রল পতঙ্গেরা তার দাহময় পরীক্ষায় পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, যিনি অম্লান থাকেন, তিনি স্বয়ং বসুধার দুহিতা সীতা। স্বরাজ্য মজ্জাগত না-হয়ে গেলে নৈরাজ্য কেবল অমঙ্গলের সৃষ্টি করে। তাই ভয় পাই, তপস্যাকঠিন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যেটা মোক্ষ, আমাদের হাতে তা সর্ব্বনাশে পরিণত হবেনা তো ?

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

কার্‌স্‌টা

(কাইজারলিঙ্‌ হইতে)

অল্প অল্প বরফ গলা আরম্ভ হয়েছে। গীর্জ্জার পথ মভেম্বরের নরম ভিজে তুষারে ঢাকা, একটি 'শ্লে'-গাড়ি হোঁচট খেতে খেতে কোনোরকমে তাল সামলিয়ে এই পথে ছুটেছে। তাতে যাত্রী চারজন, ম্যারি, ক্যাথি, ইল্‌সে ও কার্‌স্‌টা—যার মা এ্যান্‌লিসে একটি কুঁড়েঘরে থাকে। চারজনই মেয়ে, গীর্জ্জা থেকে বিয়ে ক'রে তারা ফিরছে, তাদের স্বামীরা 'রংরুট'—সবে সৈন্যদলে তারা নাম লিখিয়েছে, কালই তাদের ব্যারাকে চ'লে যাবার কথা। চারটি বড় নীল রুমাল চারজনের মাথার উপর চূড়ো ক'রে বাঁধা—গাড়ি চলার তালে তালে এই চারটি চূড়ো একবার উঠছে একবার নামছে। গাড়ি চালাচ্ছে র‍্যাবেন জেজ। লোকটি বেজায় টেনে এসেছে আর নির্দ্দয়ভাবে ঘোড়াদের চাবুক মারছে। এদের স্বামীরাও ঠিক পিছন পিছন আস্‌ছে, একটি শ্লেতে দুজন দুজন ক'রে। তাদের ভাঙা গলার চীৎকার ও গান শুনলে বোঝা যায় তাদেরও অবস্থা র‍্যাবেনেরই মতন। মেয়ে চারটি কিন্তু শান্ত হ'য়ে চুপ ক'রে ব'সে আছে, কেবল গাড়ির দোলার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নীল রুমালে-বাঁধা মাথাগুলো দোল খাচ্ছে। এদের মধ্যে সব চেয়ে ছোট কার্‌স্‌টা। তার টুকটুকে গোলগাল মুখ, তার দুটি গোলগোল হালকা-নীল চোখ, আর তার গোল নাকের ডগা দেখলে তাকে একেবারে শিশু ব'লে মনে হয়; কিন্তু যে-সব চাষার ঘরের মেয়ে অনেক দুঃখের ভিতর দিয়ে বড় হয়েছে, সংসারের অনেক ঝঞ্ঝাট যাদের পোয়াতে হয়, ঠিক তাদের মতন তার ঠোঁটের কোণ টোল-খাওয়া। কার্‌স্‌টা উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল চারদিক কুয়াসায় ঢাকা, এই ধূসর পটভূমিকার উপর জুনিপারের ঝোপ ও কাকগুলিকে অদ্ভুত রকমের কালো দেখাচ্ছে, মাঝে মাঝে এক একটি পাতা-ঝরা লালচে অল্‌ডার গাছ ভূতের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। সমস্ত পথ এই একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন বর্ণহীন দৃশ্য কার্‌স্‌টার চোখের সামনে ধীরে ধীরে দুলছে, যেন সে ইষ্টারের মেলায় দোলনায় ব'সে আছে আর খুব আস্তে আস্তে তাকে কেউ দোল দিচ্ছে।

পথে প্রত্যেক ভাঁটিখানায় তারা থামতে থামতে এসেছে। প্রতিবারই, কার্‌স্‌টার স্বামী টোম্‌—দেখ্‌তে সে প্রকাণ্ড লম্বা—ঝুঁকে পড়ে তার কার্‌স্‌টার খবর নিয়েছে, আর "কি? একেবারে জমে গেছ নাকি?" এই ব'লে ব্র্যাণ্ডির বোতল এগিয়ে দিয়েছে। কার্‌স্‌টা সত্যি প্রায় জমেই গিয়েছিল; কোনোরকমে একটু হেসে সে বোতলটা হাতে নিয়ে খানিকটা খেয়ে ফেল্‌ল। বাস্তবিক ব্র্যাণ্ডি খেলে শরীরটা বেশ তাজা হয়ে ওঠে,

আর কি আরামই না হয়, আর সব চাইতে মজা এই যে মনের সব ভাবনা চিন্তা একেবারে চ'লে যায়। কার্‌স্‌টার চোখের সামনে এই কুয়াসায় ঢাকা অস্পষ্ট পৃথিবী আরো অস্পষ্ট হ'য়ে উঠল, এমন কি তাদের গাড়ির কোচম্যান্ জেজের মস্ত পিঠটা যেন ক্রমশই দূরে চ'লে যেতে লাগল। কিন্তু সকাল থেকে আরম্ভ ক'রে সেদিনের প্রত্যেকটি ঘটনা বারবার তার হুবহু মনে হ'তে লাগল, একটির পর একটি, যেমনটি ঘটেছিল ঠিক তেমনি। বিয়ে! সকাল থেকে তারই আয়োজন। সব প্রথম ক'নের সাজ, মখমলের মতন কোমল, দুধের মত শাদা, সেমিজ দিয়ে সাজের আরম্ভ; উঃ, কি পাৎলা আর কি ঠাণ্ডা! তার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত শিউরে উঠল। আর তার মাথার গয়নাগুলো কি জোরেই না চেপে দেওয়া হয়েছিল, নিশ্চয় দাগ প'ড়ে গিয়েছে। তারপর একেবারে গীর্জ্জায়; জায়গাটি কি ভীষণ ঠাণ্ডা আর কি অটল তার গাম্ভীর্য্য! পাথরের মেজের উপর নতুন জুতো জোড়া বিশ্রী রকমের খট্‌খট্ শব্দ করছিল, কার্‌স্‌টার ভয় হচ্ছিল সে পা পিছলে উলটে না পড়ে। পাদ্‌রির মুখটি একেবারে গোল আর টক্‌টকে লাল; এমন কপ্‌ কপ্‌ ক'রে ভদ্রলোক কথা বলেন মনে হয় যেন খুব মুখরোচক একটা কিছু খাচ্ছেন। কিন্তু যাই বলো, তাঁর উপদেশ ভারি সুন্দর! তাদের স্বামীরা তাদের ছেড়ে চলে যাবে, সে সময় তাদের সতীত্ব যেন অবিচলিত থাকে—এই সব অনেক কথা তিনি বল্‌লেন, আর বল্‌লেন ভগবানের কথা ও মানুষের প্রতি তাঁর কি বাণী তারই কথা। এই সব কথা কার্‌স্‌টার মনকে এত স্পর্শ করেছিল সে না কেঁদে পারেনি। যারা যুদ্ধে যাবে তাদের বউরা বিয়ের সময় অমন কেঁদেই থাকে। আর এরকম কাঁদা নিশ্চয়ই খুব ভালো, একেবারে এমন কাঁদা যে সমস্ত মুখ লাল হয়ে ওঠে ও চোখের জলে ভিজে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে এমন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা যে সেমিজের বোতাম প্রায় ছেঁড়া ছেঁড়া হয়। কার্‌স্‌টা যে সব চাইতে বেশি কেঁদেছিল পরে যখন এ বিষয় কথা হচ্ছিল তখন খুব জোর ক'রেই সে তা বল্‌তে পারত। বিয়ের পালা সাঙ্গ হবার পর সবাই মিলে গেল গীর্জ্জার সামনের ভাঁটিখানায়, এই একটু শরীরটা তাজা ক'রে নেবার জন্যে। সেখানে পুরুষগুলো আবার একটি ঝগড়া বাধিয়ে দিল। ঠিক বিয়েতে যেমন হওয়া উচিত প্রত্যেকটি ব্যাপারই তেমনি হয়েছিল, কোনো ত্রুটি হয়নি। বিয়ে! বিয়ে! বিয়ে! জেজের ছোট্ট ঘোড়াগুলোর গলার ঘণ্টা টুন্‌ টুন্‌ ক'রে কেবল এই এক কথাই বলছে। কার্‌স্‌টার স্বপ্ন আবার আরম্ভ হল—সেই সেমিজ পরা থেকে। আর তিনটি মেয়ে চুপ চাপ ব'সে, তাদের স্থির দৃষ্টি কুয়াসার উপর নিবদ্ধ, তাদের চোখের ভাব দেখলে মনে হয় না তারা কিছু দেখতে পাচ্ছে বা দেখবার চেষ্টা করছে।

কেবল মাঝে মাঝে এক একটি খরগোস মাঠ থেকে এসে এক দৌড়ে ঘর রাস্তা পার হচ্ছে, চারজনই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠছে, 'ছ্যাখো, ছ্যাখো খরগোস !' তারপর কোনোরকমে একটু হেসে আবার সব চুপ চাপ !

গ্রামের সরাইখানার সামনে তাদের গাড়ি থামল ; সেখানে বেশ একটা ভিঁড় জ'মে গিয়েছিল, বিয়ের উৎসবে নিমন্ত্রিত অতিথিরা ফিট্ফাট পোষাক প'রে সেখানে জড় হয়েছে। মেয়েদের ও ছোট ছেলেদের দল জানলা দিয়ে ঝুঁকে দেখছিল, সবাই ক'নেদের দেখতে চায়। কার্‌স্টার হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল সেও ক'নে, তার মন উৎসবের আনন্দে ভ'রে উঠল। বিয়ের দিন মানুষের জীবনে সব চাইতে সুখের দিন, বিয়ের ক'নে হওয়া কি কম গৌরবের কথা !

কার্‌স্টা দরজার কাছে তার স্বামীর জন্যে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল, তাদের দুজনের একসঙ্গে ভিতরে যাবার কথা। সে ভারি গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপারের বুড়ীটির সঙ্গে কথা বলছিল। গ্রামের মাতব্বর পর্য্যন্ত তাকে ডেকে কথা বললেন, আর ছোট মেয়ের দল হাঁ ক'রে তাকিয়ে তার সাজসজ্জা দেখতে লাগল। কার্‌স্টার মা এ্যান্‌লিসে ছিল অতি সাধারণ লোক, ছোট্ট একটি কুঁড়েঘরে তার বাস। সবার কাছে এরকম সম্মান কার্‌স্টার ভাগ্যে কখনও জোটেনি। সে ছিল নিতান্ত ক্ষুদ্র ও গরীব ও নগণ্য, তার সম্বল ছিল একটিমাত্র ছাগল, কিন্তু বিয়ে ক'রে সেও আজ একটা কেউকেটা হয়ে উঠেছে। গর্ব্বে তার ছোট্ট শিশুর মতো মুখখানি আপেলের মতন লাল টক্‌টকে হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে পুরুষের দলও এসে পড়ল, তাদের গান আর চীৎকার তখনো সমানে চলেছে। টোম্ গিয়ে হটাৎ কার্‌স্টাকে জড়িয়ে একেবারে তুলে ধ'রে বল্‌ল, "ছোট্ট খাট্টো মানুষটি, কিন্তু ওজনে যেন এক বস্তা ময়দা আর কি !" সবাই হেসে উঠল। আনন্দে কার্‌স্টার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আর টোমের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভ'রে গেল।

সরাইখানার সব চাইতে বড় ঘরটিতে খাওয়ার আয়োজন হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে সেখানে সকলে জড় হয়ে কাঠের টেবিলগুলোর পাশে যে-যার জায়গা ক'রে বসল। কারো মুখে কথাটি নাই, সবাই গম্ভীরভাবে খেয়ে যাচ্ছে। প্রথমে এল সুরুয়া, তারপর শূয়রের মাংস, তারপর ভেড়ার মাংস, তারপর আবার শূয়রের মাংস। একেবারে সদ্য তৈরি খাবার, এত গরম যে তখনও ধোঁওয়া বেরোচ্ছে ; ক্রমে এই ধোঁওয়ায় ঘর গেল ভ'রে। কার্‌স্টা একমনে খেয়ে যাচ্ছিল, অবশেষে তার পেট এত ভ'রে গেল যে কোনোরকমে জামার নীচের বোতামগুলো আলগা ক'রে সে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তার মনে হচ্ছিল, এই তো চাই, বিয়েতো একেই

বলে—খাসা ! টোমের জামার হাতায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সে ভাবছিল, এখন থেকে টোম্ তার নিজের লোক হোলো, একেবারে সম্পত্তির সামিল, বাস্তবিক স্বামী থাকা কি সুখের ! টোম্‌ও বারবার তার স্ত্রীকে বলছিল, "খেয়ে নাও গো, ভালো ক'রে খেয়ে নাও।"

বাইরে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ঘরে মোমবাতির ব্যবস্থা হোলো, খালি মদের বোতলগুলো হোলো বাতিদান। ব্যাণ্ডে পোলকা নাচের সুর বেজে উঠল। কার্‌স্টা খুসী হয়ে ভাবল, কি মজা ! এবার নাচ। একটুক্ষণের জন্যে সে একবার বাইরে গেল—চারদিক অন্ধকার, সমস্ত পৃথিবী বরফে ঢাকা, আর তারই উপর জলো হাওয়া হুহু ক'রে বইছে ; ধূসর মেঘের ভার পৃথিবীর উপর নেমে পড়েছে। কার্‌স্টা ভাবল, কাল নিশ্চয়ই বরফ পড়বে।

গ্রামের স্তব্ধ রাস্তার দুই পাশে ছোট্ট কুঁড়েঘরগুলি ভিঁড় ক'রে রয়েছে—মাঝখানে এক একটা জানলায় মিটমিট ক'রে একটা আলো জ্বলছে, কোথাও বা ছোট ছেলে কাঁদছে আর মা গান গেয়ে তাকে ঘুম পাড়াচ্ছে—সেই মামুলি একঘেয়ে সুরে। রাস্তার এক প্রান্তে ঐ যে বিশ্রী কালো ছোট্ট কি একটা দেখা যাচ্ছে ঐ হোলো এ্যান্‌লিসের কুঁড়ে। কাল সব শেষ হয়ে যাবে—যেন কোনোদিন কিছু হয়নি। কার্‌স্টা আবার তার মার কাছে গিয়ে থাক্‌বে আর—দুই হাতে সে মুখ ঢাকল। আজ কেন তার এত কান্না পাচ্ছে ? কাঁদার সময় সে কাল যথেষ্টই পাবে।

কার্‌স্টা ভিতরে গিয়ে নাচ সুরু কর্‌ল। একজন বলিষ্ঠ পুরুষ যদি দুই হাত দিয়ে প্রায় আঁকড়ে ধ'রে ক্রমাগত ঘুরপাক খাওয়ায় তাতে কি মজা ! তার হাতের স্পর্শে সমস্ত শরীরটা তাজা হয়ে ওঠে। ভাবনা চিন্তা সব যে কোথায় উধাও হয়, শুধু থাকে রক্তের উদ্দাম প্রবাহ আর বুকের মধ্যে প্রচণ্ড তোলপাড় ! কার্‌স্টার চোখে সব অস্পষ্ট হয়ে এল, যেন সে স্বপ্ন দেখ্‌ছে। একপাল লোক ক্রমাগত বন্‌বন্ ক'রে ঘুরছে, চুরুটের ঘন ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে তাদের কি অদ্ভুতই না দেখাচ্ছে, আর পুরুষের দল মাটিতে পা ঠুকে ঠুকে তাল দিচ্ছে,—শব্দ শুনে মনে হয় ঢেঁকিতে যেন ধান কোটা হচ্ছে। কার্‌স্টা ভাবল, "একটু ফূর্ত্তি ক'রে নেওয়া যাক। আর তো কখনো এমন দিন আসবে না।" ক্রমে পুরুষদের মধ্যে একটা ঝগড়া বেধে উঠল, তারপর ঘুঁষোঘুঁষি। অন্য মেয়েদের সঙ্গে কার্‌স্টাও গিয়ে তাতে যোগ দিল। আর যাকে সামনে পেল তারই চুলের মুঠি ধ'রে টেনে আর চেঁচিয়ে সে একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড করল—তার স্বামীর পক্ষ হয়ে সে লড়ছে, কি তার গর্ব্ব ! ক্রমে সব শেষ হল। গ্রামের যুবক যুবতীর দল গান গাইতে গাইতে নব-

দম্পতীকে রাস্তার প্রান্তে এ্যান্‌লিসের কুঁড়েঘর পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এল, সেখানে আজ তাদের বাসর-শয়ন।

কার্‌স্‌টা ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালতে না জ্বালতে টোম্ গিয়ে সটান বিছানায় গড়িয়ে পড়ল—সারাদিন মদ খেয়ে তার এমনি অবস্থা হয়েছিল যে যেই শোওয়া অমনি ঘুমে একেবারে বেঁহুস। কার্‌স্‌টা গিয়ে আস্তে আস্তে তার জুতো খুলে বালিশটা ঠিক ক'রে তার মাথায় গুঁজে দিয়ে তার পাশে শুল। ক্লান্তিতে তার গা হাত পা টন্‌টন্ করছিল, চোখ বুজে মনে হোলো খাট্‌টা যেন নৌকার মত দুলছে। কিন্তু তবু তার ঘুম এল না, সে কেবল স্বপ্ন দেখে গীর্জ্জায় তাদের বিয়ে হচ্ছে, কিম্বা সরাইখানায় বোঁ বোঁ ক'রে সবাই মিলে ঘুরপাক খাচ্ছে, তার খোপার ফিতেগুলো চাবুকের মত সোঁ সোঁ ক'রে বাতাসে উড়ছে—আর বারবার সে চমকে জেগে ওঠে। খানিকক্ষণ সে চোখ মেলে চুপ ক'রে থাকল—চারদিক অন্ধকার, নিঝুম। কি যেন একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার তার জীবনে আসছে—কিন্তু কি? ওঃ তাইতো, কাল তার স্বামী তাকে ছেড়ে যাবে, আর তারপর আবার সেই একঘেয়ে জীবন সুরু হবে; বিয়ের পালা ফুরোলো—এখন বহুদিন তার জীবনে আমোদ প্রমোদ একেবারে থাকবে না।

ক্রমে ভোর হোলো, জানালার শার্সিগুলো নীল হয়ে উঠল। কার্‌স্‌টা উঠে বসে দেখল টোম্ নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, তার সুন্দর কোঁকড়ান চুলগুলো তার কপালের উপর এলোমেলো হয়ে পড়েছে, তার মুখ তখনো বেজায় লাল। কার্‌স্‌টা আস্তে আস্তে তার বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে ঠিক ছোট্ট ছেলেটির মতো তাকে আদর করতে লাগল। তার স্বামী—একেবারে তার নিজের ধন, ঠিক যেমন তার সেমিজ, তার সেলাই, তার ছাগল—না, ছাগলটার থেকেও বেশি নিজের, কেন না ছাগলটা তো শুধু তার একলার নয়, তার মা'রও। এই তো হওয়া উচিত। সব মেয়ের যা নিত্যকার কামনা—স্বামী—আজ সে তা পেয়েছে—আর স্বামীর মতন স্বামী—কি বলিষ্ঠ বিপুল তার চেহারা! কিন্তু লাভ কি হোলো? পেতে না পেতেই তো তাকে ছেড়ে দিতে হবে। কি দারুণ দুঃখ! ভাবতেও পারা যায় না। কার্‌স্‌টা আর বসে থাকতে পারল না, তাড়াতাড়ি উঠে দুধের ভাঁড় নিয়ে ছাগলটাকে দোহাতে চ'লে গেল।

বাইরে তখন ঝোড়ো হাওয়া বইছে আর তুষার পড়ছে। ভোরের নীল আলো আকাশ ছেয়ে পৃথিবীর উপর লুটিয়ে পড়েছে। বহুদূরে দিগন্তে বনের কালো রেখার উপর আলোর আভা দেখা যাচ্ছে—একেবারে শাদা তার রঙ্। কার্‌স্‌টা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে, তার এক হাতে দুধের ভাঁড়, আর এক হাত দিয়ে সে চোখ আড়াল ক'রে আছে যাতে আলো না লাগে। ক্রমে চারদিক পরিষ্কার হোলো। গ্রামের রাস্তার দুইপাশে ছোট ছোট মেটে রঙের বাড়িগুলোর সামনে আরো অনেক মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। সবার হাতে দুধের ভাঁড়, সবাই কার্‌স্‌টার মত বিষণ্ণ মুখে ভোরের আলোর দিকে তাকিয়ে—এই যে দিনটি এল, এদিনে যেন কি একটা ঘটবে, তারই প্রতীক্ষায় সকলে দাঁড়িয়ে।

কার্‌স্‌টা হঠাৎ শিউড়ে উঠে এক দৌড়ে গিয়ে গোলাবাড়িতে ঢুকল; বাড়ি অবিশ্যি নামে, আসলে একটা নীচু ছাদওয়ালা গুদোম ঘর বিশেষ: ছাগল, শুয়োর ও মুরগীদের এই হোলো আবাস। বাড়ির ভিতরটা গুমট হয়েছিল। কার্‌স্‌টার পায়ের শব্দ পেয়ে মুরগীগুলো ডানা ঝট্‌পট্ ক'রে উঠল। শূয়রটা আরামে ঘুমোতে ঘুমোতে আপন মনে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করছিল। কার্‌স্‌টা ছাগলটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে দোহাতে আরম্ভ ক'রে দিল—তার আঙ্গুল বেয়ে দুধ গড়িয়ে পড়ল, টাট্‌কা দুধের স্পর্শ তার বেশ লাগছিল। তার চোখে যেন ঘুম জড়িয়ে এল। ছাগলটার পিঠের উপর মাথা রেখে কার্‌স্‌টা কাঁদতে আরম্ভ করল—বিয়ের সময় যে রকম ভাবে সকলকে জানিয়ে সশব্দে কেঁদেছিল কিম্বা আজ তার স্বামী চ'লে যাবার সময় সহরের মধ্যে সবার সামনে যে ভাবে কাঁদবে ঠিক সে রকম কান্না নয়—সে একটি ছোট্ট মেয়ের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। চোখের জলে তার মুখ ভেসে গেল, দেখলে মনে হয় যেন সে মুখে গরম জলের ছিটে দিয়েছে; আর তার নিজের জন্য দুঃখে মন উঠল ভ'রে—খুব গভীর দুঃখে। এই ভাবে কাঁদতে কাঁদতে সে ঘুমিয়ে পড়ল। ছাগলটা যেমনি ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল, শুধু মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে এই ঘুমন্ত মেয়েটিকে ঠিক মার মতো সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখছিল।

হঠাৎ তার মার গলার আওয়াজ পেয়ে কার্‌স্‌টার ঘুম ভেঙে গেল, সে শুনল তার মা বলছেন, "ওমা, মেয়ে যে দেখি দুধ দোহাতে দোহাতে একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তোর কি দরকার ছিল আজ দুধ দোহাবার বল্‌তো?"

কার্‌স্‌টা ঘুমের ঘোরেই জবাব দিল, "কাউকে তো দোহাতে হবেই।" এ্যান্‌লিসে ব'লে উঠল, "তা তো বটেই! তাই কিনা দুধ দোহাতে গিয়ে ঘুমোতে হবে।"

এই প্রবীনা নারীটির কথাবার্ত্তা বরাবরই এই রকম কর্কশ, কিন্তু তবু কার্‌স্‌টার মনে হোলো আজ যেন তার মার গলার স্বরে একটু চাপা হাসির আর একটু সম্ভ্রমের ভাব রয়েছে। তাতো হতেই হবে, একজন

কুমারীর সঙ্গে যে ভাবে কথা বলা চলে একজন বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে তো আর সে ভাবে কথা বলা চলে না। কার্স্টা যে এখন বিবাহিতাদের দলে।

"যা, গিয়ে আগুন টাগুন জ্বালা, তোর স্বামী এতক্ষণে নিশ্চয়ই উঠেছে।" কার্স্টা লাফিয়ে উঠল। তাই তো! আজকের দিন আর অন্য দিন তো সমান নয়। আজকে যে সে তার সেরা পোষাক প'রে গাড়ি হাঁকিয়ে সহরে যাবে, সবার চোখে সে আজ পড়বে আর তার দুঃখে সবাই দুঃখ পাবে। এ সব ভেবেও আনন্দ।

প্রকাণ্ড এক শ্লে-গাড়িতে ক'রে গ্রামের মাতব্বর রংরুটদের সহরে নিয়ে যাবে এই কথা হয়েছে। তাদের বাপ মা ও স্ত্রীরা পিছন পিছন ষ্টেষণ পর্য্যন্ত তাদের পৌঁছতে যাবে।

খেতে বসে টোমের মুখে মোকদ্দমা ছাড়া আর কোনো কথা নাই—কি করতে হবে না হবে স্ত্রীকে সে ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। ব্যাপারটা এই। গ্রামের বনের কাছে ডাঙুরের যে ছোট্ট জমী ছিল পিটার রুজ তা দখল ক'রে বসেছিল, কিন্তু আসলে এই জমীটি পাবার কথা কার্স্টার; কেননা রক্তের সম্পর্ক ধরলে সে ছিল এই সম্পত্তির পূর্ব্বেকার মালিকের সব চাইতে নিকট আত্মীয়, আর পিটারের দাবী তার সংমেয়ের স্বামী হিসাবে। কার্স্টাকে বিয়ে ক'রে টোমেরও এই জমীর উপর দাবি হয়েছিল—সে চায় তার অনুপস্থিতিতেও কার্স্টা নিজের অধিকার সাব্যস্ত করে। "জ্যাকসন ব'লে যে উকীল আছে তার কাছে যাও। য়িহুদীদের মাথা খুব পরিষ্কার হয়, আর তার ফিও বেশি না। দেখো, ওরা যেন কিছুতেই তোমাকে না ঠকায়।" নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে কার্স্টা খুব সজাগ। খুব গম্ভীরভাবে সে বলল, "নিশ্চয়। আমি সব ঠিক ক'রে দেব—আমি তো আর বোকা নই।" "বোকা হলে কি আর আমি তোমায় বিয়ে কর্তাম?" এই ব'লে টোম এই বিষয়ে আলাপ শেষ করল।

বেজায় চ্যাঁচামেচি ও তামাসা করতে করতে রংরুটের দল গাড়িতে উঠল। মেয়েরা ও ছোট ছেলেরা চারদিকে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে, সবার চোখেই জল। চারটি কনে আবার একটি 'শ্লে'-তে চড়ে চলেছে। বরফ আরো বেশি পড়ছে। কনেদের মাথার চূড়োগুলি ঠিক কালকের মতো উঠছে আর নামছে, কিন্তু বরফ পড়ে তারা একেবারে শাদা হয়ে গেছে।

গাড়ি বনের কাছে পৌঁছাতে ম্যারি বল্‌ল, "এতে লাভটা কি হোলো? কাল থেকে তো আবার যেমন তেমনি!" আর তিনজন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌ল, "উপায় কি?" যখন তারা সমুদ্রের ধারের রাস্তার উপর গিয়ে পড়ল, ইল্‌সে বল্‌ল, "যা অবস্থা দেখছি মনে হয় ক্ষেতের ফসল

একেবারে যাবে।" তাতে আর সবাই ব'লে উঠল, "এমনিতেই যা দিন যাচ্ছে, তার উপর ফসল নষ্ট হলে তো বাঁচাই দায় হবে।" এর পর সহরে পৌঁছানো পর্য্যন্ত আর কেউ কথা বলেনি।

সহরে পৌঁছে এত জিনিষ দেখবার ছিল যে একটু সুস্থির হয়ে দুঃখ করবার অবসরও তাদের হোলো না। তারপরে টাউন-হলের সামনে পুরুষদের জন্য অনেকক্ষণ তাদের দাঁড়াতে হয়েছিল, সেখান থেকে সবাই মিলে সরাইখানায় গিয়ে খাওয়া, তারপর আবার মদ ও কেক খাবার পালা, আর সব শেষে ষ্টেশনে গিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে কাঁদতে স্বামীদের ট্রেণে তুলে দেওয়া, এই সবের মধ্যে দিয়ে দেখতে দেখতে সময় কেটে গেল।

যাবার আগে টোম্ কার্স্টার পিঠ চাপড়ে বল্‌ল, "ভয় কি? এটুকু জেনো আমরা কেউ মরছি না। খাবারের বড় অভাব—মাঝে মাঝে টাকা পাঠিয়ো কিন্তু।" "নিশ্চয়।" "আর মোকদ্দমাটার কথা ভুলো না—শীগ্‌গিরই উকিলের সঙ্গে দেখা কোরো!" "নিশ্চয়।" "বেশ ভেবে চিন্তে বুদ্ধি ক'রে সব কাজ কোরো। ফিরে এসে যেন বোকা না বনি।" "নিশ্চয়।"

ট্রেণ ছেড়ে দিল। কার্স্টা ও তার সঙ্গিনীরা স্থির হয়ে প্ল্যাটফর্ম্-এ দাঁড়িয়ে, তাদের পা আর চলে না, তাদের মুখে শুধু এক কথা, "ভগবান্—একি করলে।"

সব প্রথম কার্স্টা চুপ করল, তাকে যে উকিলের বাড়ি যেতে হবে।

উকিলের বাড়ি কার্স্টাকে খানিকক্ষণ বসতে হয়েছিল, বেশ সুন্দর আর গরম একটি ঘরে। উকিল লোকটি দেখতে ছোট্ট খাট্টো, কথা মিষ্টি। কার্স্টার কাছে সব শুনে তিনি আশ্বাস দিলেন, কোনো ভয় নাই, মোকদ্দমায় জিতের সম্ভাবনা খুব বেশি। তার উপর আবার একটু রসিকতা করতেও তিনি ছাড়লেন না। কার্স্টার চিবুক ধ'রে তিনি বললেন, "সেপাইর গিন্নি, আর এই রূপসী, তার কপালে কিনা এতদিনের বিরহ। হায়রে!" কার্স্টা ভাব্‌ল, যা হোক্ মোকদ্দমার গতিক ভালো।

যখন শ্লে-গাড়ির দল লম্বা সারবন্দী হয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হোলো, তখন বেলা পড় পড়, অন্ধকার হয়ে এসেছে, মেঘগুলোকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন আগুণের ডোরা, আস্তে আস্তে সমুদ্রের মধ্যে সূর্য্য ডুবছে—র‍্যাস্প্‌বেরির মতো টক্‌টকে লাল তার রং, ধূসর জল যতদূর দেখা যায় লাল হয়ে উঠেছে, ঢেউয়ের মৃদু গর্জ্জন মনে হচ্ছে ঠিক যেন রেশমের খস্‌খস্ শব্দ।

সারাদিন হেঁটে, দাঁড়িয়ে, মদ খেয়ে, আর কেঁদে সেপাইর স্ত্রীরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। মনে তাদের ফূর্ত্তি নাই,—চুপ ক'রে ব'সে তারা দেখছিল

সূর্য্যাস্তের রঙের ছটা ক্রমে ম্লান হয়ে আসছে। বনের ভিতর অন্ধকার যখন ঘনিয়ে এল আর পাইন গাছের ঝাঁকরা চুলের মতো কালো মাথার ওপর চাঁদ দেখা দিল, এই চারটি নারীর মনের ভার অসহ্য হয়ে উঠল। কাঁদার শক্তি আর তাদের ছিল না, তাই তারা গান ধরল—যে গান তাদের সব প্রথম মনে পড়ল। তারই করুণ সুরে বন ভ'রে গেল।

কি লাভ হোলো এই বিয়ে ক'রে? এ্যান্‌লিসের কুঁড়েঘরে জীবনের ধারা ঠিক তেমনি বইছে। কার্‌স্‌টা রোজ ছাগল দোহায়, বনে বনে কাঠ কুড়ায়, তাঁতে কাপড় বোনে। ডিসেম্বর মাসের ছোট দিন, তিনটের সময় অন্ধকার হয়, কার্‌স্‌টা ঠিক ছ'টায় গিয়ে তার বিছানায় শোয়, তার সেই ছেলেবেলার ছোট্ট খাট্‌টিতে, সেটাকে আর বদলান হয়নি, বদলাবার দরকারই বা এমন কি ছিল? ওদিকে রাত দুটো বাজতে না বাজতেই তার ঘুম ভেঙে যায় আর সে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে আবার তাঁতে বসে। দিন আসে দিন যায়, কিন্তু এই একঘেয়ে নিরানন্দ জীবনের আর কোনো নড়চড় হয় না, ঠিক ছাই রঙের পশমের সূতোর মধ্যে তাঁতের মাকু যেমন চলে—এদিক আর ওদিক, এদিক আর ওদিক। কার্‌স্‌টার যে বিয়ে হয়েছিল তার একমাত্র চিহ্ন সে এখন বিনুনির বদলে খোপা করে। ছুটির দিন সে আর সবার সঙ্গে নাচতে যায় না, আর শনিবার রাত্রে তার কোনো ছেলে-বন্ধু লুকিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে আসে না। মেয়েদের জীবনে যা প্রধান ব্যাপার, ছেলেদের কথা ভাবা, তাদের জন্য অপেক্ষা করা, আর মাঝে মাঝে তাদের জন্য কাঁদা—কার্‌স্‌টার তা ফুরিয়ে গিয়েছে। কেইবা আছে তার গল্প করবার লোক আর কি গল্পই বা সে করবে? যে-সব মেয়েদের বিয়ে হয়নি তারা বলে তাদের ছেলে-বন্ধুদের কথা, আর যাদের বিয়ে হয়েছে তারা বলে স্বামীর কথা, ছেলেপিলের কথা, আর ঘরকন্নার কথা। কার্‌স্‌টার তো এসব কিছুই নাই। তাই সে মুখ ভার ক'রে চুপ ক'রে থাকে। মাঝে মাঝে তার আর কিছুতেই ঘুম আসে না, বিছানায় শুয়ে সে শুধু ছট্‌ফট্ করে। চারদিক নিস্তব্ধ। জানলার ছোট্ট শার্সির ভিতর দিয়ে সে দেখতে পায় শীতের আকাশে তারাগুলো জ্বল্‌জ্বল্ করছে। পাশের কুঁড়ে-ঘরগুলোর প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্ট তার কানে আসে। ঐ যে বিলির ছোট্ট ছেলে কেঁদে উঠল। জেজ্ মাতাল হয়ে সবে বাড়ি ফিরছে, ঘরে পা দিতে না দিতে চৌকাঠের উপর সে হোঁচট খেল। এবার সে বিলিকে ধরে মারছে, বিলি চ্যাঁচাচ্ছে আর বকছে। কার্‌স্‌টার মনে হয় সে বড় একা। তার কেন এসব কিছু নাই? সে চায় তার স্বামীকে—তার টোমকে। তার দুই চোখে জল ভ'রে আসে, বালিশে মুখ গুঁজে মড়ার মতো সে পড়ে থাকে।

তবু যা হোক মোকদ্দমাটা ছিল। তার মন একেবারে জুড়ে ছিল এরই ভাবনা, আর এর জন্যে তার কদর বেড়ে গিয়েছিল। সপ্তাহে একদিন সে চারঘণ্টার পথ হেঁটে উকিলের বাড়ি যেত। রাস্তার ধারের প্রত্যেকটি গাছ, এমন কি প্রত্যেকটা পাথর পর্য্যন্ত তার জানা। তার পথের এই বোবা সাথীগুলোর সঙ্গে তার এমনি নিবিড় পরিচয় যে যেমন দিনই হোক না কেন সে ঠিক তাদের চিনতে পারে। যদি ঠাণ্ডায় তার হাতের আঙুলগুলো একেবারে জ'মে যাবার মতো না হয়, তাহলে সে পথ চলতে চলতে মোজা বোনে। মাথায় লাল রুমাল জড়িয়ে যখন সে উকিলের বাড়ি যায় তখন তাকে চিনতে পারে না এমন লোক ও অঞ্চলে নাই, আর কেইবা না জানে তার মোজা বোনার আর তার মোকদ্দমার কথা?

কাঠুরের দল তাকে দেখতে পেলে চেঁচিয়ে বলে, "বলি, ও সেপাইর গিন্নি, একলা একলা লাগে কেমন?" প্রশ্ন শুনে কার্‌স্‌টা থমকে দাঁড়ায়, তারপর জামার হাত দিয়ে মুখের ঘাম মুছে বলে, "মন্দ কি? বেশ তো আছি।"

"টোমের আসতে তো আরো বছর ছয়েক হতে পারে, না?" "তা হোক না, আমার তাতে ভারি।" এই জবাব শুনে বনের মধ্যে হাসির রোল ওঠে। কাঠুরের দল বলে, "দেখি ভারি একলা থাকার সখ! বলি, মোকদ্দমা চলছে কেমন?" "চমৎকার! যার দিকে স্বয়ং ধর্ম্ম, তার ভাবনা কি?" "বলো কি?"

একটি লোকের সঙ্গে তার প্রায়ই দেখা হয়—এই বনের যে তদারক করে তারই সহকারী। কালো গোঁফ, সবুজ কোটের কলার আর রূপোর ঘড়ির চেন—এই হোলো তার পরিচয়। বয়স অল্প। লোক খাসা। সে প্রতিবারই কার্‌স্‌টাকে ডেকে কথা বলে আর ঠাট্টা ক'রে জিজ্ঞাসা করে, "সেপাইর গিন্নির খবর কি?" কার্‌স্‌টার মুখ প্রায় লাল হয়ে ওঠে, তার দিকে ফিরে কার্‌স্‌টা জবাব দেয়, "কেন, বেশ ভালো।"

"স্ত্রী না হলেও টোম্ তাহলে বেশ আছে—একেবারে এতদিন পর্য্যন্ত।" "তার ভাব্‌না কি? য়িহুদী আর পোল মেয়ের কি আর তার অভাব হবে?" "তোমারই বা কি ভাবনা? এখানেই কি কিছু পুরুষ মানুষের অভাব নাকি?" "তাতো বটেই।" "তা যাই বলো, তোমার মতো অমন টুকটুকে তরুণীটি হলে আমি কি আর পথ চেয়ে ব'সে থাক্‌তাম যে কবে আমার সেপাই স্বামীটি ফিরবেন?" "কে বল্‌ল আমি ব'সে আছি?" এই ব'লে কার্‌স্‌টা হো হো ক'রে হেসে ওঠে—কেউ রসিকতা করলে যেমন ভাবে হাসা উচিত ঠিক তেমনি ক'রে।

লোকটি ছাড়বার পাত্র নয়। সে ব'লে উঠল, "ওঃ তাই নাকি ? তা তোমাতে আমাতে মানায় ভালো, তুমি কেমন ছোট্ট খাট্টো আর আমি তেমনি লম্বা।" "যা বল্লে। এই যে পার্ব্বন আস্‌ছে, তখন তোমাতে আমাতে একটা চুক্তি করা যাবে।" এই বলতে বলতে কার্‌স্‌টা, আবার পথ চলা সুরু করে। একদিন লোকটি কার্‌স্‌টাকে ধ'রে আদর করে আর কি! কার্‌স্‌টা জোর ক'রে তার হাত ছাড়িয়ে এক দৌড়। কিন্তু সারাদিন এই কথা যতই ভাবে ততই তার হাসি পায়। রাত্রে বিছানায় শুয়ে তার কেবল মনে পড়ে লোকটির চোখ, আর যখন সে শোনে ছেলেরা সব যে-যার মনের মতো মেয়ের ঘরের দরজায় টোকা দিচ্ছে, তখন তার বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে, তার চোখের ঘুম যায় চ'লে।

বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে এই সহরে যাওয়া আসার ব্যাপারটা অনেকটা সহজ হয়ে গেল। পরিষ্কার ঝরঝরে বিকালগুলো, দেরিতে সন্ধ্যা হয়, বাড়ি ফিরবার পথে তাই তার কোনো তাড়া থাকে না। সে প্রায়ই খুব আস্তে আস্তে পথ চলে, একবারে পা পা ক'রে হাঁটার মতো, যেন সে প্রাণে ধ'রে বন ছেড়ে যেতে পারে না। তার মনে হয় "এতো দেখি ভারি মজা! এই বসন্তকালের বিকালবেলায় মানুষকে কি আলসেমোতেই না ধরে। এমনি আলসেমো যে মোকদ্দমার কথা পর্য্যন্ত আমার ভাবতে ইচ্ছা হয় না। অদ্ভুত!"

লম্বা লম্বা ফারগাছের সারি, তারি মাঝে এক একটি বার্চ্চ নতুন পাতায় ছেয়ে গেছে, যেন একটা সবুজ কানাৎ দিয়ে কেউ ঢেকে দিয়েছে; কোথাও বা বনের মধ্যে শাদা রঙের কি একটা জ্বল্‌জ্বল্ করছে, ঠিক যেন কেউ শাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—ওটা হোলো বুনো বেরি গাছ, একেবারে ফুলে ছাওয়া, এক মাইল দূর থেকে এর গন্ধ নাকে আসে।

বনের পাশে মাঠের মধ্যে কালো হরিণগুলো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে; মেয়েদের গানে পাহাড় আর মাঠ ভেসে যায়। কি গান যে তারা গায় কার্‌স্‌টা তা খুব ভালো ক'রেই জানে। বসন্তের রাতে প্রকৃতিস্থ থাকতে পারে এমন মেয়ে ক'জন আছে? ঘুমোবার চেষ্টা করা বৃথা। কার্‌স্‌টা তাও জানে। সেও এমনি কত রাত গান গেয়ে কাটিয়েছে—তার গলার সুর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছে। উৎসুক হয়ে সে অপেক্ষা করেছে—কেউ কি সাড়া দেবে না! একটি সুন্দর মুখের নিবিড় স্পর্শে কি তার তৃষিত অধর তৃপ্ত হবে না! কার্‌স্‌টা পথ চেয়ে কান খাড়া ক'রে শোনে বনের ভিতর কোনো আওয়াজ পায় কি না; অতীতের স্মৃতিগুলো ঠিক ছবির মত তার চোখের সামনে জেগে ওঠে।

একদিন বনের মধ্যে মর্‌মর্ শব্দ শুনে কার্‌স্‌টা চমকে উঠল। একটা হরিণ ভয় পেয়ে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে আরম্ভ করল। আবার সেই মর্‌মর্ শব্দ—কার্‌স্‌টা তাকিয়ে দেখল তার বনের বন্ধু তার সামনে দাঁড়িয়ে।

কার্‌স্‌টাকে সে কতই সোহাগ ক'রে ডাকল। চাঁদ তখন ঠিক মাথার উপর, তারই আলোয় লোকটির মুখ আর চোখ জ্বল্‌জ্বল্ কর্‌ছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, "আবার বুঝি সহরে যাওয়া হয়েছিল?" কার্‌স্‌টা থেমে দাঁড়াল,—তার মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে জবাব দিল, হ্যাঁ, সে সহরে গিয়েছিল বৈকি—নইলে তার আর বেরোনোর দরকার কি? "কি সুন্দর হয়েছে। হেঁটে বেড়াবার মত রাত বটে।" "হ্যাঁ, সত্যি ভারি সুন্দর!"

লোকটি হেসে উঠে একবার কার্‌স্‌টার মুখের দিকে তাকালো, তারপর চুপ ক'রে রইল। কার্‌স্‌টাও কোনো কথা বলল না, শুধু অপেক্ষা ক'রে থাকল। অবশেষে কার্‌স্‌টাকে দুই হাতে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সে বল্‌ল, "চলো, যাই—শুধু আমরা দুটি—আর কেউ না।"

"তাই তো, তোমার হোলো কি?" কথাটা কার্‌স্‌টা বেশ খর্‌খরে গলায় বলবার চেষ্টা করেছিল, যেন সে ছেলেদের সঙ্গে তামাসা করছে—কিন্তু তার স্বর কেমন যেন আপনা হতে কোমল হয়ে এল। তারপর তারা যখন গাছের ছায়ায় গিয়ে বস্‌ল আর লোকটি তার মস্ত হাত বুলিয়ে কার্‌স্‌টাকে আদর করছিল, তখন তার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এল, সে ভাবল লোকটি যাই চাক্‌না কেন, না বলবার সাধ্য তার নাই।

ভোর হোলো। কার্‌স্‌টা যখন বেশ পা চালিয়ে গ্রামের দিকে চলেছে, তখন পাখীর ডাকে পৃথিবী মুখর হয়ে উঠেছে।

সে পথ চলে আর ভাবে, "যদি বনের ভিতর একটা পুরুষ মানুষের সঙ্গে রাত কাটানো যায়—তাহলে যা হবার তা হবেই। আবার কি!"

এরপর সহর থেকে ফেরার পথে কার্‌স্‌টার সঙ্গে লোকটির প্রায়ই দেখা হয়, আর বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যায়। কার্‌স্‌টার মা এ্যান্‌লিসে বলেন, "তোর দেখছি দেরি ক'রে বাড়ি ফেরা একটা রোগ হয়েছে—ব্যাপার কি?"

কার্‌স্‌টা জবাব দেয়—"ব্যাপার মোকদ্দমা। অত চট্ ক'রেই কি আর তা হয়, এতো আর রান্না নয়।"

মেয়েরা গান গায়, ছেলের দল তাদের বাড়ির দরজায় হানা দেয়, কিন্তু কার্‌স্‌টার মন আর এতে চঞ্চল হয় না।

ফসল কাটবার সময় কার্‌স্‌টা জানতে পারল তার সন্তানসম্ভাবনা হয়েছে। মোটেই সুবিধার কথা নয়। এখন উপায় কি? সে গোলাঘরে

তার ছাগলটার কাছে গিয়ে সবার চোখের আড়ালে খানিকক্ষণ কাঁদল, তারপর আস্তে আস্তে গিয়ে কাজে মন দিল। লোকটির সঙ্গে দেখা হতে সে খুব রাগ ক'রে তাকে যা'তা' বলল, কাঁদাকাটি করল। কিন্তু এ ক'রে আর লাভ কি ?

সে ধীরভাবে তার কাজ ক'রে যায়, তার মুখে কথা নেই, তার র ফ্যাকাসে হয়ে আসছে। গ্রীষ্মের সময় কাজের চাপ খুব বেশি, কিন্তু কোনো কাজ সে ফাঁকি দেয় না। কেবল মাঝে মাঝে তার মেজাজ বিগড়ে যায়, তখন সে মার সঙ্গে খিটিমিটি করে, কিম্বা ছাগলটাকে ধ'রে মারে। আর মোকদ্দমার কাজ থাকুক বা না থাকুক ঘন ঘন সহরে যায়। যদি মোকদ্দমায় হার হয় তাহলে তার দফা শেষ, টোম্ এসে তাকে আর তার ছেলেকে আস্ত রাখবে না। তাই তো, ছোট ছেলেটা যে আসছে, তার কি দশা হবে ? কি আর হবে ? অমন ছেলে পৃথিবীতে কতই হয়—আর ম'রেও যায়। টোমের আসতে তো এখনো অনেক দেরি। কিন্তু তবু সে তার ছেলের কথা না ভেবে পারে না ! তার কেমন টুক্‌টুকে একটা দোলনা হবে, তার বিছানায় কেমন ধব্‌ধবে চাদর পাতা হবে,—আর অমন ছোট্ট একটি নরম জিনিষ একেবারে বুকের মধ্যে চেপে ধরতে কেমন লাগবে! "দূর ছাই ! ছেলে না বাঁচলেই ভালো !"

আলুর ক্ষেতে যখন ফসল ধরল, কার্‌স্টা তার অবস্থা আর গোপন রাখতে পারল না। সে একটি একটি ক'রে আলু তুলে তার আঁচলে রাখে আর শোনে পেছনে বিলি বলছে, "কার্‌স্টা দেখছি টোম্ বাড়ি ফিরলে তাকে দেবার মতো একটা কিছু জোগাড় করেছে—অমন জিনিষ পেলে টোম্ কি আর খুসী না হয়ে পারে !" এই কথায় অন্য মেয়েরা হেসে ওঠে, আর তাদের হাসি দেখতে দেখতে মাঠময় ছড়িয়ে পড়ে। কার্‌স্টা ভাবে, "এরকম যে হবে জানাই তো ছিল আর হোলোও তাই।" তার হাঁটু ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপে, তার আঁচল থেকে আলুগুলো মাটিতে পড়ে যায়। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত চোখে সে সবার দিকে তাকায়—কিন্তু জানে সে অসহায়। আবার সে তার কাজে মন দেয়। তার লাঞ্ছনার আর শেষ নাই। যখন মাঠ পার হয়ে সে আলুর বোঝা গাড়িতে তুলতে যায়, চারদিক থেকে তাকে মেয়েরা জিজ্ঞাসা করে, "বল্ না, কার্‌স্টা, এমন রত্ন পেলি কোথায় ? সহরে নাকি ? তা সহরে খুব সস্তাতেই ওসব জোটে। এ বুঝি মোকদ্দমার ফল ? না তোর টোম্ ডাকে পাঠিয়েছে ?" কার্‌স্টা নিরুত্তর।

একদিন না একদিন লোকের কথা থামবেই। তখন সে একটু সোয়াস্তি পাবে। তার মাও কম যায় না—সারাদিন তার ঘ্যান্ ঘ্যান্ আর

মুখ-ঝাট্‌কা লেগেই আছে। বকাবকি ক'রে লাভ কি ? কার্‌স্টা ভাবে যা ঘটে মেনে নেওয়াই ভালো। মানুষের কপালে দুঃখ আছেই—এই ভেবে তবু সে মনে একটু বল পায়।

একদিন শীতকালে বনের ভিতর কাঠ কুড়োতে গিয়েছে এমন সময় তার ব্যথা উঠল। মেয়েরা সবে মিলে যখন তাকে একটি স্লে-গাড়িতে তুলে টানতে টানতে গ্রামে নিয়ে এল, তখন তাদের সে কি উদ্দাম হাসি ! কার্‌স্টার একটি মেয়ে হোলো। সে এতদিন যার অপেক্ষায় ছিল—যাক্, অবশেষে তিনি হাজির ! কই, মরবার নামও তো নেই। কেমন পুষ্ট শরীরটি ! আর ছোট্ট কচি মুখটি দেখলে মনে হয় যেন কত ভাবনাই তাঁকে ভাবতে হয়, আর মিষ্টি দুটো চোখ একেবারে জ্বল্‌জ্বল্ করছে। কেউ আর ঠাট্টা করে না। করলেই বা কি যায় আসে ? মোকদ্দমা ছাড়াও কার্‌স্টার জীবনে এখন এমন জিনিষ আছে যার জন্যে সে বেঁচে থাকতে পারে। অবিশ্যি মোকদ্দমার তদ্বির করা তার প্রধান কর্ত্তব্য—কিন্তু এই ছোট্ট মানুষটিকে যে সারাদিন না দেখলে চলে না। এঁর কাজ কি কম—এঁকে দোল দেওয়া, এঁকে দুধ খাওয়ানো, আর গরম দিনে কোলে নিয়ে দোর-গোড়ায় ব'সে গান গাওয়া।

টোমের চিঠি এল। সে লিখেছে—"খবর খারাপ। অসুখে পড়েছি। এরা আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে। আসছে সপ্তাহেই পৌঁছাব। সাবধানে থেকো। ইতি তোমার টোম্।"

শীতকালে ঘরে আগুণ জ্বালা হয়েছে, তারি আলোয় কষ্টে কার্‌স্টা চিঠিটা পড়ল। মা জিজ্ঞাসা করল, "কি লিখেছে ?" "কি আর লিখবে ?" এই ব'লে কার্‌স্টা আগুণের কাছে বেঞ্চির উপর ব'সে পড়ল, সে আর দাঁড়াতে পারছিলনা। মা আবার জিজ্ঞাসা করল, "কিরে ? ভালো আছে তো ?" কার্‌স্টা কোনো জবাব দিল না। চুপ ক'রে আগুণের দিকে তাকিয়ে থাকল। "জবাব দিচ্ছিস না কেন ? কি লিখেছে টোম্ বল্‌তেই হবে।" আস্তে আস্তে শুক্‌নো গলায় কার্‌স্টা বল্‌ল, "শীগগিরই ফিরছেন।" কার্‌স্টা ভাবছিল, "আর যাই হোক ছেলেটাকে যদি কিছু না বলে।" তার মার মনেও ঐ এক চিন্তা, কেন না সে বল্‌ল, "দোলনাটা এমন জায়গায় রাখতে হবে যেন যেতে আস্‌তে সব সময় তার চোখে না পড়ে।" কার্‌স্টা বল্‌ল, সে ব্যবস্থা সে করবে। খানিকক্ষণ তারা দু'জন পাশাপাশি চুপ ক'রে বসে থাকল, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে যে-যার বিছানায় গিয়ে শুল। শুয়ে শুয়ে মা মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে, "মোকদ্দমা ভালো চল্‌ছে তো ?" "ভালো না চ'লে উপায় আছে ?" "আচ্ছা—তাহলে"—এই বল্‌তে বল্‌তে এ্যান্‌লিসে ঘুমিয়ে পড়ে।

একদিন শনিবার, বিকাল বেলা, কার্‌স্‌টা সরাইখানার সামনে দাঁড়িয়েছিল। যে-সব সেপাই ছুটি পেয়েছে তারা আজ ফিরবে, সহর থেকে স্লে-গাড়িতে ক'রে তাদের আসার কথা। অসহ্য শীত! টক্‌টকে লাল সূর্য্য কাচের মত স্বচ্ছ আকাশে অস্ত যাচ্ছে। গ্রামের মেয়ের দল সব সেখানে জড় হয়েছে। কোঁচরের মধ্যে হাত গুঁজে তারা ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে আর ব্যগ্র দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখছে। ঐ যে—সেপাইরা আসছে! তারা টুপি নেড়ে চীৎকার করতে আরম্ভ করল।

কার্‌স্‌টার সঙ্গে দেখা হতে টোম্ বল্‌ল, "তেমনি ছোট্টটি, কিন্তু যাহোক তবু ত বেঁচে আছ।" কার্‌স্‌টার মুখ লাল হয়ে উঠল, সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল টোম এমন জোয়ান। তার কি রকম লজ্জা করতে লাগল। কোনো রকমে একটু হেসে বলল, "না বাঁচার কি হয়েছে।" কিন্তু তার চোখে জল ভ'রে এল, সে টোমের জামার হাতায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। তারপর বল্‌ল—"চলো, খাবার তৈরী।" "খাবার—তা বেশ" ব'লে টোম্ হালকা মনে হাসল। "আমি বোধ হয় এখনো যথেষ্ট মোটা নই, তাই গিন্নির এত উৎসাহ আমাকে ভালো ক'রে খাওয়ানোর।" এই ভাবে গল্প করতে করতে তারা বাড়ি চল্‌ল—আগে আগে টোম্, পিছন পিছন কার্‌স্‌টা।

সবুজ পাতা দিয়ে তাদের ছোট্ট কুঁড়েঘরটি সাজানো হয়েছে, আর তাতে আলো দেওয়া হয়েছে ছটো মোমবাতি জ্বালিয়ে; টেবিলের উপর একটা পরিষ্কার শাদা চাদর পাতা, সরু সরু পাইন পাতা মেজেতে ছড়ানো। আগুণের উপর হাঁড়ি চড়ানো, এ্যান্‌লিসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাতে কাঠি দিচ্ছে।

"তাই তো, মা এখনও ঠিক রয়েছেন। বুড় হাড়ের তেজ আছে!" এ্যান্‌লিসে বল্‌ল, "এখনো কিছুকাল এতেই চ'লে যাবে। যা হোক্, তোমাকে দেখে এত ভালো লাগছে।"

টোম্ টেবিলে গিয়ে বসল। তাকে শূয়োরের মাংস খেতে দেওয়া হোলো। খুব আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে সে খেতে লাগল। ভরা মুখে কার্‌স্‌টার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "জমীদার, ডাঙুরের জমীদার।" ঠিক তার সামনে ব'সে কার্‌স্‌টা ভাবছিল, "একজন পুরুষ মানুষের চেহারা কি এত সুন্দরও হতে পারে, আশ্চর্য্য!" টোমের মুখ রোদে এমনি পুড়ে গিয়েছিল যে তার গোঁফগুলো প্রায় সাদা দেখাচ্ছিল, কিন্তু কি রকম তার কাঁধের বহর, আর ছটি বিশাল বাহু, আর গলা! এমন বলিষ্ঠ স্বামী পাওয়া কি আনন্দ!

টোমের ক্ষিদে মিটেছে। হাত দিয়ে মুখ মুছে সে চেয়ারটাতে হেলান দিয়ে বল্‌ল, "তাহলে এবার মোকদ্দমার খবরটা শোনা যাক।"

কার্‌স্‌টা খুব গম্ভীর মুখে সব খবর ব'লে যেতে লাগল। উকিল কি রকম সব বুদ্ধিমানের মতো কথাই না বলেছেন, আর সেই বা কি কম গিয়েছে—কি কথায়, কি কাজে! সম্পত্তিটা প্রায় তারই বলা চলে। টোম্ মন দিয়ে সব শুনে বল্‌ল, "একরত্তি মেয়ে—কিন্তু বাপ! কি মাথা।" কার্‌স্‌টাকে আর পায় কে—সে গড়গড় ক'রে ব'লেই চলেছে। দূরের কোণ থেকে একটা ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ শোনা গেল। কার্‌স্‌টার কথা থাম্‌ল না। ঠিক কলের পুতুলের মতন উঠে গিয়ে মেয়েটাকে কোলে নিয়ে জামার বোতাম খুলে তাকে খাওয়াতে লাগল। কেবল তার গলার স্বর একটু চড়ে গেল, যাতে ঘরের আর এক প্রান্ত থেকে শোনা যায়। হঠাৎ কথার মাঝখানে সে থমকে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে এ্যান্‌লিসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কার্‌স্‌টা ভাবল, "এবার আমার দফা শেষ।" টোম্ আস্তে আস্তে তার দিকে এগিয়ে আসছিল—তার ভাব দেখে মনে হয় একটা কি যেন সে ধরার চেষ্টা করছে। মেয়েটাকে দোলনায় শুইয়ে কার্‌স্‌টা সেটা আগ্‌লে দাঁড়ালো, তার রং ফ্যাকাশে, তার চোখের দৃষ্টি ভয়কাতর! তার হাত ছটো এমনি কাঁপছিল যে সে ছই হাত পেটের উপর শক্ত ক'রে চেপে ধরেছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ভাবছে, "অবশেষে যা হবার তা হতে চল্‌ল।" টোম্ জিজ্ঞাসা করল, "ওটা কি?" তার গলার স্বর চাপা, যেন কেউ টুঁটি চেপে ধরেছে। "কি মনে হয়?" "এই ছোট্ট মেয়েটা কোত্থেকে এল?" "কোত্থেকে আবার আস্‌বে?" কথাগুলো খুব জোর দিয়ে সে বল্‌ল—যেন কারো তোয়াক্কা সে রাখে না, কিন্তু ব'লেই ছই হাতে মুখ ঢেকে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল, যেন একটি ছোট ছেলে ছুষ্টুমি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

"ও! তুই কিনা এই রকম। আচ্ছা।" এই ব'লে টোম্ তার হাত ধরে টানতে টানতে ঘরের মাঝখানে তাকে নিয়ে গেল। "স্বামীর সঙ্গে প্রতারণা! মজা টের পাওয়াচ্ছি! ছজনকেই যদি খুন না করেছি।" নির্দ্দয়ভাবে সে কার্‌স্‌টাকে ধ'রে পিটোতে আরম্ভ করল। কার্‌স্‌টা চ্যাচাতে লাগল আর সাধ্যমত চেষ্টা কর্‌ল স্বামীর হাত থেকে ছাড়া পেতে। তার মনে হচ্ছিল, "একেবারে লোহার মত হাত! বাপ্‌রে! কি জোর! আমাকে নিশ্চয় মেরেই ফেল্‌বে—কি সর্ব্বনাশ!" কিন্তু গায়ে যতই ব্যথা লাগুক, মনে সে তৃপ্তি পাচ্ছিল। হ্যাঁ—তার যে একজন স্বামী আছে তার হাতের মার খেয়ে সে আরো স্পষ্ট ক'রে তা' বুঝল।।

টোম্ হাঁপিয়ে পড়েছিল। স্ত্রীকে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সে টেবিলের ধারে গিয়ে ব'সে পড়ল। কার্‌স্‌টা মেজেয় গড়াচ্ছে, তার সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা। টোমের দিকে আড়চোখে সে তাকিয়ে দেখছে তার মার শেষ

হয়েছে কিনা। সে যে অমন চুপ ক'রে ব'সে থাকবে, তার দিকে ফিরে চাইবে না, তার চেয়ে বরং মারধোর সওয়া যায়। টোম্ দুই হাতে মাথা ধ'রে ভাবছে। কার্‌স্টা কষ্টে উঠে আগুণের ধারে ব'সে গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে আপন মনে কাঁদছে আর ভাবছে—"বেচারি! সত্যি ওর কি দুঃখ!"

মোমবাতিগুলো পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাইরে বরফ পড়ছে, জানলার শার্সির উপর ছোট ছোট বরফের টুকরোর টপ্ টপ্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আগুণের সামনে একটা ঝিঁঝি প্রাণপণ ডাকছে। কার্‌স্টা ভাবছিল—"ও করবে কি? আবার রাতে আমাকে মারবে নাকি?"

টোম্ ঢক্‌ঢক্ ক'রে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি খেল, তারপর মস্ত এক হাই তুলে জুতো খোলার ব্যবস্থা করছিল। কার্‌স্টা উঠে নিজেই তার জুতো জোড়া খুলে দিল। তারপর পোষাক ছেড়ে টোম্ বিছানায় ধপ্ ক'রে গিয়ে শুল, তার বিপুল দেহের চাপে খাট্‌টা এমনি ক্যাঁচ ক্যাঁচ করতে লাগল যে মনে হোলো ভেঙে পড়ে আর কি! খুসিতে কার্‌স্টা মুখের হাসি চাপতে পারল না। "কি রকম ভারী শরীর!" বাতি নিবিয়ে দিয়ে আবার গিয়ে আগুণের ধারে সে বসল। তার খালি পা দুটো আগুণের আভায় গোলাপী দেখাচ্ছিল। স্তব্ধ হয়ে উৎসুক মনে সে ব'সে—তার স্বামীর প্রত্যেকটি নিশ্বাসের শব্দ সে কান পেতে শুনছে।

হঠাৎ বিছানার উপর থেকে টোম্ বলে উঠল—"এই! ওখানে ব'সে কেন? শোবে না?" কার্‌স্টা অস্বাভাবিক রুক্ষ গলায় জবাব দিল—"না শুয়ে করব কি?" কিন্তু বিছানার কাছে যেতে না যেতে তার মন আবেগে ভরে গেল—সেও এখন অন্য স্ত্রীদের মতন।

কিছুদিন পর্য্যন্ত এই ছোট্ট কুঁড়েঘরটিতে শান্তি ছিল না। মাঝে মাঝে টোমের মনে পড়ে যেত তার স্ত্রী তার প্রতি কি অন্যায় করেছে, আর সে একেবারে ক্ষেপে যেত। কি মারধোর আর চীৎকারই না তখন হোতো। ভাঁটিখানায় সে শপথ করল যে স্ত্রী ও তার মেয়ে দুজনকেই সে খুন করবে। মেয়েটাকে তার কাছ থেকে কেবলই লুকিয়ে রাখা হ'ত। কার্‌স্টা কিন্তু বলত, সব সয়ে যাবে, পুরুষরা সবই এক রকম—তার আর নড়চড় নাই। সত্যি, যতই দিন যায় টোমের মুখে মেয়েটার কথা ততই কম শোনা যায়, সে কেবল বলে মোকদ্দমার কথা। জমীটা পেলে তারা কটা গোরু রাখবে, আর কটা শূয়োর, এই সব আলোচনাতেই তাদের সময় কাটে—তাছাড়া আরো কত কি! ক্রমে মেয়েটা যে আছে সে কথা সে এক রকম ভুলেই গেল। কার্‌স্টাকে এখন আর লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দুধ খাওয়াতে হয় না।

টোম্ ঠিক করল, নিজেই সহরে গিয়ে সব ব্যবস্থা করবে। অবিশ্যি মেয়েদের পক্ষে কার্‌স্টা বেশ চালাক, তবে সত্যিকারের বুদ্ধিতে কি আর ছেলেদের কাছে লাগে! কার্‌স্টা বল্‌ল, "সত্যিই তো, ছেলেদের মতো বুদ্ধি কেমন ক'রে মেয়েরা পাবে বলো?" টোম্ সহরে গেল। তার ফিরতে রাত হোলো, বেশ একটু টেনে সে ফিরেছে। তার স্ফূর্ত্তি দেখে কে? মোকদ্দমায় তাদের জিৎ হয়েছে। কার্‌স্টাকে ডেকে সে বল্‌ল, "বলি জোতদারের গিন্নি, একবার এদিকে এস। দেখ কি এনেছি।" এই ব'লে সে কার্‌স্টার মাথায় একটা লাল রুমাল বেঁধে দিয়ে বল্‌ল, "জোতদারের বউকে একটু সাজগোজ না করলে চল্‌বে কেন? লোকে বলবে কি?" "এটা আনার কি দরকার ছিল?" কিন্তু কার্‌স্টার মুখে হাসি আর ধরে না।

"হ্যাঁ—আর দেখো—এই যে"—টোমের যেন কেমন বাধ বাধ লাগছিল। ধবধবে এক বাণ্ডিল কাপড় সে টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিল। তারপর কার্‌স্টার দিকে পিছন ফিরে কোনো রকমে ঢোক গিলে সে বল্‌ল, "এ গুলো সব ঐ ওটার জন্যে।" "কার জন্যে?" "ঐ মেয়েটার জন্যে।" কার্‌স্টা বাণ্ডিলটা তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরল। এতদিনে বুঝি তার সত্যি কপাল ফিরেছে।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

কবিতাগুচ্ছ

তীর্থযাত্রী *

কন্‌কনে ঠাণ্ডায় হোলো আমাদের যাত্রা,
ভ্রমণটা বিষম দীর্ঘ, সময়টা সব চেয়ে খারাপ,
রাস্তা ঘোরালো, ধারালো বাতাসের চোট,
একেবারে দুর্জ্জয় শীত।
উটগুলোর ঘাড়ে ক্ষত, পায়ে ব্যথা, মেজাজ চড়া,
তারা শুয়ে শুয়ে পড়ে গলা বরফে।
মাঝে মাঝে মন যায় বিগ্‌ড়ে
যখন মনে পড়ে পাহাড়তলীতে বসন্তমঞ্জিল, তার চাতাল,
আর সর্‌বতের পেয়ালা হাতে রেশমীসাজে যুবতীর দল।
এদিকে উট-ওয়ালারা গাল পাড়ে, গন্‌গন্‌ করে রাগে,
ছুটে পালায় মদ আর মেয়ের খোঁজে।
মশাল যায় নিভে, মাথা রাখবার জায়গা জোটেনা।
নগরে যাই, সেখানে বৈরিতা, নগরীতে সন্দেহ,
গ্রামগুলো নোংরা, তারা চড়া দাম হাঁকে।
কঠিন মুস্কিলে পড়া গেলো।
শেষকালে ঠাওরালেম চলব সারারাত,
মাঝে মাঝে নেব ঝিমিয়ে,
আর কানে কানে কেউ গান গেয়ে যাবে—
এ সমস্তই পাগলামি ॥
ভোরের দিকে এলেম, যেখানে মিঠে শীত সেই পাহাড়ের খদে,
সেখানে বরফসীমার নীচেটা ভিজে-ভিজে, ঘন গাছ-গাছালির গন্ধ।
নদী চলেচে ছুটে, জলযন্ত্রের চাকা অঁাধারকে মারচে চাপড়।
দিগন্তের গায়ে তিনটে গাছ দাঁড়িয়ে,
বুড়ো সাদা ঘোড়াটা মাঠ বেয়ে দৌড় দিয়েচে।
পৌঁছলেম সরাবখানায়, তার কপাটের মাথায় আঙুরলতা।
দু'জন মানুষ খোলা দরোজার কাছে পাশা খেল্‌চে টাকার লোভে,
পা দিয়ে ঠেল্‌চে শূন্য মদের কুপো।
কোনো খবরই মিল্‌লনা সেখানে,
তাই চল্‌লেম আরো আগে।
যেতে যেতে সন্ধ্যে হোলো ;

* T. S. Eliot-এর The Journey of the Magi-নামক কবিতার অনুবাদ

সময় পেরিয়ে যায় যায়, তখন খুঁজে পেলেম জায়গাটা ;
বলতেও পারো, ব্যাপারটা তৃপ্তি পাবার মতো বটে।

মনে পড়ে, এসব ঘটেচে অনেক কাল আগে,
আবার ঘটে যেন এই ইচ্ছে, কিন্তু লিখে রাখো,
এই লিখে রাখো, এত দূরে যে আমাদের টেনে নিয়েছিল
সে কি জন্মের সন্ধানে না মৃত্যুর।
জন্ম একটা হয়েছিল নিশ্চিত,
প্রমাণ পেয়েচি, সন্দেহ নেই।
এর আগে তো জন্মও দেখেচি, মৃত্যুও,
মনে ভাবতেম তারা এক নয়।
কিন্তু এই যে জন্ম এ বড়ো কঠোর,
দারুণ এর যাতনা, মৃত্যুর মতো, আমাদের মৃত্যুর মতোই।
এলেম আমরা ফিরে, আপন আপন দেশে, এই আমাদের
রাজত্বগুলোয়।
কিন্তু আর স্বস্তি নেই সেই পুরানো বিধানের মধ্যে,
যেখানে আছে সব অনাত্মীয় তাদের দেবদেবী আঁক্‌ড়ে ধরে।
আর-একবার মরতে পারলে আমি বাঁচি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রূপবাণী

প্রাঙ্গণে নামল অকাল সন্ধ্যার ছায়া,
সূর্য্যগ্রহণের কালিমার মতো।
উঠল ধ্বনি :—খোলো দ্বার।
প্রাণপুরুষ ছিল ঘরের মধ্যে,
সে কেঁপে উঠ্‌ল চমক খেয়ে।
দরজা ধরল চেপে,
আগলের উপর আগল লাগলো।
কম্পিতকণ্ঠে বল্‌লে, কে তুমি।
মেঘমন্দ্র-ধ্বনি এলো, আমি মাটি-রাজত্বের দূত,
সময় হয়েচে, এসেচি মাটির দেনা আদায় করতে।

ঝন্‌ঝন্‌ বেজে উঠ্‌লো দ্বারের শিকল,
থরথর প্রাচীর কাঁপতে লাগল।
ঘরের হাওয়া উঠ্‌ল হায় হায় করে।
নিশাচরের ডানার ঝাপট আকাশে আকাশে
নিশীথিনীর হৃৎকম্পনের মতো।
ধক্‌ধক্‌ ধক্‌ধক্‌ আঘাত বাজলো দ্বারের উপর,
খান্‌খান্‌ হোলো আগলগুলো, কপাট পড়লো ভেঙে।

কম্পমান কণ্ঠে প্রাণ বল্‌লে, হে মাটি, হে নিষ্ঠুর, কী চাও তুমি ?
দূত বল্‌লে, আমি চাই দেহ।
দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌লে প্রাণ, বল্‌লে,
এতকাল আমার লীলা এই দেহে,
এর অণুতে অণুতে আমার নৃত্য,
নাড়ীতে নাড়ীতে ঝঙ্কার,
মুহূর্ত্তেই কি উৎসব দেবে ভেঙে,
দীর্ণ হয়ে যাবে বাঁশি,
চূর্ণ হয়ে যাবে মৃদঙ্গ,
ডুবে যাবে এর দিনগুলি
অতল রাত্রির অন্ধকারে।
দূত বল্‌লে, ঋণে বোঝাই তোমার এই দেহ,
শোধ করবার দিন এলো।
মাটির ভাণ্ডারে ফিরবে তোমার দেহের মাটি।
প্রাণ বল্‌লে, মাটির ঋণ শোধ করে নিতে চাও, নাও।
কিন্তু তার চেয়ে বেশি চাও কেন ?
দূত বিদ্রূপ করে বল্‌লে, এই তো তোমার নিঃস্ব দেহ,
কৃশ ক্লান্ত কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর চাঁদ,
এর মধ্যে বেশি আছে কোথায়।
প্রাণ বল্‌লে, মাটিই তোমার, রূপ তো তোমার নয়।
অট্টহাস্যে হেসে উঠ্‌ল দূত, বল্‌লে, যদি পারো, দেহ থেকে
রূপ নাও ছাড়িয়ে।
প্রাণ বল্‌লে, পারবই, এই পণ আমার।

প্রাণের মিতা মন। সে গেল আলোকউৎসের তীর্থে।
বল্‌লে জোড়হাত করে—
হে মহাজ্যোতি, হে চিরপ্রকাশ, হে রূপের কল্পনির্ঝর,
স্থূল মাটির কাছে ঘটিয়োনা তোমার সত্যের অপলাপ,
তোমার সৃষ্টির অপমান।

সে তোমার রূপকে লুপ্ত করে কোন্‌ অধিকারে,
আমাকে কাঁদিয়ে দিয়ে যায় কার অভিশাপে।
মন বস্‌ল তপস্যায়।
কেটে গেল হাজার বছর, লক্ষ বছর, প্রাণের কান্না থামেনা।
পথে পথে বাটপাড়ি চলে,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রূপ যায় চুরি।
সমস্ত জীবলোক থেকে প্রার্থনা ওঠে দিনরাত—
হে রূপকার, হে রূপরসিক,
যা দান করেচ নিজহাতে, জড় দানব তাকে কেড়ে নিয়ে যায় যে।
ফিরিয়ে আনো তোমার আপন ধন।

যুগের পর যুগ গেলো—নেমে এলো আকাশবাণী :—
মাটির জিনিষ ফিরে যায় মাটিতে,
ধ্যানের ধন রূপ ফিরে আসে আমার ধ্যানে।
বর দিলেম, হারা রূপ ধরা দেবে,
কারামুক্ত ছায়া আসবে আলোর বাহু ধরে
তোমার দৃষ্টির উৎসবে।

রূপ এলো ফিরে, উঠল শঙ্খধ্বনি।
ছুটে এলো চারিদিক থেকে রূপের প্রেমিক।

আবার দিন যায়, বৎসর যায়। প্রাণের কান্না থামেনা।
আরো কী চাই।
প্রাণ জোড়হাত করে বলে—
মাটির দূত আসে, নির্ম্মম হাতে কণ্ঠযন্ত্রে কুলুপ লাগায়, বলে, কণ্ঠনালী আমার।
শুনে আমি বলি, মাটির বাঁশিখানি তোমার বটে,
কিন্তু বাণী তো তোমার নয়।

উপেক্ষা করে সে হাসে।
শোনো আমার ক্রন্দন, হে বিশ্ববাণী,
জয়ী হবে কি জড়মাটির অহঙ্কার—
সেই অন্ধ সেই মূক তোমার বাণীর উপর কি চাপা দেবে চিরমূকত্ব,
যে-বাণী অমৃতের বাহন, তার বুকের উপর স্থাপন করবে জড়ের জয়স্তম্ভ।

শোনা গেলো আকাশ থেকে—
ভয় নেই।
বায়ু-সমুদ্রে ঘুরে ঘুরে চলে অশ্রুতবাণীর চক্রলহরী,
কিছুই হারায় না।
আশীর্ব্বাদ এই আমার—সার্থক হবে মনের সাধনা।
জীর্ণকণ্ঠ মিশবে মাটিতে, চিরজীবী কণ্ঠস্বর বহন করবে বাণী।

মাটির দানব মাটির রথে যাকে হরণ করে চলেছিলো
মনের রথ সেই নিরুদ্দেশ বাণীকে আনলে ফিরিয়ে,
জয়ধ্বনি উঠলো মর্ত্ত্যলোকে।
দেহমুক্ত রূপের সঙ্গে যুগলমিলন হোলো দেহমুক্ত বাণীর,
প্রাণতরঙ্গিণীর তীরে, দেহনিকেতনের প্রাঙ্গণে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সনেট

দৈন্যমাঝে দুঃখমাঝে সংকীর্ণতামাঝে
অন্তর-অতলে কে গো ক্রন্দে মুক্তি তরে?
বন্ধনকারায় আত্মা লুঠে শ্রান্তিভরে,
মুমূর্ষু স্বপন তার ক্ষুব্ধাকাশে বাজে।
কোথা স্বাধীনতা, কোথা সম্পূর্ণতা রাজে?
জিজ্ঞাসে মানব ক্লান্ত আগ্রহের স্বরে
কোনোদিন শ্রমকৃচ্ছ্র সাধনার পরে
পূর্ণতা আসিবে ফুল্ল সার্থকতা সাজে?

সেদিন মানব সত্য লভিবে কি শান্তি?
অনির্ব্বাণ মহানন্দে হবে জ্যোতিষ্মান?
হয়ত সেদিন এক নবতর ক্লান্তি
নামি ভারাক্রান্ত তার করিবে পরাণ!
পূর্ণতা সেদিন তার মনে হবে ভ্রান্তি,
মাগিবে নিয়তি হস্তে অপূর্ণতা দান?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র সেন।

জ্যোৎস্নায়

আজ চোখে ঘুম নাই। আকাশেরো ঘুম নাই যেন।
নরম ঘুমের মত জ্যোৎস্না জেগে রয়।
ভেবে দ্যাখো একবার—এমনি মদির জ্যোৎস্নারাতে
মালিনীর স্তব্ধ জল কেঁপেছিল রূপালী বাতাসে;
উটজে ফেরেনি শকুন্তলা,
চেয়ে আছে, কোন্ পথে এসেছিল দুষ্মন্তের রথ।
সমুদ্র-সৈকতে এসে এমনি জ্যোৎস্নায়
দাঁড়ায়ে কেঁদেছে ডিডো, কার্থেজের স্বপ্ন চোখে তার।
সেদিনো এমনি ছিল স্বচ্ছ জ্যোৎস্নারাত—
ট্রয়ের পাষাণপুরী পরিশ্রান্ত পশুর মতন
ঘুমায়ে পড়েছে; শুধু জেগে আছে হেলেনের চোখ—
জেগে আছে—দ্রুতগতি সমুদ্রের পাখীর পালকে,
জেগে আছে—দূরান্তের অর্দ্ধস্ফুট ঢেউয়ের সঙ্গীতে!

ঘুম? আজ না-ই হোল ঘুম! থাক' জেগে।
এই রাতে ঘুমায়নি ইসুফ জুলেখা।
নেমে এসো অবিশ্রান্ত জ্যোৎস্নার বর্ষণে।
নগ্ন আকাশের তলে অসহ্য নূতন
প্রথম প্রেমের মত স্পর্শ জাগে নিঝুম জ্যোৎস্নায়।
আজ আর না-ই হোল ঘুম!

শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য।

নব আবাহন

সৃষ্টির আকাশে সাজে
ভীষণ দুর্য্যোগময়ী বিত্রস্ত-ভূষণা অমানিশা।
নাহি গ্রহ নাহি তারা,
ক্ষণে ক্ষণে জাগিতেছে
মেঘপুঞ্জে বিদ্যুন্ময়ী করালীর ভয়াল ভ্রূকুটি,
তাণ্ডব-অশনি-মন্দ্রে ঘোর অট্টহাসি!
তাথিয়া তাথিয়া থিয়া নৃত্যক্লান্ত ঝঞ্ঝার নিঃশ্বাসে
অসহায়া ধরিত্রীর শ্যামল অঞ্চলে লাগে দোলা,
অরণ্যের ক্রমে ক্রমে উৎপাটন-উৎসব-মর্ম্মরে
বাজে যেন উচ্ছৃঙ্খল দামামা দুন্দুভি!

গৃহহারা পথহারা লক্ষ্যহারা মানবের মর্ম্মে জাগে
দুর্বিষহ অরুন্তুদ একী আর্ত্তনাদ!
একী আন্দোলিত করুণ প্রার্থনা!

"ওগো প্রভু,
রুদ্ধশ্বাস ভীত বক্ষে বেদনার বহ্নিজ্বালা
সহে না—সহে না
নয়নের ক্ষীণ দীপ্তি নাহি হেরে সম্মুখের পথরেখা আর!
দাও, দাও, কোথা প্রভু, খুলে দাও আলোক-নির্ঝর,
প্রাচীর ললাট-দেশে মুক্ত কর স্বর্ণপ্রভ প্রভাতের দ্বার,
মুছে নাও ধরা পৃষ্ঠে মৃত্যুর কালিমা,
মুছে নাও নির্ম্মম নিষ্ঠুর ঘোর রাক্ষসী-আক্রোশ!
দাও প্রভু মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনের পরম আস্বাদ,
সুষমা-সুরভি বায়ে পূর্ণ কর দিক,
দীপ্ত কর জীবনের অপ্সরা-সঙ্গীত!"

হে মহিমময়,
আর কত কাল রবে অপাবৃত রহস্যের মোহিনী মায়ায়,
যোগনিদ্রাতুর?
অসুন্দর-অন্তরালে মহিমা তোমার
কত কাল রবে আর অস্ফুট কোরক?
মানবের চেতনায় ভাস্কর দীপ্তিমা তব
কত কাল রবে আর কৃষ্ণ মেঘে ঢাকা?

আর নহে
জীবনের সিন্ধুতীরে ফেনশীর্ষ অজ্ঞানের তরঙ্গ-কল্লোল।
ক্ষণপ্রভা ক্ষণিকার ধাঁধা,
শ্রান্তির ক্লান্তির ক্লেদ-জর্জ্জরিত মুহ্যমান্ প্রাণে
সুন্দরের দারুণ লাঞ্ছনা,
নাহি নাহি প্রেম প্রীতি
দুর্দ্দম দুরন্ত ক্ষিপ্ত অরণ্য পশুর
নগ্নতার কাম-পঙ্কে কামনা বিলাসে,
শোণিত-পিপাসা-মত্ত উৎকট উল্লাসে,
সৌন্দর্য্যের শুভ্রতার ক্রূর নিষ্পেষণে!
ক্ষুদ্রতা-সঙ্কোচ-ভয়-অহমিকা-অসরল-অন্ধ কারাগারে
মোহের তিক্ততাবাহী উদগ্র সুরায়
প্রেম-দেবতার, হায়, হয় না আরতি!
পঙ্কিল পিচ্ছিল-বক্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল পথে
সুন্দরের অভিসার হয় না কখন!

হে দেবতা,
যুগে যুগে তব পূজা হ'ল যত বিশ্বের দেউলে
লক্ষ কোটি তীর্থ-যাত্রী হৃদয় নিঙাড়ি
প্রীতি-ভক্তি-অর্ঘ্য-ডালা স্থাপিয়াছে তব বেদী 'পরে,
নয়নের তপ্তজলে ধুইয়াছে চরণ তোমার,
তবু তুমি দাও নাই বিশ্বমাঝে ধরা,
সখারূপে বন্ধুরূপে সর্ব্ব মানবেরে
লহ নাই বক্ষে তব টানি।
তাই দিল তারা প্রতিশোধ,—
কহিল তোমারে ডাকি
"তব সৃষ্টি মিথ্যা-মায়া-দুঃখ-শোক-জরা-ব্যাধিময়
নাহি সত্য নাহি শিব সুন্দরের প্রতিষ্ঠা হেথায়,
ফলে ফুলে ভরা এই বিশাল পৃথিবী—
একখানি দুঃস্বপ্ন বিরাট
ভ্রান্তিময় মরু-মরীচিকা!"
দিল তারা প্রতিশোধ তোমার সৃষ্টিরে
জীবনের মাঝে তব সিংহাসন 'পরে
নিক্ষেপিল ধূলারাশি প্রস্তর কঙ্কর!

কিন্তু আর নহে—আর নহে,
নূতন সৃষ্টির প্রাতে সে খেলার হোক্ অবসান !
সুধাসিন্ধু ওগো,
আত্মার গগনাঙ্গনে নিঃশব্দ নির্জ্জন দেশে,
ছিন্ন কর এইবার বিদেহীর বেশ !
বিশ্বমানবের দ্বারে
তোমার প্রেমের হোক্ পরীক্ষা কঠোর !

হে সুন্দর
চাহি আজ অগণিত মানবের হৃদয়-কমলে
জাগ্রত প্রতিষ্ঠা তব,
তোমা সাথে চোখে চোখে মুখোমুখী অন্তহীন অন্তরঙ্গ কথার
দর্শন-স্পর্শন-সুখ-সম্ভোগ আস্বাদ,
অফুরন্ত জ্যোতিঃ-শক্তি-আনন্দের ত্রিবেণী-সঙ্গমে
পরিপূর্ণ আত্ম-বিসর্জ্জন !

ওগো প্রেমময়,
সেই প্রেম নির্ম্মুক্তির স্থির নীলিমায়
লক্ষ বাহু প্রসারিয়া ঊর্দ্ধলোকে ধায়,
বিশ্বের হৃদয় কূলে বহি' আনে অমৃত প্লাবন,
দেবতারা মর্ত্তানরে দান করে স্বর্গের আসন,
যেই প্রেমে মহাব্যোমে আবর্ত্তিত চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা আদি
রক্ষা করি' পরস্পর প্রলয় সংঘাত
ভুবনে ভুবনে বর্ষে দিবা-নিশা-কুসুম-সম্ভার,
বিশ্বজয়ী মৃত্যুজেতা সেই প্রেম খুলে দাও বিশ্বের মানবে।

ওগো ভগবান,
আজি চাহি তোমার মিলন
অন্তর-লক্ষ্মীর সাথে অঙ্গে অঙ্গে চাহি তব প্রেম আলিঙ্গন
মর দেহে মর প্রাণে,
ধমনীর রক্তদোলে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে,
প্রতি কর্ম্মে প্রতি পদে জীবনের বহুধা বিকাশে,
রূপে রসে গন্ধে গানে,

আনন্দে উচ্ছ্বাসে ভাষে রোমাঞ্চ-পুলকে,
বক্ষের যৌবন-মত্ত মদির উল্লাসে
চাহি তব শরীরী পরশ,
চাহি তব পূর্ণ প্রকটন !

হে অসীম,
দাও ধরা সসীমার ব্যগ্র বাহুপাশে
কম্পিত অধরে তার আঁকি দাও অমর চুম্বন
কণ্ঠে দাও মিলনের বৈজয়ন্তী পারিজাত-মালা !

ওগো জ্যোতির্ম্ময়,
যেই অন্ধ গুহা মাঝে পশে নাই আদিম আলোক,
গলিত শবের গন্ধে আকুল পিশাচ আর যত শিবাদল
ভ্রমে মহাসুখে,
অচলায়তনরূপী সে পাতালপুরে
সত্যের ভাস্কর দীপ্তি হোক্ অভ্যুদিত !

হে পরম,
কত কবি কত ঋষি কত বেদ বেদান্ত পুরাণে
নিরূপি' স্বরূপ তব গাহিল বন্দনা,
শিল্পীর প্রতিভাদীপ্ত লক্ষ তুলিকায়,
ভাস্কর্য্যের চারু প্রতিমায়,
স্থানুশৃঙ্গে গুহাবক্ষে প্রস্তরে পর্ব্বতে,
যত রূপে তব পূজা হ'ল সমাপন,
আজি এসো সর্ব্বরূপে সর্ব্বভূতে সকল সঙ্গীতে
নব সৃষ্টি লাগি'।
মানুষেরে দেবজন্ম-দ্বিজত্ব প্রদানি'
সত্য কর অস্তিত্ব তোমার !

একী অশরীরী দৈববাণী আজি শুনিনু চকিতে,
"আসিতেছি—আসিতেছি
তপোমগ্না আমাবস্যা-রজনীর তপস্যার শেষে।
আসিতেছি সাফল্যের স্বর্ণচ্ছটা-বিচ্ছুরিত
ঊষার উন্মেষে।"

দামিনী আরত্তি দীপে আকাশের গায়
কী অপূর্ব্ব এ আখর !
"মৃত্যু কভু সত্য নহে,
ঝঞ্ঝা নহে জীবনের চরম প্রকাশ !
শান্তি—শান্তি—শান্তি !"

শ্রীবিহারীলাল বড়ুয়া

রবীন্দ্রনাথের প্রতি *

'না' বলিয়া হাসিয়া উড়াতে
পারি না যে 'হাঁ' তোমার ! হয়ত বা লুকানো তাহাতে
হেন ঋদ্ধি, যার তুলনায়
আমাদের জ্ঞানগর্ব্ব মরে লাজে তুচ্ছ নিঃস্বতায়।
বিস্ময়ে পরাণ ভরি উঠে
হেরি যবে তোমা সম অভিজ্ঞের সহজ আনন্দ নাহি টুটে,
তবু জানি, অন্ধ তুমি নহ,
দেখিছ সকলি অহরহ।
সত্য করি কহ মোরে, সুদক্ষিণ নিরিখে তোমার
নিদাঘের দীর্ঘ দিবা, গহন নিশীথ অন্ধকার
কর কি নির্ণয় ?
আত্ম-ভোলা যে করুণা তোমার আননে উথলয়,
কুশাগ্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, শিল্পীর নিখুঁৎ নিপুণতা,
যাহা কিছু রিক্ত হিয়া উল্লসিয়া সবা 'পরে জাগায় মমতা,
—এরা কি লিখিল চারুচিহ্ন তব করতল পরে ?
আঁকিল কি আলিপনা পাখ্‌না-পরাগে
ভীতি-কম্প্র প্রজাপতি তোমার অঙ্গুলি পুরোভাগে
প্রায় মুঠিগত যবে ঝলমল চিত্রপক্ষ তার ?
চেষ্টা তব পূর্ণ হ'লে বুঝি তার ছিল না নিস্তার !

* Sturge Moore-এর To Rabindranath Tagore-নামক কবিতার অনুবাদ।

আত্মার গরিমা
বিজ্ঞজননিরূপিত মহিমার সীমা
উল্লঙ্ঘন করিয়া কি উড়িয়া পলায়,
মুক্তপক্ষে অপ্সরীর প্রায় ?
মহীয়সী প্রচেষ্টার বলে
তারে ধরিবারে গিয়া মোরা শুধু লভি কি কবলে
দুচারিটি সুনীল পালক ?
—আত্মাপলাতক।

সত্য কি অক্ষম মোরা অতি
রূঢ় স্পর্শে অণুমাত্র করিবারে তার কোনো ক্ষতি ?
—রূপমুগ্ধ শিশু যথা পতঙ্গেরে অপটু মুঠিতে
আঁটি আঁটি পারে না আঁটিতে,
বিস্ময় পুলক বিমোহিত,
স্পর্শিবারে দ্বিধান্বিত চিত !
সে পতঙ্গ শোনে যদি প্রেমাকুল আবাহন তার,
সাহসিকা উপযাচিকার
দুর্ব্বার আবেগ ভরে লুটায়ে কি পড়িবে অধরে,
হারা-সুখ ফিরিবে কি ঘরে,
উৎসুক ভাবনা মাঝে মরমের ব্যগ্র প্রতীক্ষায়
লভিতে কুলায় ?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

পুস্তক-পরিচয়

মৌরীফুল—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
"এরা আর ওরা এবং আরও অনেকে"—শ্রীবুদ্ধদেব বসু
(গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স)।
মৃত্তিকা—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র (নাথ ব্রাদার্স, ২৩সি, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট)।

বিভূতিবাবুর উপন্যাস "পথের পাঁচালী" ও "অপরাজিত" প্রকাশিত হওয়া তার প্রতিকূল ও অনুকূল সমালোচনায় ও জয়নির্ঘোষে বাঙ্গলা সাহিত্যাকাশ যে রকম মুখরিত হয়ে উঠেছিল তাতে আমরা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম যে, বিভূতিবাবুর গল্পের দাবীও কম নয়। বোধ হয় সেই শ্রেণীর বাঙ্গলা সাহিত্যামোদীর সংখ্যা অল্পই হবে যাঁরা বহুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত তাঁর উমারাণীর গল্প পড়ে মনে মনে তাঁকে বিজয়মুকুট পরিয়ে দেন নি। অথচ এই উমারাণী সম্বলিত প্রথম গল্পের বই "মেঘমল্লার" যখন প্রকাশিত হল তখন পাঠকের দৃষ্টি তেমনভাবে তার প্রতি আকৃষ্ট হল বলে। মনে হয় নি। এখন বিভূতিবাবুর উপন্যাস সংক্রান্ত তর্ক বিতর্ক স্তিমিত হয়েছে, এই অবসরে তাঁর দ্বিতীয় গল্পের বই "মৌরীফুল" প্রকাশিত হওয়ায় তাঁর গল্পের পরিচয় নেওয়ার সংক্ষিপ্ত অবকাশ উপস্থিত হবার কথা।

মৌরীফুলের উপাদান সংগ্রহ হয়েছে পল্লীগ্রাম ও আমাদের জীবনের সামান্য অনাড়ম্বর ঘটনা-সমাবেশ ক্ষেত্র থেকে। অথচ অনাড়ম্বর ঘটনা সন্ধানের চেষ্টায় মাঝে মাঝে একটু বেশী করেই আড়ম্বর এসে পড়েছে—মেঘমল্লারেও এটুকু বাদ যায় নি। যা হোক্ মৌরীফুলের পল্লীগ্রাম বিভূতিবাবুর হাতের গড়ন পেয়েছে। একদিকে গ্রাম্যতা, অজ্ঞতা, নির্ম্মমতা প্রভৃতির সঙ্গে সরলতা, আতিথ্য, সৌহার্দ্দ্য, প্রীতির অপরূপ সমন্বয়, আর একদিকে উদার গ্রাম্য প্রকৃতির অকুণ্ঠিত সুসার ও অসার দান,—গ্রামের এই রমণীয় পরিচয় বিভূতিবাবুর গল্পে বিফল হয় নি। নদীর ধারের মৌরীর ভরা ক্ষেত থেকে পরিব্যাপ্ত মৌরীফুলের সুতার গল্প আর প্রবাসে মাঠের মাঝখানে ব্রাঞ্চ লাইনের ষ্টেশনের ধারে ষ্টেশনবাবুদের নিরানন্দ বিরল জীবনযাত্রা—এ দুটি চিত্র যে কোন পাঠকের মন মুগ্ধ করবে। প্রথম গল্প মৌরীফুলের নাম থেকেই বইটির নামকরণ। এই গল্পটিতে চরিত্র-গত দ্বন্দ্ব উজ্জ্বল হয়েছে। দরিদ্রের সংসারে গৃহস্থের নির্ম্মমতায় গ্রাম্যবধূ সুশীলার সুকুমার মনোবৃত্তি অন্তর্হিত হয়েছিল; স্বামী-কিশোরীর বিবাহিত জীবনের প্রথম উত্তপ্ত অনুরাগ অকালেই গ্রামের তাস পাশা ও যাত্রার আড্ডায় সমাধিস্থ হওয়াই তার প্রধান কারণ। শ্বশুর শাশুড়ীর হাতে নির্য্যাতনের অন্ত ছিল না, স্নেহের কাঙাল সুশীলা এই নির্য্যাতনের ফলে নিজেও হয়েছিল মুখরা, কাণ্ডজ্ঞানহীন। এ সত্ত্বেও সুশীলা তার স্বামীর হারানো প্রণয় পুনর্জ্জীবিত করবার জন্য চেষ্টা করতে ছাড়ে নি, কিন্তু যে আদর সোহাগ একদিন আপনা থেকেই নিঃসৃত হয়েছিল আজ তার কাঙাল হতে গিয়ে লাঞ্ছনাই সার হল। বিক্ষুব্ধ ভীত সুশীলা অতঃপর লোভে পড়ে যা করে বসল তার পরিণাম হল অনুচিত অখ্যাতি ও অকালমৃত্যু। এই করুণা-বঞ্চিত, অত্যাচারিত, অন্তর্বেদনাপূর্ণ গ্রাম্য বধূটির জন্য সকল পাঠকেরই হৃদয় আর্দ্র হয়ে উঠবে, সন্দেহ নেই,—অথচ বিশেষ করে কাউকে দোষ দিতেও মন সায় দেবে না। শ্বশুর

শাশুড়ীর সামান্য বিবেচনার অভাব, নিষ্কর্ম্মা গ্রাম্য যুবকের স্ত্রীর প্রতি নির্ম্মম অমনোযোগিতা ও সমস্ত সমাজের একটা কর্ম্মনাশা নিস্পন্দতা আজও আমাদের জীবনের সম্মিলনে [illegible]াসার অন্তরাল সৃজন করে রেখেছে,—দোষ তারই।

অন্য গল্পগুলির মধ্যে "রোমান্স"টিও অনেককে মুগ্ধ করবে। দুই বোনের বালিকা-মনের ঈষৎ প্রেমের ইসারা ও তারতম্য এই গল্পটিকে রঙীন ও সুষমা-মাণ্ডিত করেছে। 'রাক্ষসগণ'-এ সেবাপরায়ণ রেণুর নিঃস্বার্থ রমণীসুলভ অন্তরঙ্গতার চিত্র পাঠককে অন্যমনা করবে। দুঃখের বিষয় এ তিনটি ছাড়া বইটির বাকি সাতটি গল্পের মধ্যে আর কোনটি উল্লেখযোগ্য নয়। 'জলসত্র', 'খুঁটিদেবতা', 'প্রত্নতত্ত্ব', 'গ্রহের-ফের' প্রভৃতি হয় অতি-কল্পিত, নয় গল্পের উপযুক্ত উপাদানের অভাবে নিরর্থক পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়েছে। এতে বইটি বড় অসম প্রকৃতির হয়েছে।

"গ্রহের ফের" সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। এর নায়ক অধ্যাপক রাজচন্দ্রবাবুর গাণিতিক প্রতিভা প্রতিষ্ঠা করবার আগ্রহাতিশয্যে তাঁকে করা হয়েছে এক ধূমকেতুর ভবিষ্যদ্বাণীকার। লেভেরিয়ে ও অ্যাড্যাম্‌স্ কর্ত্তৃক নেপচুন গ্রহের ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধ হয়ে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ থিওরীর জয়জয়কার হয়েছিল বটে, কিন্তু ধূমকেতুর সংখ্যা অতি নির্দ্দিষ্ট ও তাদের আবিষ্কারকদের নাম জগদ্বিখ্যাত, তার মধ্যে একটি বাঙ্গালীরও নাম পাওয়া যায় না। এ হেন গল্পের অবতারণা করে লেখক রাজচন্দ্রবাবুকে 'বিরিঞ্চি বাবা'র সমকক্ষ করে তুলেছেন। যা অতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্যকে খণ্ডন করে বা যা সর্ব্বজনবিদিত নজিরকে নাকচ করে তা নিয়ে গম্ভীর গল্প উপন্যাস রচনা সম্বন্ধে আমার আপত্তি নিবেদন করি।

১৯০৪ খ্রীঃ অব্দে কোন বাঙ্গালী এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গে উঠেছিল বা ব্র্যাড্‌মানের রেকর্ড স্কোরিংকে পরাভূত করেছিল—এ নিয়ে কি গম্ভীরভাবে গল্পরচনা চলতে পারে? বলা বাহুল্য অন্য হিসেবে গল্পটি অসাধারণ হয়েছে। রাজচন্দ্রবাবুর তন্ময়তা ও মস্তিষ্ক-বৈকল্য মনকে যেমন মুগ্ধ করে, তেমনি ধূমকেতুটির আবিষ্কারের উদ্যোগ ও সাফল্যও মনকে নিগূঢ়ভাবে অভিভূত করে।

আর এক কথা বলাও প্রয়োজন মনে করি। মৌরীফুল গল্পে সুশীলার অপমৃত্যু অত্যন্ত অস্বাভাবিক হয়েছে—একেবারে দায়ে পড়ে খুন করা। 'রাক্ষসগণ' গল্পে রেণুর অকাল-বৈধব্য-ফল থেকে নিজে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য নায়কের উল্লাস—সার্থক নয়, রূঢ় হয়েছে। যদি গ্রন্থকার নায়ককে এই উল্লাসের উপযোগী করে গড়তেন,—ইতর বা হৃদয়হীন করতেন, সে আলাদা কথা, পক্ষান্তরে তিনি করেছেন তাকে রেণুর অন্তরঙ্গতায় মুগ্ধ। বিভূতিবাবুর মত পাকা লেখকের কাছ থেকে এসব কাঁচা হাতের কাজ একটু বিসদৃশ লাগে।

বিভূতিবাবুর বিভিন্ন গল্পগুলির কথা ছেড়ে দিয়ে এখন বোধ হয় তাদের সম্বন্ধে মোটামুটি হিসাব নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। আমার মনে হয়েছে বিভূতিবাবুর পল্লীজীবন বা আমাদের অবান্তর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জীবনাবলীর চিত্র খুব নিখুঁৎ, রমণীয় কিন্তু অনতিগভীর,—surface deep। যদি শরৎবাবুর লেখার সঙ্গে তুলনা ক্ষমার্হ হয় তবে বলা চলে যেখানে বিভূতিবাবু নম্র সুষমাময় ও অনতিগভীর সেখানে শরৎবাবু কত সতেজ কত জীবন্ত কত বিশিষ্ট কত গভীর হতেও গভীরতর!

নানা কারণে বুদ্ধদেববাবুর নূতন উপন্যাস "এরা আর ওরা এবং আরও অনেকে" সন্দিগ্ধচিত্তে গৃহীত হবে। এতে অবিবাহিত বাঙ্গালী যুবক যুবতীদের যে অবাধ

মেলামেশা ও প্রেমালাপের ছবি দেওয়া হয়েছে তাতে পাঠককে হতভম্ব হতে হয়। বোধ হয় মানুষের স্বভাবের এটা একটা বৈশিষ্ট্য যে সমাজের শাসন ... গ্রাহ্য ... কোন শিথিল ব্যবহার বহুদিন ধরে আয়ত্ত না করলে তার সম্বন্ধে অসঙ্কোচে স্বাধীন আলোচনা করতে দ্বিধা বোধ হয় কিন্তু 'এরা আর ওরা'র পাত্র-পাত্রীরা যে রকম অসঙ্কোচে শিথিল প্রেম ও দৈহিক কামতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হয়েছেন তাতে বাঙ্গলার মার্জ্জিত সেট্‌কে স্বাধীন প্রেম সাধনায় বহুযুগ সিদ্ধ বলতে হয়। গল্পে উপন্যাসে কল্পনাশক্তিকে কতখানি মুক্তি দেওয়া সম্ভব বা তাতে সমাজের অলঙ্ঘনীয় গণ্ডীকে কতখানি স্বীকার করে নিতে হয় তা সাহিত্যের বৈয়াকরণিকরা বিচার করবেন। আমার কিন্তু আশা হয় যে অনেকেই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে এরা আর ওরার যুবক যুবতীদের অসংযমে পাঠকের মন সায় দেবে না। আধুনিক মার্জ্জিত সেট্‌রা যদি কালচার কৌলিন্যে পাকা হয়ে সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবার চেষ্টা করে তবে সমাজ এই সেট্‌কে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিষ্কৃতি দেবে না। অতএব যেখানে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ছবি আঁকা হবে সেখানেই সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিশোধের ছবি দেখাতে হবে,—ইঙ্গিতেই হোক বা স্পষ্ট করেই হোক। এটা গল্প বা উপন্যাস লেখকের অবশ্যকর্ত্তব্য! পক্ষান্তরে সমাজের পটভূমিকাকে একেবারে বিলোপ করে সখের পাত্র-পাত্রীদের অবতারণা হতে পারে না, যদি না তা ব্যাপক হয়।

এটুকু বাদানুবাদ ত্যাগ করলে "এরা আর ওরা" সম্বন্ধে অনেক গণ্ডগোল মিটে যায়। যদি মেনে নেওয়া যায় যে বাঙ্গলা সমাজের মার্জ্জিত সেট্-এর পক্ষে সব রকম পরিপক্কতাই স্বাভাবিক তা হলে "এরা আর ওরা"র শর্ব্বরী, অতনু, সাবিত্রী, অমিতা ও লুসী, ললিতাদের বরণ করতে বাধবে না—অন্ততঃ তাদের স্পর্দ্ধা, আত্মম্ভরিতা ও তথাকথিত মার্জ্জিত রুচির চাকচিক্যের জন্য।

বইটির একটি প্রশংসনীয় জিনিষ তার অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গের উপকরণ। এটাও মানতে হবে যে, যে আধুনিক রীতিতে ইউরোপীয় সাহিত্যে ঘটনা সন্নিবেশের বদলে চিত্তের আবর্ত্তময় গতিকে অধিকতর প্রকট করা হচ্ছে, বাংলা ভাষায় সে রীতির পরিকল্পনায় বুদ্ধদেববাবু অগ্রণী ও ওস্তাদ। তা হলেও সাহিত্যের রূপ ও রসসৃষ্টিতে বুদ্ধদেববাবুর মনে শৈথিল্য এসেছে মনে হয়।

উপরোক্ত দুইখানি বই শেষ করে কেউ যদি প্রেমেন্দ্র মিত্রের নূতন গল্পের বই "মৃত্তিকা" পড়েন ত নিশ্চয় স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়বেন। গুণগ্রাহী পাঠকমাত্রেই জানেন যে প্রেমেন্দ্রবাবু গল্পলেখায় ধ্রুব প্রেরণা লাভ করেছেন; "মৃত্তিকা" পড়ে সে ধারণা একটুও ক্ষুণ্ণ হবে না। তাঁর ভাষায় যেমন বাইরের চাকচিক্য নেই, তেমনি গল্পের সঙ্গেও তার বিরোধ নেই। ভাষার ও গল্পের এই নিবিড় সংযোগ বিশেষ ক্ষমতার পরিচায়ক। বহুল পরিমাণ সংযম ও রস না থাকলে এটা ঘটে ওঠা সম্ভব হয় না। তাঁর চরিত্রগুলিও বৈচিত্র্যময়;—যে সব চরিত্র বাঙ্গলা সাহিত্যে উপেক্ষিত ও অজানা ছিল তাদের তিনি খুঁজে বার করে সমুজ্জ্বল, সার্থক ও আমাদের আত্মীয় করে গড়েছেন। গল্পগুলির মধ্যে বোধ হয় 'মৃত্তিকা'ই বরমাল্য পাবে;—এতে ধীরে ধীরে পাঠকের মনকে নিয়ে গিয়ে হৃদয়-রহস্যের এক নিবিড় কন্দরে হাজির করে। "সুরু ও শেষের" তুল্য অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য আধুনিক বাঙ্গলা গল্পে অতি অল্পই চোখে পড়ে। "শবযাত্রা"র শবযাত্রীদের বিভিন্ন মনোভাব মানবমনের দু'একটি গুপ্ত দ্বারোদ্ঘাটন

করেছে। "প্রতিবেশিনী"র ম্যাট্রিক পাশ বিমলার স্নেহার্দ্র উদ্দাম হৃদয় দরদী মনে অহৈতুকী করুণার প্রতিধ্বনি জাগাবে। সমাজ এই বালিকার আচরণ বুঝবে না কিন্তু প্রেমেন্দ্রবাবুর পাঠকের কাছে তা অবোধ্য থাকবে না। প্রেমেন্দ্রবাবুর এই সব গল্পে নিশ্চয় কোথাও কোনও ত্রুটি আছে কিন্তু সে সকল ত্রুটির কথা উত্থাপন করবার প্রয়োজন হবে না যদি তিনি আমাদের মনে যে আশার সঞ্চার করেছেন তা আধুনিক অন্যান্য গল্প-উপন্যাস-লেখকদের মত অকালে বিনাশ না করেন।

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

The Necessity of Communism.—BY JOHN MIDDLETON MURRY, Jonathan Cape, 136 pages. 3s. 6d.

On Marxism To-day.—BY MAURICE DOBB, No. 10 of the Day to Day Pamphlets. Published by Leonard and Virginia Woolf. The Hogarth Press, 48 pages. 1s. 6d.

The Teachings of Karl Marx.—BY V. I. LENIN, No. 1 of the Little Lenin Library, Martin Lawrence, Ltd. 48 pages. 9d.

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কার্ল্ মার্ক্স্ মানুষের ইতিহাসের যে একটি বিশেষ ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিলেন আধুনিক কমিউনিজ্‌ম্ বা সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা তারই উপর। তাঁর মতবাদ বহুদিন পর্য্যন্ত উপেক্ষিত হয়েছিল কারণ সম্পূর্ণ অভিনব চিন্তা-ধারার প্রতি সাধারণ লোকের অবজ্ঞা স্বাভাবিক। প্রচলিত ধারণা ও সুপ্রতিষ্ঠিত বিধি-ব্যবস্থার বিষয়ে প্রশ্ন বা তর্ক না করাই নাকি প্র্যাক্‌টিকাল্ মানুষের লক্ষণ। যে মূলসূত্রগুলির উপর নির্ভর ক'রে সমসাময়িক সমাজ গড়ে উঠেছে সে সমস্ত নির্ব্বিচারে মেনে চলা এই মনোভাবের ভিত্তিস্বরূপ। কিন্তু যখন আর্থিক পরিবর্ত্তন অথবা অন্য কোন বিপ্লবের সূত্রপাত হয় তখন চিরাভ্যস্ত বিশ্বাসেও নাড়া পড়ে—তখন বাধ্য হয়ে সকলকেই রাষ্ট্র ও সমাজের ব্যবস্থার প্রতিকূল সমালোচনা কিম্বা যুক্তিসঙ্গত সমর্থনের চেষ্টা দেখতে হয়। গত মহাযুদ্ধের পর পাশ্চাত্য জগতে মার্ক্স্-তত্ত্বের বিশদ চর্চ্চা এই সাধারণ নিয়মের উদাহরণ।

ইংল্যাণ্ডে এই নূতন উদ্যমের আধুনিকতম দৃষ্টান্ত হিসাবে আলোচ্য বই তিনখানির নাম করা যেতে পারে। লেখক তিনজনই খ্যাতনামা—পুস্তকগুলি সুখপাঠ্য না হলেও শিক্ষাপ্রদ। আজকাল সাহিত্যিক-সমাজে মিড্‌ল্‌টন্ মারির সুনাম আছে; সম্প্রতি ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্ট লেবার পার্টিতে যোগ দিয়ে লেখা ও বক্তৃতার সাহায্যে তিনি প্রবল উৎসাহে প্রচার-কার্য্যে নেমেছেন এবং সেই অভিজ্ঞতাই সাম্যবাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর বই লেখার হেতু। মরিস্ ডব্ শিক্ষক ও সুপণ্ডিত; তাঁর নব্য রাশিয়ার আর্থিক ইতিহাস তাঁকে সুপরিচিত করেছে। মার্ক্সের ভক্ত হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধ, তাই গুরুর মতামত সম্বন্ধে তাঁর পুস্তিকাখানি প্রণিধানযোগ্য। লেনিনের পরিচয় সর্ব্বজনবিদিত; মার্ক্সের মতবাদ বিষয়ে তাঁর ছোট গ্রন্থটি রুষভাষায় একটি বিশ্বকোষের অন্তর্গত। প্রবন্ধ হিসাবে ১৯১৪ সালে নির্ব্বাসনে লিখিত হয়। মস্কোর লেনিন্-ইন্‌ষ্টিটিউট্

সম্পাদিত লেনিনের গ্রন্থাবলীর ইংরাজি অনুবাদ মার্টিন্ লরেন্স্ লিমিটেড ত্রিশ
প্রকাশ করছেন। সময়সাপেক্ষ সেই কাজ সম্পন্ন হবার আগেই লেনিনের
লেখাগুলি বহুল প্রচারের জন্য স্বতন্ত্রভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকার আকারে মুদ্রি
স্থির হয়েছে।

মিড্‌ল্‌টন্ মারির প্রধান বক্তব্য তাঁর বইখানির বিজ্ঞাপন ও মুখবন্ধে
কথায় পাওয়া যায়। তাঁর মতে ইংল্যাণ্ডে সাম্যতন্ত্র স্থাপন অবশ্যম্ভাবী। সাম্যবাদ
তাঁর স্বদেশের ধ্বংসোন্মুখ সমাজের উদ্ধারের অন্য আশা নেই। কিন্তু কমিউনি
যে আকারে আজ পৃথিবীতে পরিচিত—সেই রুষদেশজাত বল্‌শেভিজ্‌মের অমা
রুদ্ররূপ বরণ করা ইংরাজদের পক্ষে অসম্ভব। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার যে অরা
বল্‌শেভিক্ বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল সুসভ্য সংযত ইংল্যাণ্ডের পক্ষে তার অনুরূপ
মিড্‌ল্‌টন্ মারি অভাবনীয় মনে করেন (১০৭ পৃষ্ঠা)। মস্কোর উপদেশ ইংল্যা
অনুকরণযোগ্য নয়। অতএব সে-দেশে নব-সাম্যবাদের প্রয়োজন আছে এবং
অভাবই মিড্‌ল্‌টন্ মারি পূর্ণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস মার্ক্সের
তাঁর মতভেদ নেই—তিনি নিজেকে মার্ক্সের শিষ্যরূপেই গণ্য করেন। লেনি
প্রচারিত মার্ক্স-তত্ত্বের বিশ্বজনীনতা অস্বীকার ক'রে ইংল্যাণ্ডে অন্ততঃ নূতন প্রণালী
সাম্যতন্ত্র গড়ে তুলবার স্বাধীনতার দাবী মিড্‌ল্‌টন্ মারির প্রধান উদ্দেশ্য।

লেখার স্বচ্ছতা, ভাবার আবেগ ও লেখকের আন্তরিকতা মারির বইখানি
উপভোগ্য করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অর্থশাস্ত্রবিশারদ কীন্‌সের মতখণ্ডন (১১৪, ১
পৃষ্ঠা), লণ্ডন স্কুল্ অব্ ইকনমিক্‌সের সমালোচনা (১২১ পৃষ্ঠা) এবং ব্রিটিশ শ্রমি
নেতাদের প্রতি বিদ্রূপ (৮০, ১০০ পৃষ্ঠা) উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য গ্রন্থে তি
ভাবের ধারা নির্দ্দেশ করা সহজ। তার মধ্যে সাম্যতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবিতা ও সাম্যবাদে
ইংরাজি সংস্করণের চেষ্টা সম্বন্ধে অনেক কথা স্বতঃই মনে আসে। কিন্তু গ্রন্থকারে
আধ্যাত্মিক আলোচনা—যীশুর জীবনের একটি বিশেষ ব্যাখ্যা—মানুষের জীবনে
জড়জগতের বহিঃস্থিত শক্তির প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে সমালোচকের কিছুই বলবার নেই
ধর্ম্ম-প্রধান বিশ্বাস তর্কের বাইরে। মার্ক্সের নৈর্ব্যক্তিক যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণ-প্রণা
সঙ্গে মারির দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য প্রথমেই চোখে পড়ে। ধনিক ও শ্রমিকের সজ
সমস্যায় মারি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের শ্রেণীগত স্বার্থ পরিহার ক'রে শ্রমিকদে
সঙ্গে যুক্ত হবার উপদেশ বারবার দিয়েছেন। সন্দেহ হয় যে এই বিপুল আত্মবিসর্জনে
বাণীর উৎস আত্মার কল্যাণ বা মানসিক শান্তির সন্ধান। সাম্যবাদে বিশ্বাস কর
পারলে ডি এইচ্ লরেন্সের জীবন, মারির মতে, ট্র্যাজেডিতে পরিণত হত না (১২
১৩০ পৃষ্ঠা)।

বর্ত্তমান ধনিক-সমাজের অনিবার্য্য পরিণতি সাম্যতন্ত্র—মিডল্‌টন্ মারি মার্ক্সে
এই বিশ্বাসের পুনরাবৃত্তি করেছেন বটে কিন্তু তাঁর লেখাতে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা
ও যুক্তিপ্রয়োগের অভাব থেকে গেছে। শুধু ইংল্যাণ্ডের সমস্যার পরিধির ভিতর তাঁ
চিন্তা আবদ্ধ এবং সমাজের পুনর্গঠনে যাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে তাদের লক্ষ্য করে
তাঁর বই লেখা একথাও তিনি অস্বীকার করেন নি। অবশ্য ধনতন্ত্র মানব-সভ্যতাকে
আত্মহত্যার পথে নিয়ে চলেছে সপ্তম পরিচ্ছেদে একথা বোঝাবার চেষ্টা আছে
হেন্‌রি ফোর্ড্ প্রচারিত সুনিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্রের আদর্শে যুক্তির ফাঁকটুকু ৬৬-৬৭ পৃষ্ঠায় ধ

পড়েছে—ডিট্রয়টের শ্রমিকদের উন্নতির ফল দেখা যায় কভেন্ট্রির বেকারসংখ্যার বৃদ্ধিতে।
এইচ্ জি ওয়েল্‌স প্রভৃতির 'বুর্জোয়া' আন্তর্জাতিকতার ভ্রান্তি ও নিষ্ফলতা প্রদর্শিত
হয়েছে (৭০ পৃষ্ঠা)। তবুও মারির বইখানিতে মার্ক্সের মূলসূত্রগুলি সম্যক্ আলোচিত
হয়েছে বলা চলে না। মানুষের ইতিহাসের ভিত্তি শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষে—যে কোন যুগের
প্রচলিত চিন্তার ধারা ও সাধারণ মতামত এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ সেই যুগের প্রভুশ্রেণীর
স্বার্থপ্রণোদিত—শ্রেণীবিশেষের প্রভুত্বের বিরোধী শক্তির অভ্যুত্থান সুনিশ্চিত—ভবিষ্যতে
শ্রেণীবর্জ্জিত সমাজ প্রতিষ্ঠাতেই এই সংগ্রামের অবসান—মার্ক্সের এই সকল মত
মরিস্ ডব্ ও লেনিনের পুস্তকে এবং লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে
যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে; ধনতন্ত্র যে মানুষের ন্যায়বুদ্ধিকে পদে পদে আঘাত করে একথা
বার্ণার্ড্ শ তাঁর সোশ্যালিজ্‌মের ব্যাখ্যায় যেমন ক'রে পরিস্ফুট করেছেন;—মিডল্‌টন্
মারির লেখাতে তার পরিচয় নেই। তিনি নিশ্চয় এ সব বিশ্বাস করেন, কিন্তু অন্যকে
বোঝাবার চেষ্টার অভাব পাঠকের মনকে পীড়া দেয়। ধনতন্ত্র অচল হলেই যে সাম্যতন্ত্র
স্থাপিত হবে এর স্বপক্ষে যুক্তিপ্রদর্শনের দায়িত্ব লেখকের। ভুল্‌লে চলবে না যে
কমিউনিজ্‌ম্ ছাড়াও অন্যপ্রকারের সোশ্যালিজ্‌ম্ সম্ভব। মারি সে সম্বন্ধে একটি
কথাও বলেন নি। আলোচনার ক্ষেত্র সংকীর্ণ করবার পর বইখানির 'সাম্যবাদের
প্রয়োজনীয়তা' নামকরণ সঙ্গত হয় নি বলতে হবে।

মার্ক্সের মতের সত্যাসত্য যাই হোক না কেন তার একটা বিশিষ্ট রূপ আছে।
মিড্‌ল্‌টন্ মারি নিজের মনের সঙ্গে সামঞ্জস্যের চেষ্টায় তার বিকৃতি ঘটিয়েছেন ব'লে
আমার বিশ্বাস। এই বিকারের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মারির বইএর একটি প্রধান প্রতিপাদ্য
বিষয়ে পাওয়া যায়। তাঁর মতে ইংল্যাণ্ডে বিনা বিপ্লবে সাম্যতন্ত্র স্থাপন সম্ভব।
মত সমর্থনের জন্য এঙ্গেল্‌স্-এর রচনা থেকে যে অংশ তিনি উদ্ধৃত করেছেন (১২৭
পৃষ্ঠা) তার পরবর্ত্তী অংশটুকু বোধহয় তিনি বিস্মৃত হয়েছেন। মারির বিশ্বাস হয়ত
সত্য প্রতিপন্ন হতে পারে কিন্তু তাকে মার্ক্সের মত ব'লে প্রচার করা উচিত নয়।
কার্ল্ কাউট্‌স্কির সঙ্গে তর্কযুদ্ধের সময় লেনিন্ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে
ধনিকশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য বলপ্রয়োগের প্রয়োজন সম্বন্ধে মার্ক্সের দৃঢ়-
বিশ্বাস ছিল। এই ধারণা আধুনিক সাম্যবাদীদের মনে বদ্ধমূল। সশস্ত্র বিপ্লবের
প্রতি মিড্‌ল্‌টন্ মারির বিতৃষ্ণা জার্ম্মান সোশ্যাল্ ডিমোক্রাট্‌দের মতের অনুরূপ।
মরিস্ ডব্ লিখেছেন (৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা)—বের্ণ্‌ষ্টাইনের যে "সংশোধিত" সাম্যবাদ ইউ-
রোপে প্রতিপত্তি হারিয়েছে ইংল্যাণ্ডে নবীন বুদ্ধিজীবিগণ তারই পুনরাবৃত্তি করছেন।

মারির মতে বিরাট ব্রিটিশ শ্রমিকদলকে মার্ক্স্-মন্ত্রে দীক্ষিত করাই সাম্য-
বাদীদের প্রথম কর্ত্তব্য। তারপর পার্লামেণ্টে শ্রমিকদলের সংখ্যাধিক্য হলেই
সাম্যতন্ত্রের গোড়াপত্তন হবে। মার্ক্সের গোঁড়া শিষ্যদের দৃঢ়বিশ্বাস এ আশা অমূলক।
মারির ধারণা যে ইংল্যাণ্ডে ইটালীয় ফ্যাসিজ্‌ম্ বা জার্ম্মাণীর নাজি-আন্দোলনের
অনুরূপ শাসক-শ্রেণী-পরিচালিত কোন সশস্ত্র বাধা সোশ্যালিজ্‌মের পথরোধ করবার
চেষ্টা করবে না। প্রকৃত মার্ক্স্-তত্ত্ব অনুসারে এই নির্ভরশীলতার কোন হেতু
নেই।

মিড্‌ল্‌টন্ মারির নিজের বিশ্বাসকে মার্ক্স্-প্রদর্শিত পন্থা ব'লে প্রচারের প্রতিবাদ
করা আমার এই সুদীর্ঘ সমালোচনার উদ্দেশ্য। তাঁর আর একটি ভ্রান্তির উল্লেখ ক'রে

আমি এ প্রসঙ্গ শেষ করব। মার্ক্সের জীবনের নিঃস্বার্থপরতা তাঁর মতের আংশিক ভাবে অপ্রমাণ করে এ মন্তব্য নিরর্থক—কেননা স্বার্থবুদ্ধি সকল শ্রেণীকে করে এই কথার অর্থ এ নয় যে প্রতি শ্রেণীর প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বার্থপর। সকল আপত্তি সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে মারির বইখানি অত্যন্ত ইংল্যাণ্ডের চিন্তাশীল লোকেরা যে যুগসমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছেন—আলোচা তার সুন্দর নিদর্শন। লেখার গুণে মারির বইখানি অনেক পাঠককে অবস্থা সম্বন্ধে ভাবতে শেখাবে—কোন লেখকের পক্ষে এর চেয়ে বেশী খুঁজে পাওয়া সহজ নয়।

মরিস্ ডবের নূতন বইখানির বিরুদ্ধে আমার আপত্তি তার প্রাঞ্জলতার বইখানির ক্ষুদ্র আয়তনই বোধহয় এর জন্য দায়ী। কোন কোন প্রসঙ্গে এবার গোঁড়া মার্ক্স-পন্থীদের বিরাগ-ভাজন হবেন ব'লে আশঙ্কা হয়। কিন্তু বইটিতে অল্পের ভিতর মার্ক্সের মূলতত্ত্বগুলির আলোচনা শিক্ষাপ্রদ হয়েছে যেতে পারে যদিও কমিউনিজম্ সম্বন্ধে ল্যাস্কির লেখার সরসতা ও প্রসাদগুণ এ নেই। ইতিহাসের যে ব্যাপক ব্যাখ্যা সম্ভব ও আবশ্যক এবং ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণার যেটি বৈশিষ্ট্য মরিস্ ডব্ তা সযত্নে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

লেনিনের পুস্তিকাটি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমে কার্ল্ মার্ক্সের জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়; তারপর তাঁর মতবাদের বিবরণ; পরিশেষে মার্ক্স সম্বন্ধে সকল প্রধান প্রধান লেখার তালিকা। ইংরাজিতে সাম্যবাদ সম্বন্ধে এই গ্রন্থই প্রামাণ্য স্বীকৃত হবে সন্দেহ নেই। মরিস্ ডব্ পর্য্যন্ত অনেকাংশে লেনিনের অনুসরণ করেছেন।

হেগেলের দর্শন থেকে মার্ক্সের চিন্তাধারার উৎপত্তি। কিন্তু যেখানে 'আইডিয়া'র লীলা দেখেছিলেন, ফয়রবাকের প্রভাবে মার্ক্স সেখানে দেখলেন জড়শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত। সমাজের পরিবর্ত্তনের মূলসূত্রও মার্ক্স হেগেলের dialectics-এর পেয়েছিলেন—thesis, antithesis ও synthesis-এর রূপ তিনি সমাজের বিবর্তন ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করলেন। এর থেকে মার্ক্সের বিশ্বাস হ'ল যে মানুষের ইতিহাস যুগে যুগে শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের বিভিন্ন রূপ প্রকাশ ক'রে আসছে ও তদনুসারে মানুষের সমাজ ও চিন্তার আকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। প্রত্যেক যুগে শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে শাসিত-শ্রেণীর বিদ্রোহ মাথা তুলতে বাধ্য এবং সে সঙ্ঘর্ষের ধ্রুব পরিণাম শ্রেণীভেদের উচ্ছেদ অথবা সাম্যতন্ত্র। অর্থনীতির আলোচনা ক'রে মার্ক্সের সিদ্ধান্ত হ'ল শ্রমিকই সমস্ত ধনোৎপাদনের মূল, কারণ আমরা যাকে মূলধন বলি শারীরিক ব্যতীত তার উৎপত্তি অসম্ভব। অথচ শ্রমিকেরা তাদের শ্রমের যথার্থ মূল্য পায় না বিনামূল্যে এই অতিরিক্ত ধনোৎপাদনই ধনতন্ত্রের প্রধান অবলম্বন। রাষ্ট্রশক্তি নিরপেক্ষ নয়—ধনিকের স্বার্থসিদ্ধি মাত্র তার উদ্দেশ্য; এমন কি গণতন্ত্রেও তার অন্যথা হয় না। সেইজন্য স্বল্পসংখ্যক সাম্যবাদীদের নেতৃত্বে বলপূর্ব্বক সমাজের পরিবর্ত্তনের চেষ্টা মার্ক্স-নির্দ্দিষ্ট পন্থা।

এই সকল মত খণ্ডনের চেষ্টা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। লেনিন্ ও মরিস্ মার্ক্স সম্বন্ধে অখণ্ড বিশ্বাস কিন্তু তাঁদের লেখা পড়ে তাঁদের উৎসাহ অন্য সংক্রামিত হবে কিনা সন্দেহ। অল্পের ভিতর মার্ক্সের মতের পরিচয় এবং সে অস্পষ্ট ধারণা দূরীকরণই তাঁদের বই-এর সার্থকতা।

মরিস্ ডবের দৃঢ় বিশ্বাস যে সাম্যবাদ ভিন্ন অন্য প্রকার সোশ্যালিজমের ভবিষ্যতে কোন আশা নেই। আজকাল তাদের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের উদারনৈতিক দলের বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। তাঁর শেষ কথাগুলি উল্লেখযোগ্য—

"Indeed, apart from Historical Materialism, what other than a petulant desire for newness should demand a transformation of the basis of the existing social order? Save as Marxist Socialism or Communism, Socialism seems emphatically to have no future as an historical force. . . . . It is hard to deny that of most of the significant events of recent history the Marxist has made sense where ordinary bourgeois thought has made wrong forecast or has found only bewilderment. . . . . . Was the pre-war Marxist analysis of capitalism and war or that of the *Great Illusion* the more realistic? . . . . . There are points in history when traditional concepts come into conflict with contemporary experience; and at such times wise men think that history has gone mad. But it is thought, not history, that is unreasonable, and only the barrenness of thought that thinks otherwise."

শ্রীসুশোভন সরকার

Alexanderplatz.—By Alfred Doblin (Martin Secker).
Etzel Andergast.—By Jacob Wassermann (George Allen & Unwin, Ltd.).

বর্ত্তমান জার্ম্মান এক্সপ্রেশনিষ্ট লেখকদের একজন অগ্রণী হচ্ছেন আলফ্রেড্ ডাবলিন্। বার্লিনের এই চিকিৎসক-লেখক ঐতিহাসিক উপন্যাস "ভালেনষ্টাইন" লিখে সুবিখ্যাত হন। "আলেকজাণ্ডারপ্লাৎস্" উপন্যাসখানি তাঁর এক্সপ্রেশনিষ্ট লেখন রীতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

বার্লিনে আলেকজাণ্ডারপ্লাৎস্ নামে একটি জায়গা আছে, সেটি নগরের সম্ভ্রান্ত সভ্য পল্লীকে চোর, ডাকাত, খুনী, বদমায়েসের বস্তি হতে বিভিন্ন করেছে; সহরের দুই বিভিন্ন জাতের মধ্যভূমিতে মানবজীবনের আলো-অন্ধকারের দ্বন্দ্বময় ইতিহাস হচ্ছে এই উপন্যাসখানি, সেজন্য ডাবলিন উপন্যাসের নাম দিয়েছেন শান্ত সভ্য নগর ও underworld-এর মধ্যবর্ত্তী স্কোয়ার আলেকজাণ্ডারপ্লাৎস্।

উপন্যাসের আরম্ভ হচ্ছে: ফ্রান্ত্স্ বিবারকফ্ নামে এক বার্লিনের মজুর টেগেল জেল থেকে ছাড়া পেয়ে পথে বাহির হয়েছে, বার্লিনের জনতাভরা পথ, তার কাজ নেই, বন্ধু নেই, অন্তরে শান্তি নেই; কিন্তু সে সৎ জীবন যাপন করতে মনস্থ।

ফ্রান্ত্স্ খবরের কাগজ বেচবার কাজ নিলে; তার মেয়ে-বন্ধু হল; নারীর প্রেমে জীবন আনন্দিত হল। তার সঙ্গীরা তাকে প্রলুব্ধ করে চুরি করবার জন্যে, একবার দলে পড়ে সে চুরি করার সহায় হল, কিন্তু নিজের অনিচ্ছায়, অজ্ঞাতসারে। সে বিশ্বাস-ঘাতক হতে পারে ভেবে চোরের দলের সর্দ্দার তাকে চলন্ত মোটরগাড়ী থেকে ঠেলে ফেলে দিলে; যদি সে মরে যায়, তাদের চুরির সাক্ষী থাকবে না। সে মরল না, তার

একটি হাত ভেঙে গেল, কিন্তু তার অন্তর এ আঘাতে দমল না; সে জীবন-সংগ্রাম আবার নতুন করে আরম্ভ করলে, সে যোদ্ধা, সে আলোর পূজারী, অন্ধকারকে জয় করবে।

চোরের দলের সর্দ্দারকে সে ক্ষমা করলে। সে এক প্রণয়িনী লাভ করল, তার অনুরক্তা সেবিকা; সেই প্রেমই তার শক্তি, তার জীবনের অঙ্গ। কিন্তু তার এক বদমায়েস বন্ধু তার বান্ধবী মিত্‌সেকে ভুলিয়ে এক বনে নিয়ে গেল; মিত্‌সে তাকে ভালবাসে না, সে কামুকের প্রস্তাবে রাজী হল না; কামোন্মত্ত রাইনহোল্ড মিত্‌সেকে খুন করলে, বনের এক গহ্বরে মৃতদেহ পুঁতে পালাল।

এই নিদারুণ আঘাত ফ্রান্ত্‌সের বুকে বড় বেদনায় বাজল, তার প্রেমকে তার বিশ্বাসঘাতক বন্ধু হত্যা করলে। কিন্তু তবু ফ্রান্ত্‌স্ বিবারকফের আত্মা হার মানল না; অন্ধকারের অনুচরেরা তাকে ভুলাতে চায়; বেদনায় তার অন্তর ভেঙে গেল কিন্তু মানবাত্মা জয়ী হল।

গল্পটি সুখপাঠ্য নয়। কিন্তু আলেকজাণ্ডারপ্লাৎস্ উপন্যাসখানির শ্রেষ্ঠত্ব হল তার এক্সপ্রেশনিষ্ট লেখনভঙ্গী, এক্সপ্রেশনিষ্ট কথাশিল্পীর দৃষ্টিতে মানবজীবনকে নবরূপে সত্যরূপে দেখা। খুনের চেষ্টা, কামলালসার জন্য হত্যা, প্রতিহিংসার জন্য ইত্যাদি যে সব রোমহর্ষক ঘটনা, অন্তরের উদ্বেলতাময় অবস্থা আছে, কোন রোমান্টিক বা রিয়েলিষ্ট লেখক সেগুলি কি ভাবে লিখতেন তা আমরা অনেক উপন্যাসেই পড়েছি।

এক্সপ্রেশনিজ্‌ম্ কি, তা না বুঝলে উপন্যাসখানি বোঝা যাবে না। রোমান্টিক লেখকগণ জীবনের বাস্তবতা, তার কদর্য্যতা, বীভৎসতা, বেদনাময় সত্য হতে পালিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যালোক জীবনের রঙীন কল্পলোক সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন; তার প্রতিক্রিয়ারূপে হল রিয়ালিজ্‌ম্ ইম্‌প্রেশনিজ্‌ম্,—জীবনকে যথাযথ সত্যভাবে আঁকতে হবে তার নগ্ন কদর্য্যতা উদ্‌ঘাটিত ক'রে; ভাবের রসের রঙীনতার দুর্ব্বলতা চলবে না: আর্ট হবে জীবনের প্রতিবিম্ব, সাহিত্য হবে জীবনের ফটোগ্রাফি।

ইম্‌প্রেশনিজমের নগ্ন বাস্তবতা, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণভারাক্রান্ত সাহিত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন একদল এক্সপ্রেশনিষ্ট লেখক। তাঁরা বল্‌লেন, মানবজীবনকে ভাসা-ভাসা দেখে ইম্‌প্রেশনিষ্ট তার ছবি এঁকেছে, জীবনের সত্যকে তারা গভীরভাবে উপলব্ধি করে নি, বাহিরের আবরণ ভেদ ক'রে মানবাত্মার শক্তি ও সৌন্দর্য্যলোক তারা দেখেনি। আর্ট রোমান্টিকের অলীক রঙীন স্বপ্নলোক সৃষ্টি করবে না বা রিয়ালিষ্টের জীবনের ফটোগ্রাফিক ছবি আঁকবে না; প্রকৃতি ও জীবনের মধ্যে যে অনন্ত গূঢ়শক্তি আপনাকে বিকশিত করছে, আর্ট তারি কথা বলবে, অন্তর্নিহিত সত্যের উদ্‌ঘাটন করবে।

এক্সপ্রেশনিষ্টের এই নব দৃষ্টিতে প্রতি ব্যক্তি প্রতি বস্তু এক নব সত্তা লাভ করল, অনন্তের সঙ্গে তার যোগ। এক্সপ্রেশনিষ্ট কথাশিল্পী যখন এক রোগীর গল্প বলে, সে রোগী হয়ে ওঠে পৃথিবীর সকল রোগীর প্রতীক, মানবজীবনের ব্যাধির বেদনা সে বহন করছে; সে একা, ভিন্ন নয়; বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে যে ভাঙন যে ব্যাধি রয়েছে, সে তারি রূপ; তার যাতনা নিখিল মানবাত্মার বেদনা; তার সংগ্রাম, মানবাত্মার সংগ্রাম। রিয়ালিজমের নগ্ন বাস্তবতা, কদর্য্য বীভৎসতার তলে মানবাত্মার সৌন্দর্য্যলোক রয়েছে, এক্সপ্রেশনিষ্ট শিল্পী তারি কথা বলেন।

মানবজীবনকে নবদৃষ্টিতে দেখার প্রয়াসে উপন্যাসের সব চরিত্র ব্যক্তিত্ব হারিয়ে হয়ে উঠল প্রতীক। আলেকজাণ্ডারপ্লাৎসের ফ্রান্ত্‌স্ বিবারকফ শুধু বার্লিনের এক

মজুর নয়, সে মানব-যোদ্ধা, মানবসভ্যতার সঙ্গে সে যুদ্ধ করছে সয়তানের শক্তিগুলির সঙ্গে।

রিয়ালিজমের সাহিত্যে যে নিরাশা, হতাশ্বাস, সভ্যতার বিকৃতি, ভাঙনের রূপ পাই, এক্সপ্রেশনিজ্‌ম্ তার প্রতিবাদ; নিরাশার অন্ধকারে সে সত্যের আলোর জন্য সাধনা করছে, প্রেমের আনন্দলোক উদ্‌ঘাটিত করছে, মানবাত্মার জয়গান গাইছে।

ফ্রান্ত্‌স্ বিবারকফের গল্প মানবাত্মার সংগ্রামের কথা; আঘাতের পর আঘাত পেয়ে সে দমল না, হার মানল না।

উপন্যাসের শেষ অংশের প্রথমে ড্যবলিন লিখছেন, The man's broken. But a new Biberkopf will now be shown, far superior to the man we have known, and who, we may expect, will make a better job of things.

গ্রন্থের শেষে গ্রন্থকার লিখছেন, The way leads to freedom, to freedom it goes, the old world must crumble. Awake, wind of dawn! And march in step, right, left, right, march on, march on, we march to war, a hundred minstrels march before, with fife and drum, drrum, brrum, for one the road goes straight, for another it goes crooked, one stands fast, another falls, one rushes past, another falls, drrum, brrumm, drrumm!

এৎসেল আনডেরগাষ্ট আমাদের পূর্ব্বপরিচিত: Maurizius Case-এ বালক এৎসেলের কথা পড়েছি। এক নিরপরাধ ব্যক্তি দণ্ডিত হয়েছে আর সেই দণ্ডদানের সহায়ক ছিলেন তার পিতা, এই ভেবে বালক আনডেরগাষ্টের মনে শান্তি রইল না; দণ্ডিত ব্যক্তি সত্যি দোষী না নিরপরাধী, তা জানাবার জন্য কিশোর এৎসেল গৃহত্যাগ করে বাহির হয়ে গেল। ব্যক্তি ও সমাজের সংগ্রামে নির্দ্দোষী ব্যক্তির প্রতি অবিচারে কিশোর মনে যে দ্বন্দ্ব ও বেদনা জাগল, তা ভাসারমান পরম শক্তির সহিত বর্ণনা করেছেন Maurizius Case উপন্যাসখানিতে।

"Etzel Andergast" উপন্যাসে এৎসেল যুবক; তার অন্তর শান্তিহারা; মহাযুদ্ধাগ্নিদগ্ধ জার্ম্মানীর রাজনৈতিক, সামাজিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে জীবনের সত্য, আত্মার আনন্দ, পৃথিবীভরা শান্তির সুর খুঁজতে গিয়ে সে দিশাহারা হয়ে গেছে। একবার সে ভাবল, হয়ত মানুষের জ্ঞানের পথে সে সত্যের সন্ধান পাবে, সে তিন শত প্রধান প্রধান পুস্তকের তালিকা তৈরী করল, দিনরাত বইএর পর বই পড়ে যেতে লাগল,—দর্শন, ধর্ম্মের ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থশাস্ত্র, জীব-বিজ্ঞান, কত রকমের বই; কিন্তু তার সত্যানুসন্ধিৎসু মন কোথাও শান্তি পেল না; চারিদিকের সমাজ ও জীবনে অবিচার, অপ্রেম, ভাঙন, ব্যর্থতা দেখে ব্যথিত অন্তরে যে সব প্রশ্ন জাগে, তার কোন উত্তর পেল না।

বই পড়া ছেড়ে এৎসেল আবার মানবজীবন দেখতে বাহির হল। সরল সহজ জীবন নয়, যেখানে মানবজীবন দুঃখে ভেঙে পড়েছে, অত্যাচারে দ্বন্দ্বে কামনায় কদর্য্য বীভৎস, সেই underworld তাকে আকৃষ্ট করল—গরীবদের বস্তি, কুলিদের সহরতলী, বারবনিতাদের পাড়া—সভ্য ভদ্র ধনী সমাজের প্রান্তদেশে দুঃখদারিদ্র্যের নীতিহীন বিশৃঙ্খল নরনারীসমাজ, সেখানে সে তার যৌবন-হৃদয় নিয়ে জীবনের সত্য খুঁজতে গিয়ে পেল শুধু বেদনা।

এই সময় সে ডাক্তার কেয়ারকোভেনের সংস্পর্শে এল। এক শক্তিমান চরিত্রের শান্ত প্রভাব আর এক অশান্ত চরিত্রে কিরূপ ক্রিয়াবান হয়ে উঠতে পারে, তার দৃষ্টান্ত দেখি, ডাক্তার কেয়ারকোভেনের সঙ্গলাভে এৎসেলের চরিত্রের পরিণতিতে।

ব্যাপারটি এইরূপ: রোডেরিশ্ লুট্গেন্ নামে এৎসেলের এক বন্ধু আত্মহত্যা করে; মহাযুদ্ধের শেষে যখন জার্ম্মানীর সব যুবকদের স্বপ্ন ভেঙে গেছে, জীবন অর্থহীন, যুদ্ধের জন্য সকল ত্যাগ দুঃখভোগ ব্যর্থ, সেই সময় কোন ব্যর্থপ্রেমিক যুবক যে আত্মহত্যা করবে, তাতে ভাববার কিছু নেই। কিন্তু মুস্কিল বাধল জেসিকে নিয়ে; জেসি রোডেরিশ্‌কে ভালবাসত; ঘরে গ্যাস ভরে সেও আত্মহত্যার চেষ্টা করে; রোডেরিশের বোন হিল্‌ডে তা জানতে পেরে জেসির বাড়ী এসে তাকে বাঁচায়; কিন্তু জেসি আত্মহত্যা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; সুতরাং এৎসেলের সাহায্যে হিল্‌ডে জেসিকে তাদের বাড়ী নিয়ে এল, জেসিকে ঘরে বন্ধ ক'রে হিল্‌ডে ও এৎসেল পালা ক'রে দিনরাত তাকে পাহারা দিতে লাগল। দু'দিন এমনি পাহারা দেবার পর, ডাক্তার কেয়ারকোভেনের নাম শুনে এৎসেল তাঁর কাছে যায়, তিনি যদি জেসির কোন ব্যবস্থা করতে পারেন। ডাক্তার কেয়ারকোভেন সত্যিই অদ্ভুদ্ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন; তাঁর সংস্পর্শে তাঁর কথাবার্ত্তায় জেসির মন বদলে গেল, ডাক্তার তাকে তাঁর হাস্পাতালে নিয়ে গেলেন।

এই ঘটনা সম্পর্কে ডাক্তার কেয়ারকোভেনের সঙ্গে এৎসেল আনডেরগাষ্টের পরিচয় আরম্ভ হল। এৎসেল তখন গৃহহারা; সে কোন এক স্থানে স্থির থাকতে চায় না; এক রাত এক বন্ধুর বাড়ীতে অপর রাত অন্য বন্ধুর বাড়ীতে, এমনি ক'রে সে রাত কাটায়।

ডাক্তার কেয়ারকোভেন এৎসেলকে সেক্রেটারী নিযুক্ত ক'রে নিজের বাড়ি এনে রাখলেন। এৎসেলের নবজীবন সুরু হল। সে পেল নারীর প্রেম। ডাক্তার কেয়ার-কোভেনের স্ত্রীর সঙ্গে তার ভালবাসা হল। এই প্রেমের মধ্যে সে জীবনের সার্থকতা, সত্য, আনন্দ হয়ত খুঁজে পেত; কিন্তু সে প্রেম তার নতুন জীবনে আবার নব দ্বন্দ্ব নব বেদনা আনলে; প্রেমের সত্য খুঁজতে গিয়ে সে এক দম্পতির শান্তির গৃহ ভেঙে আনলে দুঃখের আগুন; যে আগুনে এৎসেলের অন্তরও দগ্ধ হল। সত্যের সন্ধানপথে সংঘাতের পর সংঘাতের ব্যথায় শ্রান্ত হয়ে কেয়ারকোভেন-পরিবারের ভাঙা ঘর হতে সে পালাল অনুশোচনায়; তার মায়ের স্নেহময় গৃহে সে শান্তির আশ্রয় খুঁজতে গেল। এইখানে গল্পের শেষ।

উপন্যাসখানিতে যে সব চরিত্রগুলি এৎসেলের জীবনপথে দেখি, তাদের কেহই সহজ, সুস্থ নয়: কেহ সমাজের অত্যাচারে বিকৃত, কেহ জীবনের ব্যর্থতার বেদনায় করুণ, কেহ কামনার লালসায় বীভৎস, কিন্তু সবার অন্তরে যে দ্বন্দ্বলীলা দেখতে পাই, তা অপূর্ব্ব।

চঞ্চলচিত্ত সত্য-সন্ধানী গৃহ-হারা এৎসেল আন্‌ডেরগাষ্ট; সুখান্বেষ্টা, বিকৃত স্বভাবাপন্ন শক্তিপূজারী লরিনেয়ার, সে একদিন Kapp Putch-র দলে ছিল, তারপর হল কমিউনিষ্ট ডন্-জুয়ান; নীতিবোধহীন অভিনেত্রী নর্ত্তকী এমা স্পেয়ারলিং, তার জন্যে রোডেরিশ আত্মহত্যা করল, সেজন্য সে বিশেষ ব্যথা অনুভব করেনি, সে আইন জানে না, বিচারবোধ তার মনে জন্মায়নি। এই অসুস্থ চঞ্চল জগতের মধ্যে ডাক্তার কেয়ারকোভেনের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সুস্থ শক্তির স্থির ভূমির মত; কিন্তু

সে ভূমিতেও ভাঙন ধরল; এই মহান পুরুষের সত্তার ধ্বংসের ট্রাজেডির সম্মুখে মাথা নত হয়ে আসে। Spiritual Crisis, মানবাত্মার দুঃখময় সংঘাতের ট্রাজেডির কথা এমন শক্তির সহিত, হৃদয়ের বেদনার সহিত ভাসারমানের মত খুব কম লেখকই লিখতে পেরেছেন।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

Western Influence in Bengali Literature.—
By PRIYARANJAN SEN (Calcutta University).

Western Influence in Bengali Novel.—
By PRIYARANJAN SEN (Calcutta University).

পাশ্চাত্যমনের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপথে সমগ্র জগৎ আজ আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বসাহিত্যের শতধারার সম্মিলনে আমাদের সাহিত্যের মৌলিক ধারাটি এক অভিনব রূপ নিয়েছে, যার ব্যাপকতাও যতো বেশী গভীরতাও ততো। এই নবরূপটির আবির্ভাব হতে আজ পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ বহিঃশক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এর ওপর চলে এসেছে—তার কতোখানি আমরা আমাদের সহজ প্রতিভায় আত্মসাৎ করেছি এবং সে-ই বা আমাদের কতোখানি আত্মসাৎ করেছে তার একটা সূক্ষ্ম হিসাবনিকাশের জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই।

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন আমাদের এই দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার ভার নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন। ডক্টর সুশীলকুমার যে-পঁচিশটি বছরের বাঙলা সাহিত্যের আলোচনা করেছেন, সে হলো গৌরচন্দ্রিকার যুগ—Formative Age। শশাঙ্কমোহন রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত এসেছেন তাঁর 'বঙ্গবাণী'তে। এ বইখানি কতকটা ঐতিহাসিকতার দাবী করতে পারে; কতকটা,—কারণ, আধুনিক যুগের আলোচনায় ধারাবাহিকতা ঠিক রক্ষিত হয় নি। তাঁর 'বাণীমন্দির'-এর প্রবন্ধগুলি Obiter Dicta জাতীয়। 'মধুসূদন' Dowden-এর 'Shakespeare—His Mind and Art'-এর অনুসরণে লিখিত—ভালো বই। শশাঙ্কমোহনের তিনখানি বইই মূল্যবান্, যদিও তাঁর লিখনভঙ্গীতে এমন একটা অবাঞ্ছিত বক্রতা আছে যে মনে হয় অনেক জায়গায় তাঁর বক্তব্য ঠিক স্পষ্ট হয় নি অথবা বক্তব্য বিশেষ না থাকায় ভাষা ফেনিল হয়ে উঠেছে। তবু স্বীকার করতেই হবে বিচারসাহিত্য হিসাবে এগুলি অভিনব সৃষ্টি। আমরা তাঁর কাছে ঋণী।

প্রিয়রঞ্জনবাবুর 'Western Influence in Bengali Literature' বইখানিতে দুটি বস্তু লক্ষ্য করলাম—ঐতিহাসিকতা আর প্রভাবের হেতু—তথা স্বরূপ-বিচার। ফোর্ট উইলিয়াম্ কলেজের প্রতিষ্ঠা (১৮০০) থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা কখন্ কোন্ পথে বয়ে এসেছে এবং ওই বিশিষ্ট পথ দিয়েই বা কেন এসেছে গ্রন্থকার সূক্ষ্মভাবেই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য অনেকস্থলেই তাঁকে ইঙ্গিতের আশ্রয় নিতে হয়েছে। বিষয় এতো ব্যাপক যে চারশো পৃষ্ঠার একখানি বইএ সব কথা বিশদভাবে বলা সম্ভবপর নয়।

প্রথমেই আছে পাশ্চাত্যপ্রভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বাঙলা সাহিত্যের বৈশি... আলোচনা। এ-আলোচনা অবশ্যম্ভাবী ; নইলে প্রভাবের স্বরূপ ও পরিমাণ ... অসম্ভব। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম অংশটি 'Contact with the W... before the Christian era' আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন ব'লে মনে হয় ; ... এযুগের সাহিত্যের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই। কিন্তু গ্রন্থকার বল্‌তে চান ... প্রভাব আত্মসাৎ করার শক্তি সকল দেশের থাকেনা, এদেশের আছে—'India ... not so stolidly impervious to outside influences' ; এবং ... বলেই ১৫০ বছরে আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে এমন বিপুল পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়েছে।

আসল বিষয়বস্তুর সূচনা হোলো তৃতীয় পরিচ্ছেদে—ইংরাজ আমলের ... অংশে নবপ্রভাব কোন্ কোন্ পথে এলো তারি হিসাব নিকাশ (Channels of the new influence)। এই অংশে প্রাথমিক প্রেরণার বিভিন্ন প্রবাহগুলি আলো... হয়েছে এবং ভাবীকালের বিপুল সম্ভাব্যতার বীজ কেমন ক'রে এই সঙ্কীর্ণ ... প্রভাবের ভিতর অনুস্যূত হয়েছিল তার বিচার করা হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তুটির গুরুত্ব সব চেয়ে বেশী। এইটিকে বলা যেতে পা... সূত্র এবং পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদগুলি এরি ভাষ্য। ইউরোপীয়, বিশেষ ক'রে ইংলণ্ডীয় ... চিন্তাধারার সঙ্গে এই সময় হতেই এদেশবাসীর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের আরম্ভ। পরিচ্ছে... নাম Bengal's Favourite Authors। 'Favourite' শব্দটির মূল্য অ... বেশী। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই 'favourite'-কে আবিষ্কার করা বাঙা... পক্ষে অসম্ভব ছিল, কারণ, সেটি ছিল প্রাথমিক শিক্ষার কাল এবং নবরূপের আকস্মি... আবির্ভাবে স্বাভাবিক মূঢ়তার দিন। তখন আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের চে... বৈদেশিকদের ক্রিয়াশীলতাই ছিল বেশী। কাজেই 'favourite'-কে চিনে নিতে পঞ্চা... বছরেরো বেশী সময় লেগে গেল। এই 'favourite'-দের প্রভাব আমাদের নব... সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দুইভাবেই কাজ করেছে। সেদিনকার সে... আরব্ধ সাধনা আজো নানানতররূপে সিদ্ধিলাভ করছে। মধুসূদনে যার অঙ্কুর দে... গিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথে তাই পুষ্পিত হয়েছে। অতি আধুনিকদের সাধনার ক্ষে... আরো প্রসারিত, যদিও এ সাধনার গতি এবং প্রকৃতি বলিষ্ঠ নয়। তবু, আজ ... হোক্, দুদিন পরেও পুষ্প তার স্বভাবধর্ম্মে ফলে উত্তীর্ণ হবেই। প্রিয়রঞ্জনবাবু এ... অংশটির আলোচনায় একটি বিষয়ে নজর দেন নি বলেই মনে হোলো। এদেশে... যখন মধু-বঙ্কিমের যুগ এলো, ইংরাজী সাহিত্যে তখন Victorian Age। ... আমাদের মধু-বঙ্কিমের সাহিত্য এতো পেছিয়ে পড়ল কেন? তাঁদের সাহিত্য এদেশে... পক্ষে নতুন হতে পারে, কিন্তু সাগরপারে antidated। পরিচয়ের আংশিকতা এ... কারণ বলে সহজেই মনে হবে। কিন্তু এর চেয়ে সঙ্গততর কারণ দীর্ঘদিনের অনুশীলনে... অভাবে জাতির মানসিক জড়তা। স্বাধীন দেশের চিত্তধারার সঙ্গে সমানতালে পা ফেলে... চলা পরাধীন দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। আজো তাই আমাদের সাহিত্যে আধুনিকতা... ঠিক সুরটি লাগ্‌ছে না ; বলিষ্ঠ প্রাণস্পন্দনের বড়োই অভাব দেখছি। তথাকথি... প্রগতির ভিতর দুর্গতির লক্ষণই বেশী। শরৎ-রবির পর থেকে এ-সাহিত্যে স্বতন্ত্রতা... চেয়ে পরতন্ত্রতার রূপই অধিক মিল্‌ছে। আত্মস্থ করে বিশিষ্টতা দেওয়ার প্রতিভা... অভাবে আবর্জ্জনাই জমে উঠছে। প্রথম পরিচয়ের যুগেই এমনি হওয়া স্বাভাবি...

ছিল ; কিন্তু ঠিক তা হয়নি। এতো কাল পরে, যখন বাঙলা প্রিয়রঞ্জনবাবুর মতে "may be believed to have developed her own tendencies," তখন এ-বিপর্য্যয়ের কারণ কি? প্রিয়রঞ্জনবাবু ভেবে দেখবেন।

এইবার পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম আর অষ্টম পরিচ্ছেদের কথা। প্রথম তিনটিতে আছে চতুর্থ পরিচ্ছেদের রৌপিক ফলশ্রুতির অর্থাৎ 'favourite author-দের প্রেরণা কিভাবে আমাদের কাব্যে, নাটকে এবং গদ্যসাহিত্যে রূপায়িত হয়ে এসেছে, তারি বিবরণ। অষ্টমে আন্তর ফলশ্রুতি অর্থাৎ 'Matter and Spirit'-এর বিচার।

কাব্যের 'Sonnet'-রূপের আলোচনাপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের 'বৈরাগ্য', 'দেবতার বিদায়', 'নৈবেদ্যের' কবিতা প্রভৃতিকে 'Sonnet'-এর পর্য্যায়ে ফেলেছেন। আমি এগুলিকে চতুর্দ্দশপদী পয়ার ব'লে মনে করি। মধুসূদন Sonnet-এর বাঙলা প্রতিশব্দ করেছিলেন 'চতুর্দ্দশপদী কবিতা'। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই প্রতিশব্দটার সৃষ্টি হয়েছিল। Sonnet—সনেট্ ; কোনো প্রতিশব্দের প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি না। আরেক কথা। রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা', 'মানসসুন্দরী', 'মেঘদূত', 'স্বর্গ হইতে বিদায়' প্রভৃতিকে 'accurately as blank verse' ব'লে ধরা যায় না ; 'but rhyming lines which are run on or unstopped'—সত্যি কথা। কিন্তু 'jingle of similar sounds is not altogether absent'—কোথা থেকে? তাছাড়া 'altogether' শব্দটির অর্থ ঠিক হৃদয়ঙ্গম হোলো না। 'But never prominent'—'never' কি ঠিক? 'মানসসুন্দরী'র

'ধূপ দগ্ধ হ'য়ে গেছে গন্ধবাষ্প তার,
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার'

—এ তো বিশুদ্ধ পয়ার ; এমন কি যতিটি পর্য্যন্ত নিখুঁত। বোধহয় 'never' নয়, 'not always' গ্রন্থকারের অভিপ্রেত। 'এবার ফিরাও মোরে', 'সমুদ্রের প্রতি', 'হিমালয়' প্রভৃতিরো এই ছন্দ ; কেবল পঙ্‌ক্তির অক্ষর সংখ্যা চৌদ্দ না হয়ে আঠারো।

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধকাব্য' কি নিখুঁত Epic-লক্ষণাক্রান্ত? 'সাহিত্য-দর্পণ'-কে তিনি মানেন নি ; কিন্তু 'Paradise Lost'-কেও যে ঠিক মেনেছেন তা মনে করি না। 'মেঘনাদবধকাব্য' সংস্কৃত মহাকাব্য আর ওদেশের Epic-এর মিলনফল।

নাট্যসাহিত্য এবং রঙ্গমঞ্চের আলোচনাটুকু সংক্ষিপ্ত হলেও সর্ব্বাঙ্গীন। গ্রন্থকার যথাসম্ভব প্রমাণপ্রয়োগের ওপর আপনার বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই বিষয়ের ওপর thesis লিখে সেদিন এক ভদ্রলোক বিলাতী Ph. D. নিয়ে এসেছেন যা প'ড়ে আমরা কিন্তু হতাশ হয়েছি। প্রিয়রঞ্জনবাবু যে স্মৃতির ওপর নির্ভর করেননি বা অযথা কল্পনার রঙ ফলিয়ে মরীচিকার সৃষ্টি করেননি এতে আমরা আনন্দিত। অনেকের ধারণা রাশিয়ার Gerasim Lebedeff-এর প্রভাব আমাদের শিশুনাট্য-সাহিত্যের ওপর খুব বেশী, গ্রন্থকার তার প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন বাঙলা নাটক তথা রঙ্গমঞ্চের আবির্ভাব এবং প্রগতির মূলে এদেশে ইংরাজদের প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী Theatre-এর প্রভাবই বেশী। আমরাও তাই যুক্তিসঙ্গত মনে করি। Lebedeff বাঙলা বই ('Disguise' আর 'Love is the Best Doctor'-এর

বাংলা অনুবাদ) অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু ১৮৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাঙালী প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বেলেঘাটার বাগানবাড়ীতে যে-বই নিয়ে প্রথম Theatre করেন তা বাঙলা নয়, ভবভূতির সংস্কৃত নাটক 'উত্তররামচরিতে'র Wilson-কৃত ইংরাজী অনুবাদ। ওর সঙ্গে ছিল Julius Caesar ? লক্ষ্য করবার বিষয় নয় কি ?

এর পরে থিয়েটারে অভিনয়যোগ্য বাঙলা নাটকের আবির্ভাব হয়। তা সত্ত্বে ইংরাজী নাটকের অভিনয় বহুদিন ধরে চলেছিল। সেই থেকে পাশ্চাত্য আদর্শে আমাদের সাহিত্যে অসংখ্য নাটকের স্বষ্টি হয়েছে ; বিদেশী নাটকের অনুবাদও হয়েছে প্রচুর। গিরীশচন্দ্র, অমৃতলাল, রবীন্দ্রনাথের হাতে বাঙলা নাট্যসাহিত্য স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছেও যথেষ্ট। প্রিয়রঞ্জনবাবু কি খুব আশাবাদী ? তিনি 'নাট্যমন্দির' 'নাট্যনিকেতন' প্রভৃতি নামে বাঙালীর আত্মস্থতার লক্ষণ দেখে সুখী হয়েছেন ; বলেছেন এই নামকরণ 'has a significance of its own'। কিছু significance হয়তো আছে এবং শিশিরবাবুর মতন প্রতিভাশালী নটের আবির্ভাব হয়েছে দেশের সৌভাগ্যের ফলে। কিন্তু নাট্যসাহিত্যে decadence লাগ্‌লো কেন ? সেই থোড়বড়িখাড়া খাড়াবড়িথোড় ১৯১২ সাল থেকেই চল্‌ছে, অবশ্য রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্য আর মন্মথবাবুর একাঙ্কিকা বাদ দিয়ে। আত্মস্থ বাঙালীর প্রতিভাও কি উদরস্থ হয়ে গেল ? আমাদের সাহিত্যের এই অতিআধুনিক যুগটি অদ্ভুত !

এইবার গল্পসাহিত্যের কথা। সকল দেশেরি মতন আমাদেরো গল্পসাহিত্য বয়সে সকলের ছোটো। প্রাক্‌পাশ্চাত্যযুগে এর অস্তিত্ব ছিল না বল্‌লেই চলে। কিন্তু আজ দেখ্‌ছি এর বহুরূপ—উপন্যাস, ছোটো গল্প, প্রবন্ধ, সাহিত্যবিচার, গল্পকাব্য, ইতিহাস, জীবনচরিত, আত্মচরিত, ব্যাকরণ, অভিধান, হাস্যকৌতুক নানান্ দিকে গল্পধারা প্রাণের প্রাচুর্য্যে শত তরঙ্গে আবর্ত্তিত হতে হতে চলেছে। এই দিকেই পাশ্চাত্যপ্রভাব যতো অতল, ততো ব্যাপক। মাত্র দেড়শো বছরে কি আশ্চর্য্য শক্তি এ পেয়েছে ! শরৎ-রবির গল্পে যে বিশ্বদীপন জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়েছে, নিমানন্দ চণ্ডীদাস-রমাইপণ্ডিতের গল্পে কি তারি latency ছিল ? বৈদেশিকের হাতে যার প্রথম ব্যাকরণ অভিধানের জন্ম হলো, বৈদেশিক যার চলার পথ বাৎলে দিলে বিলাতী Syntax-এর ছাঁচে ঢালা কিম্ভূত-কিমাকার রূপের স্বষ্টি ক'রে, তাই আজ বিশ্বনন্দ নাট্যশালা হয়ে দাঁড়িয়েছে ! আশ্চর্য্য ! প্রিয়রঞ্জনবাবু এই অতিপ্রয়োজনীয় অংশটিকে বড়োই সংক্ষিপ্ত করেছেন, মনের ক্ষুধা ঠিক মিট্‌লো না।

অবশ্য উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁর একখানি পৃথক্ বই আছে—'Western Influence in Bengali Novel'। এইটিই তাঁর প্রথম বই। ছোটো বই, তবু চমৎকার। সামান্য একআধটু অসামঞ্জস্য যা চোখে পড়েছে, তারি আলোচনা করি।

বাঙলার কথাসাহিত্যে প্রথম স্বষ্টিলগ্নে একদিকে বিশেষতঃ 'Vernacular Literature Society'-র কল্যাণে হতে লাগ্‌লো অজস্র ইংরাজী বইএর অনুবাদ, অন্য দিকে বিদ্যাসাগর ইত্যাদির নজর রইলো সংস্কৃতের ওপর এবং আরেকদল ঝোঁক দিলেন পার্শী, আরবি, উর্দ্দুর দিকে। শেষদলের চেষ্টা নিষ্ফল হলো ; কারণ, ওঁদের সাধনা 'failed to capture the imagination of the public'। প্রিয়রঞ্জনবাবু এর কারণ বলেছেন—'Incidents described in these books take

place as a rule outside India···heroes and heroines have strange, outlandish names' ইত্যাদি। কিন্তু, তাই কি ? বিলাতী বইএর 'incidents'-ও তো এদেশী নয় এবং তারো 'heroes and heroines'-এর নাম আমাদের কাছে 'strange'। তবে এ কথাটা অবশ্য সত্যি যে আরবী পার্শী বইগুলি অবাস্তব রোমান্সধর্ম্মী। একটা কথার অর্থ বুঝলাম না—'The facts, mentioned above, will support the theory that even without the help of English, or for the matter, western literature in general, the Bengali novel would have come to its own'। কিন্তু 'above' যা 'mentioned' আছে তা হচ্ছে—আরবী পার্শী গল্পে মন ঠিক সাড়া দিলে না ব'লে 'the demand for western stories was so strong that···' ইত্যাদি। পরের প্যারাতেও রয়েছে—'It is not a fact that only in translation or in plot or in style only, our writers were influenced by western authors. Even in the matter of ideas the Bengali novelist learnt much and accepted much from England and other countries···'

স্বর্ণকুমারীর কথাও আলোচিত হয়েছে দেখ্‌লাম। অনুরূপা নিরুপমা কি পাশ্চাত্যপ্রভাবের অতীত ? প্রিয়রঞ্জনবাবুর গণ্ডীর বাইরে ব'লেও তো তাঁদের মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-বিচারে গ্রন্থকারের কৃতিত্ব এবং পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশ্বসাহিত্যের ধারা এসে মিশেছে। তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার রসায়নে সকলগুলির এক আশ্চর্য্য কেমিক্যাল্ কম্পাউণ্ড্ তৈরী হয়েছে। প্রিয়রঞ্জনবাবু বলেছেন—'He (Rabindranath) is not pre-eminently a novelist ; he is a poet first. Hence in the history of Bengali novels he does not occupy the same position as he does in his poetry'—খুবই সত্যি ; তবু, তাঁর উপন্যাস, বিশেষ ক'রে 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', এমন কি সেদিনকার 'শেষের কবিতা', 'যোগাযোগ' পর্য্যন্ত (অবশ্য শেষ দুটির কথা প্রিয়রঞ্জনবাবু আলোচনা করেন নি) আদর্শের দিক্ দিয়ে যাই হোক্, শিল্প হিসাবে চমৎকার। 'ছোটো গল্পে' তিনি 'not only the pioneer but also the best'—আমরাও তা মানি। কিন্তু একি তাঁর স্বকীয় স্বষ্টি ? প্রিয়রঞ্জনবাবু কিছুই বলেন নি। আমার মনে হয় এক্ষেত্রে তিনি প্রথম প্রেরণা পেয়েছিলেন ফরাসীর কাছে ; কিন্তু পরে রাসিয়া, বিশেষতঃ Turgenev আর Tchekov, তাঁর গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করেছে। Scandinavian-দের কাছে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঋণী ; কিন্তু ছোটো গল্পে ওঁদের কৃতিত্ব কম বলেই আমার বিশ্বাস। মোটের ওপর রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে প্রিয়রঞ্জনবাবুর বেশ কৃতিত্ব দেখলাম। রবীন্দ্রনাথ মধুস্থদন নন ; কাজেই তাঁর পাশ্চাত্য ঋণ সাধনার দ্বারা আবিষ্কার করতে হয়। এবং তাতে পাণ্ডিত্যের তথা অন্তর্দৃষ্টির দরকার। শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য—

'The assimilation of western idea and ideals is more and more thorough and the borrowing, if any, is more and more

indirect, ideas are so closely assimilated that it is not at all possible to distinguish if they are eastern or western'।

খুব চমৎকার। তবু মনে হয় শরৎচন্দ্রের ওপর ইংরাজী প্রভাব কম, রাশিয়ান আর স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান্‌ই বেশী।

ছোটো গল্প সম্বন্ধে গ্রন্থকার প্রায় নীরব। এ নিয়ে অনেক কথাই কিন্তু তাঁর বল্‌বার ছিল।

এইবার প্রথম বইখানির অষ্টম পরিচ্ছেদ। এখানে সাহিত্যের 'matter' আর 'spirit'-এর আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে মানুষের স্থান খুব উচ্চে। এর মূলে Comte-র নিরীশ্বর মানববাদের (Positivism) প্রভাব খুবই বেশী একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। Fichte-এরও কিছু আছে। James-এর Pragmatic Philosophy আর Whitman-এর কাব্যও এই দিক্ দিয়ে আমাদের সাহিত্যে প্রচুর কাজ করেছে ব'লে মনে করি। এঁদের কথার উল্লেখ না দেখে একটু বিস্মিত হয়েছি। পাশ্চাত্য সংস্পর্শের গোড়া থেকেই আমাদের সমাজে নারীদের ওপর আমাদের নজর পড়েছে। বিদ্যাসাগর ভূদেব বঙ্কিমের ভিতর দিয়ে নবীনচন্দ্রে এমন কি চিত্তরঞ্জনেও নারী যে-রূপ পেয়েছেন, তার মূলে বিলাতী নারীর আদর্শ যথেষ্ট থাক্‌লেও এদেশী আদর্শ একেবারে মুছে যায়নি। রবীন্দ্রনাথের নারী অপরূপ সৃষ্টি। সেকালের 'অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'উর্ব্বশী'র ভিতর দিয়ে অপরূপের মধ্যে আপনার সত্তা হারিয়ে ফেলেছে!

প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়েছে দেশাত্মবোধের কথা। দেশাত্মবোধের যে-রূপটির সঙ্গে আমরা এখন পরিচিত, তার মূলে যে পাশ্চাত্য প্রেরণা আছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই দেশাত্মবোধ রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশ্বাত্মবোধে পরিণত হয়েছে; প্রিয়রঞ্জন-বাবুর ভাষায় 'nationalism merging in internationalism,' কিন্তু এতে পশ্চিমা Percentage-ই কি বেশী নয়?—অন্ততঃ আজকাল?

ধর্ম্মেও পাশ্চাত্য প্রভাবের বহু মুখফলের কথা গ্রন্থকার সংক্ষিপ্ত হলেও সুন্দর ভাবে দেখিয়েছেন। Dogma-র স্থানে আজ বিচার এসেছে। ওদেশের rational philosophy এদিকে যথেষ্ট কাজ করেছে মানি; কিন্তু Science-এর প্রভাবও কি খুব বেশী নয়? ইউরোপের মধ্যযুগের Scholastic Philosophy ছিল Dogmatic—Bacon-এর সময় থেকে হোলো Rational। Bacon ছিলেন বিজ্ঞানবিদ্ গণিতজ্ঞ। পুরানো সংস্কৃতির মূলেও বিজ্ঞানের প্রভাব যথেষ্ট ব'লে মনে করি। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানজ্ঞানের পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছি জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে চিঠিপত্রের আদানপ্রদানে। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলি তাঁর 'বৃক্ষবন্দনা' কবিতায় হয়তো জগদীশচন্দ্রের প্রভাব আছে।

প্রিয়রঞ্জনবাবু বলেছেন—'The theosophical and spiritual movements, both western in origin।' আডিয়ারে Theosophical Society-র প্রতিষ্ঠাত্রী Madam Blavatsky রাশিয়াবাসিনী, কাজেই 'western'; কিন্তু Theosophy-কে 'western in origin' ব'লে মনে করি না। গীতার 'যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি'—এই তো 'Immanence of God' এর এরি ফল হোলো 'Solidarity of Man'—'অহং তং ন প্রণশ্যামি'। আর Spirit-এর

কথা পুরাণে তো আছেই; 'ব্রহ্মসূত্রে'ও পাই। বরঞ্চ বলা যেতে পারে এদুটির জন্য পাশ্চাত্য দেশই আমাদের কাছে ঋণী। Movements-ই শুধু বিলাতী। তা ছাড়া, হীরেন্দ্রনাথের 'গীতায় ঈশ্বরবাদ'-কে Theosophy-র দ্বারা প্রভাবিত বল্‌তে আমার আপত্তি আছে; এখানিকে আমি সর্ব্বদর্শনসমন্বয়রূপেই দেখেছি।

নবম বা উপসংহার পরিচ্ছেদে প্রিয়রঞ্জনবাবু বলেছেন—

The receptivity of the Bengali mind deserves some credit …who will say that this receptivity has been all for good?

সত্যিই ভাব্‌বার কথা। এর ভালোমন্দ দুটো দিকই প্রবল। বিশেষতঃ এই অতিআধুনিক যুগের সাহিত্য দেখে ভয়ই হয়।

শেষে একটা কথা ব'লে রাখি। বইখানির ২৮৪ পৃষ্ঠায় দেখলাম—

'Still, a sentence like the following which is either English or Sanskrit, but certainly not Bengali…'

'নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সীতারামের নিকট সবিশেষ নিবেদিত হইল। (সীতারাম, ৮ম পরিচ্ছেদ)'

সংস্কৃতে বাক্যবিন্যাস এমন হতে পারে না। অসমাপিকা আর সমাপিকা ক্রিয়ার সমানকর্ত্তৃকত্ব হতেই হবে।

এইবার আমার উপসংহার। প্রিয়রঞ্জনবাবু বিশেষতঃ এম্‌-এ পরীক্ষার পাঠ্য হিসাবেই বইদুখানি লিখেছেন; কিন্তু আমাদেরো অর্থাৎ সাধারণ পাঠকদেরো এতে যথেষ্ট উপকার হয়েছে। অনুরোধ করি 'Ten More Plays of Shakespeare-এর মতন আরেকখানি বই তিনি আমাদের যেন উপহার দেন। আমাদের অতিআধুনিক সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাবের মাত্রাও বেড়েছে, জটিলতাও বেড়েছে। আলোচিত বই দুখানি থেকে তাঁর শক্তির ওপর আমার বিশ্বাস জন্মেছে বলেই এ ভার তাঁকে দিলাম অর্থাৎ নেবার জন্য অনুরোধ কর্‌লাম। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি: বই দুখানি বাঙলায় লিখলেই কি ভালো হতো না? আমাদের সাহিত্যের ঐশ্বর্য্যও তাতে বেড়ে যেতো আর অশিক্ষিত অর্থাৎ ইংরাজী-না-জানা অভাগ্য বাঙালীদেরো উপকার হতো। অবশ্য তাতে জুবিলি রিসার্চ প্রাইজ্ বা পি, আর্, এস্, মিল্‌তো না আর—থাক্। মোটের ওপর বাঙলা অনুবাদের সময় যায় নি।

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী

নীল-লোহিত—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী—কমলা বুক ডিপো।

এগারটী ছোট গল্পের সমষ্টি। অধিকাংশ গল্পের plot বা আখ্যান-ভাগ নাই বলিলেই হয়। তথাপি তাহাতে অন্য জিনিস এত আছে যে পুস্তক পাঠ করিয়া কেহই নিরাশ হইবেন না। প্রমথবাবুর লিখনভঙ্গী গৌড়জনের সুপরিচিত। সেই লিখনভঙ্গী পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় যে রস সঞ্চার করিয়াছে, তাহাই সমজদার পাঠককে ভরপূর আনন্দ দান করিবে।

প্রথম তিনটী গল্পের নায়ক স্বয়ং নীল-লোহিত। এই মুখরনয়ন গল্পবাগীশ নায়ককে খুব গম্ভীর-প্রকৃতি পাঠকের পছন্দ নাও হইতে পারে। তবে আমার Tartarin

de Tarascon বা BaronMunchausen অপেক্ষাও নীললালকে বেশী ... লাগিয়াছে। মাত্র তিনটী গল্পে আশা মিটে নাই। সাধারণ পাঠকের তরফ ... আমার আবেদন যে প্রমথবাবু নীল-লোহিতের মুখে যত গল্প শুনিয়াছেন সবগুলি ... পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়া প্রকাশ করুন।

বাকী গল্পগুলি সম্বন্ধে আমার বেশী বক্তব্য নাই। সবগুলি এক দরের ... সরেসও আছে নিরেসও আছে। প্রাণবন্ধু, সিতিকণ্ঠ ও বীরবলের চিত্র নীললোহিতের মত সমুজ্জ্বল না হইলেও খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। পূজার বলি, দিদিমার গল্প ... ভূতের গল্প এ পুস্তকে না দিলেই ভাল হইত, কেন না ইহাদের plot নিতান্ত মামুলী ধরণের এবং চৌধুরী মহাশয়ের সর্ব্বজনবিদিত রচনাচাতুর্য্যও ইহাতে বিশেষ প্রকাশ পাইতে পারে নাই।

তবে প্রমথবাবুর লেখায় গল্পটা উপলক্ষমাত্র। আখ্যান ছাড়াও অনেক জিনিষ এই পুস্তকে আছে। নানা স্থানে যে সব শ্লেষোক্তি আছে, তাহা সত্যই সুন্দর। কেহই বাদ পড়েন নাই, ক্ষত্রিয়ত্বকামী বঙ্গীয় কায়স্থসন্তান হইতে সুরতের লাড্ডু পুরী পর্য্যন্ত। গ্রন্থকারকে নানা বিদ্যায় পারাধিগত বলিয়া সকলেই জানেন। তবু তামাক সাজা, হাতী ধরা, ঘোড়ায় চড়া, ঘুড়ী ওড়ান ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁহার এরূপ আশ্চর্য্য সূক্ষ্ম জ্ঞান আছে বলিয়া কেহই সন্দেহ করেন নাই। তবে জানা বস্তুটাই ত সব নয়। তামাক সাজা ও ঘুড়ী ওড়ান আমরা পাঁচজন হয়ত চৌধুরী মহাশয়ের চেয়ে ভালই জানি কিন্তু বিদ্যা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।

মোট কথা, আলোচ্য পুস্তকখানি সুপাঠ্য ও সুন্দর হইয়াছে। আমরা সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি।

শ্রীচারুচন্দ্র দ...

Shakespeare through Eastern Eyes —By Ranjee G. Shahani, with an introduction by J. Middleton Murry, and an appreciation by Emile Legouis (Herbert Joseph, London).

অমর কবি শেক্‌স্‌পীয়রের কবিত্ব প্রাচ্যের হৃদয় স্পর্শ করে কি না সে কথা নিয়ে লেখক আলোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্যের মূল নীতি,—কাব্য সার্ব্বভৌম নয়, রস সার্ব্বভৌম, কিন্তু সে রসকে প্রকাশ কর্ত্তে গেলে, প্রকাশভঙ্গী স্থানকালপাত্রের অনুযায়ী পৃথক পৃথক আকার ধারণ করে। প্রাচ্য এতদিন তোতাপাখীর মত পাশ্চাত্যের শেখানো বুলি আউড়েছে, নকলনবিশী ছিল এতদিন ধরে প্রাচ্যের আধুনিক শিক্ষার মেকী মাপকাঠী, কিন্তু এখন তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে, মেকী ধরা পড়েছে, সে আজ ভাল ক'রে দেখে শুনে জীবনের পথে চল্‌তে চায়, যাঁকে জগতের শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে সে শিখে এসেছে তাঁর কথাই ভেবে দেখ্‌তে চায়,—বাস্তবিক তিনি প্রাচ্যের আদর্শে জগতের শ্রেষ্ঠ কবি কিনা। ডক্টর সাহানী এই বিষয় নিয়ে নানাভাবে আলোচনা করেছেন; প্রাচ্যে, ভারতে, শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক কি ভাবে পড়ানো হয়, কি ভাবে

অনুবাদ করা হয়, কি ভাবে অভিনয় করা হয় সে সব ভাল ক'রে দেখে শুনে এবং অতীন্দ্রিয়ের প্রতি প্রাচ্যের সহজ অনুরাগের কথা মনে ক'রে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, প্রাচ্যের চক্ষে শেক্‌স্‌পীয়রের আসন অত্যুচ্চে নয়। তা ছাড়া বাস্তবিক কথা, ইংলণ্ডের এই শ্রেষ্ঠ নাট্যকার জীবনের কোনও সমস্যার বিষয়ে গভীর চিন্তা ক'রে কোন সমাধান করতে পারেন নি, সাহিত্যের কোনও বিশেষ রূপ সৃষ্টি ক'রে যাননি, নোতুন পথে চলবার ও চালাবার যে প্রতিভা, সে প্রতিভা তাঁর ছিল না; সুতরাং শেক্‌স্‌পীয়র এতদিন যে উচ্চ সিংহাসনে বসে ছিলেন আসলে তা তাঁর মোটেই প্রাপ্য নয়।

ডক্টর সাহানীর এই আলোচনার এক দিক থেকে মূল্য আছে; প্রাচ্যই হোক্ আর পাশ্চাত্যই হোক্ ভাল ক'রে পূর্ব্বগামীদের মত পরীক্ষা করবার অধিকার সকলেরই আছে; সুতরাং দীর্ঘকালব্যাপী পাশ্চাত্যানুকরণের মোহ যদি কাটতে আরম্ভ করে, আমাদের নিজের চোখ দিয়ে যদি আমরা জগৎকে দেখতে আরম্ভ করি তবে আমাদের সেটা শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নেই। আত্মনির্ভরতা, স্বাবলম্বন, মঙ্গলের পথে আমাদের নিয়ে যাবে; পরবশ্যতা বিবিধ দুঃখের মূল; এ কথা আমরা যতই বুঝ্‌তে পারবো ততই ভাল। কিন্তু নিজের পায়ে চলতে পারাই পরম পুরুষার্থ নয়, ঠিক পথে যাওয়ার কথাও ভাবতে হবে। আমরা ধর্ম্মপ্রাণ জাত, মিষ্টিক সাধনা ছাড়া আমাদের আর কিছু ভাল লাগে না,—এ সব কথা ব'লে যাঁরা ভারতের জাতীয়তাকে একটা বিশেষ রূপ দিতে চান, তাঁরা হিন্দু সভ্যতার একটা মনগড়া আদর্শ স্থির করেছেন। হিন্দু চেয়ে এসেছে ধর্ম্মার্থকাম একত্র এই তিনেরই সেবা,—"ধর্ম্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যাঃ, যো হ্যেকসক্তঃ স জনো জঘন্যঃ—কবির মধ্যে কালিদাসকে সে শ্রদ্ধাঞ্জলির অর্ঘ্য দিয়ে এসেছে, শেক্‌স্‌পীয়রকেও সেইরূপ অন্তরের ভক্তি উপহার দিতে পারে সে, দেশগত রুচিভেদ তার পথে অন্তরায় নয়। সাহিত্যের নোতুন প্রকাশভঙ্গীর সৃষ্টি তো কালিদাসও করে যাননি, কালিদাসও তো মিষ্টিক সাধনা শ্লোকে প্রকাশ ক'রে প্রাচ্য পাঠকের চিত্ত জয় করেননি, তাঁরও তো শব্দ-চয়ন ও সরসতা, নব নব চিত্রের সৃষ্টি ও সমাবেশ, পরম সম্পদ। সুতরাং ডক্টর সাহানীর সিদ্ধান্তের সঙ্গে প্রাচ্য হয়েও আমরা একমত হতে পারলাম না।

লেখকের উপকরণও অভ্রান্ত নয়। তিনি শেক্‌স্‌পীয়র যে আমাদের দেশে ভাল ভাবে অধ্যাপনা হয় না তার নজীরস্বরূপ শিক্ষাগারের ব্যঙ্গ্যচিত্র উদ্ধৃত করেছেন; সেরূপ ব্যঙ্গ্যচিত্র আমাদের দেশের প্রাচীন ও আধুনিক সকল সাহিত্যিকের সম্বন্ধেই সৃষ্টি করা যেতে পারে। পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা পত্রে রবীন্দ্রনাথের সুললিত রচনার দুর্দ্দশা কি ভাবে হয় তার যাঁরা পরিচয় পেয়েছেন তাঁরা একথা অবিসংবাদিতভাবে স্বীকার করবেন। আর, ভারতীয় ভাষায় শেক্‌স্‌পীয়রের আক্ষরিক অনুবাদ যে হতে পারে অন্ততঃ বাংলা সাহিত্যে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আছে,—গিরিশচন্দ্রের ম্যাক্‌বেথ্।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

The Meaning of Modern Sculpture—By R. H. WILENSKI
(Faber and Fab

বিলেন্সকি আজকালের শিল্পজগতে পরিচিত একজন উঁচ্‌কপালে শিল্পজ্ঞ কিন্তু রজার ফ্রাই-র আধুনিক ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে প্রবন্ধে যে ফিলিষ্টিয়াদ্বেষী দাম্ভিক ভয় পেয়েছিনুম, সে স্বাতন্ত্র্যগর্ব্ব বিলেন্সকির নেই। তার উপরে বিলেন্সকি যে ভালো ভাস্কর্য্যের ছবি দেখেও নাকি তৃপ্তিলাভ সম্ভব। কারণ ভালো মূর্ত্তির যথার্থ আকার নাকি স্বতই ফোটোদর্শনেও মনে আসে।

অবশ্য এ বই সমালোচনার অধিকার তাতে পাওয়া যায় না। কিন্তু জোরাল তর্করসাল রচনা হিসাবেও বইটা ভালো লেগেছে। প্রধানত গ্রীক শিল্পের মাহাত্ম্য ধ্বংসেই বিলেন্সকির মনোযোগ। কয়েকজন অসত্যবাদী ব্যবসাদার গ্রীক্ প দীর্ঘকাল ধরে গ্রীক্ উৎকর্ষের কল্পিত কাহিনী চালিয়ে লোকের ভাস্কর্য্য-জ্ঞান বি করেছেন, এই হল বিলেন্সকির প্রতিপাদ্য। ধরা যাক্ ফিডিয়াস্‌কে। তাঁর কো কাজ নেই এবং তিনি পার্থেনন্-শিল্পী ছিলেন না, ছিলেন ওবরসিয়র। অথচ আ ফিডিয়াস্-জয়ন্তীতে বহু পণ্ডিত প্রমত্ত। যে সব বিখ্যাত গ্রীক্ ভাস্করদের কোনো কা কেউ দেখেনি, তাঁদের দিব্যদর্শক ভক্তদের বিলেন্সকি উপভোগ্য ঠাট্টা করেছেন এবং কয়েকটা প্রস্তর-ব্যবসায়ী কি রকম উলঙ্গ মূর্ত্তি তৈরি করিয়ে হাতটা বা পা ভেঙে মাটিতে রেখে তারপরে গ্রীক নামে বিক্রি করত, তার ইতিহাসও সুখপাঠ্য। তাছাড়া অনেক তথাকথিত গ্রীক্ মূর্ত্তিই নাকি বনেদী রোমানদের ফরমায়েসে করা— মূর্ত্তিটা উলঙ্গ পুরুষ বা মেয়ে হবে, তা নাকি তাদেরই ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করত। এবং তাছাড়া যা গ্রীক্ ভাস্কর্য্যে থাকে, তা direct carving না বিলেন্সকির মতে একেবারে পাথর খোদাই না করলে ভাস্কর্য্য হয় না। কারণ ভাস্কর্য্য হচ্ছে বিয়োগের কাজ, চিত্রকলা বা clay modelling যোগের কাজ। কঠিন প্রতিযোজক বস্তুর সঙ্গে সহযোগিতায় ভাস্কর্য্যের জন্ম। ভাস্কর্য্যের রূপ তাই খানিকটা পাথরের টুক্‌রার মধ্যেই থাকে। গ্রীসে ছিল চিত্রকলারই প্রাধান্য, ভাস্কর্য্যের নয়।

এই গ্রীক্ ভূত মধ্যযুগে য়ুরোপের ঘাড় থেকে নেমে গিয়েছিল বটে। কিন্তু রেনেশাঁস্ আবার একে আনে। অবশ্য তখনও মাইকেল এন্‌জেলো ছিলেন। কিন্তু মাইকেল এন্‌জেলোর স্বকীয় প্রতিভান্বিত কাজও গ্রীক্ নামে বেচতে হত। এ ব্যবসাদার তো ধরা পড়ে গিয়ে শাস্তিভোগই করে। তারপরে এল রোমাণ্টিক মুখের উপরে ঝোঁক্, এল অসম্পূর্ণতা, শিল্পহীন চরিত্রচিত্রণ। বিলেন্সকির মতে এর চূড়ান্ত হল এপ্‌ষ্টাইনের অসাধারণ প্রতিভায়। এপ্‌ষ্টাইনের ব্রন্‌জ্ কাজের উপর অপেক্ষাকৃত বেশি ঝোঁক দিয়ে, তাঁর পাথরের কাজের উপর বিলেন্সকি অন্যায় করেছেন। যা হোক্, তারপরে এলেন সত্যকার শিল্পীরা, বিলেন্সকির বন্ধুরা—মূর্, বেড্‌ফর্ড, গদিয়ে, মোদিল্লিয়ানি, জাড্‌কিন্ ইত্যাদি। মাইওল বা ডবসনের শুধু নামোল্লেখ করা হয়েছে— যদিচ তাঁরা মূর বেড্‌ফর্ড্ আদির চেয়ে বেশি সফল, বেশি শক্তিশালী। বোধ হয় তাঁরা বিলেন্সকির বিশেষ বন্ধু নয়। এখানে বলা যাক্—পাছে দর্শক শিল্পাতিরিক্ত গুণে মুগ্ধ হয়, সেই ভয়ে মাইওল্ বা ডব্‌সন্ মূর্ত্তির শরীর বা মুখ বিকৃত গতশ্রী করেন না এবং পোর্ট্রেট্ করা যে পাপ নয়, ডব্‌সনের লিডিয়া লোপোকোভা নামে মিসেস্ কেন্‌সের প্রতিমূর্ত্তি দেখেও তা বোঝা যায়।

অবশ্য শিল্প তথা ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে বিলেন্সকির সাধারণ মতামতে ভুল নেই। তিনি নিজেই সক্রেটিসের ঘন, বক্ররেখা ও গোলের নিছক্ সৌন্দর্য্যের কথা উদ্ধৃত করেছেন। রাস্কিনও অক্স্‌ফর্ডে একটা স্ফটিক দেখিয়ে তার মধ্যেই ভাস্কর্য্যের প্রধান গুণের কথা বলেন। এড্‌না সেণ্ট ভিন্‌সেণ্ট্ মিলে তো তাই কবিতাই লিখেছেন Euclid alone has looked on beauty bare। আর যদি রেনল্‌ড্‌সের কয়েকটা কথাও উদ্ধৃত হয়, তাহলেই বিলেন্সকি সাবেককেলে হয়ে পড়েন। অবশ্য চৈনিক, পারসীক, নিগ্রো, সুমেরীয়, মিশরীয় ও ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে বিলেন্সকির সশ্রদ্ধ জ্ঞান আছে। কিন্তু Gudea বা Chertihotep বা অনুরাধাপুরের বুদ্ধমূর্ত্তির পাশে তাঁর বন্ধুদের কাজের ছবি প্রায় অর্থহীন ছেলেমানুষী বল্‌লেই হয়—আধুনিক ভাস্কর্য্যের ছাপ পড়া সত্ত্বেও। অবশ্য দোষ এ সব শিল্পীদের একলার নয়। ভাস্কর্য্য স্থাপত্যেরই প্রধান অঙ্গ। আর স্থাপত্যশিল্প বলে কোনো শিল্পই আজ নেই। তাই আধুনিক কাব্যের চেয়েও আধুনিক ভাস্কর্য্য ভিত্তিহীন ও বাহুল্যময়। অধিকন্তু এই সব শিল্পীরা এপ্‌ষ্টাইনের অসাধারণ দক্ষতাও পান নি। আর পাছে কোনো ভাস্কর্য্যবর্জ্জিত বিশেষত্ব তাঁদের পেয়ে বসে, পাছে জনচৈতন্য তাঁদের কাচের জানলা ভেঙে দেয়, এই ভয়েই এই শিল্পীদের সময় যায়। এই নেতি-র শুষ্ক অভ্যাসেই এঁদের রচনা প্রায়ই ব্যর্থ ও অনেক সময়েই বিরক্তিকর হয়ে পড়ে—বিশেষ করে বিলেন্‌স্কিদের জন্যই। বিলেন্‌স্কি বলেছেন—The modern sculptors have lost faith in the nineteenth century attitude. They no longer value contacts with local and individual manifestations of life ; they seek comprehension of universal and constant characters divined behind the individual manifestations। সাধু অন্বেষণ সন্দেহ নেই। কিন্তু হয়ত বা বিশ্বের এই অন্তর্হস্য ধরবার মতো যথেষ্ট পরিশ্রম এঁরা করেন নি বা সে অধিকার এঁদের নেই। কিম্বা হয়ত সমাজ ও সমসাময়িক মানসিক অভ্যাসের বাইরে গেলেই শিল্প ব্যর্থ হয়। কবিতাতে তো তাই পিওর পোয়েট্রি খুঁজলে এডোয়ার্ড লিয়ারের কাছে যেতে হয়। এবং যে দেশের শিল্পে এঁরা মুগ্ধ ও যার অনুকরণ এঁরা প্রায়ই করে থাকেন, সেই মিশরীয় নিগ্রো ভারতীয়াদি শিল্প কিন্তু বরাবর সমসাময়িক ঐতিহ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা মেনেছে।

অবশ্য এ সত্ত্বেও বিলেন্সকির বইটা ভালো লাগে। তাতে শিক্ষাও পাওয়া যায়। কিন্তু অজন্তা ও মহামল্লপুরমে এক জাতের কাজ নেই ও লিঙ্গরাজ মন্দির আছে ভুবনেশ্বরে, ভুবনেশ্বরীতে নয়।

শ্রীবিষ্ণু দে

Texts and Pretexts.—BY ALDOUS HUXLEY (Chatto and Windus).
Poems and Translations.—BY ROBIN FLOWER (Constable).
Thirty Poems.—BY NORA NISBET (Basil Blackwell).
A Tale of Troy.—BY JOHN MASEFIELD (Heinemann).

সকল দেশেই এক জাতীয় লোক আছে কাজ করিতে না পাইলে যাহারা হাঁপাই উঠে, কর্ম্মবিরতি যাহাদের নিকট অনস্তিত্বের নামান্তর। ভালো হউক, মন্দ হউক, একটা কিছু প্রত্যক্ষগোচর কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতেই হইবে, নহিলে সময় বৃথা নষ্ট হইল। এ ধরণের লোকের সাক্ষাৎ পাইলে অলডাস্ হাক্স্লি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ্যে জর্জ্জরিত করিতে দ্বিধা করেন না, অথচ "টেক্স্ট য়্যাণ্ড প্রিটেক্স্ট্" পড়িতে পড়িতে ভয় হয়, লোকে তাঁহাকেই এই দলভুক্ত ভাবিলে খুব অন্যায় করিবে না। অলডাস্ হাক্স্লি কর্ম্মী পুরুষ। বয়স তাঁহার আজও চল্লিশ পার হয় নাই, ইতিমধ্যেই তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভের উচ্চচূড়া বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। অক্স্ফোর্ড হইতে তিনি বাহির হইলেন সাফল্যের ধ্বজা উড়াইয়া। তারপর শিক্ষা সমাপ্ত করিতে সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ উপলক্ষে মায় এ অধম ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত দেখিয়া গিয়াছেন। অত্যন্ত মৌলিক তাঁহার রুচি, তাই তাজমহলের রূপরেখা তাঁহার নিকট ব্যর্থ। চরকা-আন্দোলনের ফলে ল্যাঙ্কাশিয়ারের তন্তুবায়গণের দুর্দ্দশা হইবে, অহিংসা-নীতির প্রবর্ত্তক তাহা বোঝেন না বলিয়া হাক্স্লি তাঁহার খর্ব্বদৃষ্টির খর সমালোচনা করিয়াছেন। কবিতা, নাটক, ছোটগল্প, বড়নভেল, ভ্রমণকাহিনী, শিল্পবিচার, সাহিত্য-প্রবন্ধ, দার্শনিক গবেষণা, রচনার এহেন কোন বিষয় আছে যাহাতে তিনি আপন নামাঙ্কিত পুস্তক প্রকাশ করেন নাই? তাই আজ ইংলণ্ডের আধুনিক লেখকগণের মধ্যে তাঁহারই নাম সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত। অবশ্য তিনি এমন কবিতা, বা নাটক, গল্প বা উপন্যাস আজও লেখেন নাই যাহা কবিতা হিসাবে, নাটক হিসাবে, বা গল্প হিসাবে প্রথম শ্রেণীত্বের দাবী করিতে পারে; এমন কোনো দার্শনিক মতবাদের অট্টালিকা গড়েন নাই যাহাতে মানবমনের বর্ত্তমান সমস্যাগুলি যথাযথ সমাধান লাভ করিয়া নির্ব্বিরোধে বিশ্রাম করিতে পারে; রাষ্ট্রনীতি বা অর্থনীতির এমন কোনো তত্ত্ব উদ্ঘাটন করেন নাই যাহাতে জাতিবৈষম্য বা সম্পত্তিবৈষম্যের নিরাকরণ হয়। এই স্তরের প্রতিভা হাক্স্লির অনায়ত্ত। তাঁহার প্রতিভা ধ্বংসপ্রবণ, অভাবদ্যোতক। বর্ত্তমানের প্রতি অসন্তোষ তাঁহার প্রধান প্রেরণা। জীবনে, সাহিত্যে, চিন্তায়, সাধনায় যেখানেই মেকী, অস্বচ্ছতা, অগভীরতা, সংকীর্ণতা আসন পাতিয়াছে, হাক্স্লির তীক্ষ্ণসন্ধানী দৃষ্টি সেখানেই আলোকপাত করিয়া তাহাদের অকাম্য কদর্য্যতা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। বর্ত্তমান বিত্তসিদ্ধ আত্মতুষ্টির যুগে, গণমনের রঞ্জন-ব্যবসার যুগে, ইহা অত্যন্ত গৌরবের কথা। এ মনোবৃত্তি সত্ত্বেও তাঁহাকে লোকপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও রচনার আকর্ষনী-শক্তি। মনে হয় পরিশীলিত সমাজের আলোচনার এমন কোনো বিষয় নাই যাহার সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান একেবারে তাজা ও নির্ভরযোগ্য নহে। আর লেখার চমকপ্রদ দ্যুতিমান ভঙ্গীতে, পরিহাসের আপাত-নিরীহ রুদ্রতায়, ও বক্তব্যের অনাবৃত স্পষ্টতায় তিনি ইতিমধ্যেই রাসেল বা শ-এর সমপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত।

আলোচ্য গ্রন্থখানি কবিতাসংগ্রহ, একটু নূতন ধরণের—an anthology with commentaries। সংগ্রহে ইংরাজী কবিতার সংখ্যাই অত্যধিক, তবে ফরাসী,

ইতালীয়, লাতিন কবিতার সংখ্যাও কম নহে। এগুলির ইংরাজী অনুবাদ দেওয়ার প্রয়োজন হাক্স্লি বোধ করেন নাই, যেহেতু এ ভাষাগুলির সহিত তিনি পরিচিত। অথচ গ্রীক ও জর্ম্মান হইতে বচন বা শ্লোক উদ্ধার করিবার সময় মূল না দিয়া অনুবাদ দিয়াছেন, বোধহয় নিজে জানেন না বলিয়া। যে হাক্স্লি এত জিনিস জানেন, এ দুটি বিখ্যাত ভাষা তাঁহার জানা নাই ইহাতে দুঃখ ও আনন্দ দুইই হয়। দুঃখ, তাঁহার জ্ঞানের অসম্পূর্ণতায়; আনন্দ, তিনিও সীমাবদ্ধ মানুষ ভাবিয়া, যে কথা হাক্স্লি-উপাসকেরা প্রায়ই ভুলিয়া যান। ইংরাজী কবিতা নির্ব্বাচনে হাক্স্লি পরপদাঙ্কিত মার্গে যাইতে লজ্জা বোধ করেন; ইংরাজী কাব্য-সমুদ্র হইতে এমন কবিতা-মৎস্য (তাঁহার স্বকীয় উপমা) তুলিতে চান যাহা পলগ্রেভ, কুইলার-কাউচ ও ব্রিজেস-এর জালে ধরা পড়ে নাই।

স্বীকার করিতে হইবে কবিতা হিসাবে বইটি ভালোই হইয়াছে। সুপরিচিত কবির সহিত অপরিচিত কবির, সুপরিচিত কবিতার সহিত অপরিচিত কবিতার স্থান করিয়া দিয়া হাক্স্লি আপন বিদ্যাবিস্তারের ও উদার রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ইহাতে তাঁহার হাক্স্লিত্ব ফুটে না। তাই কবিতাগুলিকে বিষয়ভেদে প্রায় ত্রিশটি গুচ্ছে বিভাগ করিয়া তিনি তাহাদের উপর নানা মন্তব্য প্রক্ষেপ করিয়াছেন। মন্তব্যের প্রয়োজনীয়তা তিনি ভূমিকায় বিবৃত করিয়াছেন—

In a rapidly changing age, there is a real danger that being well-informed may prove incompatible with being cultivated. To be well-informed, one must read quickly a great number of merely instructive books. To be cultivated, one must read slowly and with a lingering appreciation the comparatively few books that have been written by men who lived, thought and felt with style.

In the course of last half century, the conceptions in terms of which men interpret their experience have been altered by science out of all recognition. Superficially, therefore, much of the great poetry of the past is out of date. But only superficially; for the fundamental experience remains almost unaltered. It is not difficult to decode, as it were, the older interpretations, to translate them into our own terms. This is one of the things I have tried to do in my commentaries.

এইখানেই তাঁহার স্পর্দ্ধিত অভীপ্সা ও তদনুরূপ সাধনার স্বল্পতা ধরা পড়ে। এমন নহে যে তিনি কোনো ভালো কথা বা চিন্তাযোগ্য টিপ্পনী করেন নাই। হাক্স্লির কোন লেখাই একেবারে তুচ্ছ হইতে পারে না। কিন্তু হাক্স্লি বলেন, তিনি এই পুস্তকে দিতে চাহিয়াছেন সমসাময়িক মনোবৃত্তির সম্পূর্ণ সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ—দান্তে যাহা মধ্যযুগের বেলায় করিয়া গিয়াছেন তাঁহার "দিভিনা কোমেদিয়া"য়, It would have been better, I repeat, to write both poetical text as well as commentaries oneself—a new Divine Comedy;

দান্তের কবিত্বশক্তি তাঁহার থাকিলে তিনি নিশ্চয় তাহা করিতেন ; তবে তিনি সবিনয়ে স্বীকার করিতেছেন যে সে-শক্তি তাঁহার নাই। এই হীনতায় তিনি লজ্জিত নহেন, যেহেতু বিগত সহস্র বৎসরের মধ্যে এ শক্তি পাঁচ ছয় জন নরনারী ব্যতীত কাহারও ভাগ্যে জোটে নাই। অতএব হাক্‌স্‌লির আত্মতৃপ্তি বজায় রহিল। তিনি নির্ভাবনায় প্রাচীন কবিতার সহিত আধুনিক মন্তব্য গাঁথিতে লাগিলেন।

ভুলিয়া গিয়াছি কোন দার্শনিক একবার বলিয়াছিলেন, মূর্খে একঘণ্টায় বহু প্রশ্ন করিতে পারে, জ্ঞানীব্যক্তি সারা জীবনেও তাহার উত্তর দিয়া উঠিতে পারেন না। হাক্‌স্‌লিকে মূর্খ বলার দুঃসাহস কাহারও থাকিতে পারে না ; তবু এ বইটি পড়িবার সময় বার বার সেই কথাটাই মনে আসে। জীবন, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রশ্ন তোলা হইয়াছে, কিন্তু যে স্বতঃবিরোধহীন সুসঙ্গত মীমাংসা সুগভীর সাধনার ফল, তাহা কোথায় ? ভাষার চোখ-ঝলসানো ছটা তাহার অভাব পূরণ করিতে পারে না। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। কাব্যে স্পষ্টতা কাহাকে বলে, ও অস্পষ্টতার দোষ গুণ লইয়া চিরন্তন তর্ক চলিয়া আসিতেছে। হাক্‌স্‌লি অস্পষ্টতার বিরোধী— I like things to be said with precision and as concisely as possible অতি সুস্পষ্ট উক্তি ; কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি সেই সঙ্গেই জুড়িয়া দিয়াছেন— This does not mean, of course, that I would like all poets to say their say in four line epigrams and the style of Voltaire. Certain things (কোনগুলি ?) can only be expressed at considerable length and in terms of the most improbable metaphors, an abracadabra of magic syllables. There are occasions when the poet who would write precisely must be (by the standard of text-book prose) obscure and fantastic.। সুতরাং দেখা যাইতেছে, হাক্‌স্‌লির অতি-আধুনিক বিজ্ঞতা সত্ত্বেও, পুরাতন সমস্যা যেখানেই ছিল, সেখানেই রহিয়া গেল। সমস্ত বইটি এইরূপ অন্যমনস্ক ও ব্যস্তসমস্তভাবে লেখা। নবযুগের দান্তের উপযোগী গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে চাহিলে গভীরতর সমাহিত সাধনার প্রয়োজন।

সমুদ্রে জোয়ার-ভঁাটার মতো সাহিত্যের বাজারে তেজী-মন্দী-র খেলা চলে, একথা সাহিত্যসেবী মাত্রেই জানেন। হাক্‌সলির মতে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান কাব্য-রচনায় মন্দা লাগিয়াছে। কথাটা সত্য। কাব্যরচনার পরিমাণ কিছুমাত্র কমিয়াছে বলিয়া লাগে না, বরং বোধ হয় উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে ; ইহাও বলা চলে না যে যাঁহারা লিখিতেছেন, তাঁহারা সকলেই অকবি। তবু একথা মানিয়া লইতে হয়, তাঁহাদের মধ্যে কেহই মুখ্য কবি নহেন, গৌণ কবি। কাব্যে মুখ্য-গৌণের সীমা রেখা নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে, অসম্ভব বলিলেই হয়। টেনিসন, ব্রাউনিং, রোজেটি, সুইন্‌বার্ণ, ইঁহারা মুখ্য কবি কি না, ইহা লইয়া অনন্তকাল তর্ক চলিতে পারে। কিন্তু ইঁহাদেরও অনুরূপ প্রতিভান্বিত কবি আজকাল ইংলণ্ডে কেহ লিখিতেছেন কিনা সন্দেহ। বহুশতাব্দীব্যাপী কাব্যসাধনার ফলে ইংরাজীভাষার সম্পদ এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে অন্তপ্রেরণার অভাব অনায়াসেই শিল্পচাতুর্য্য দিয়া লুকানো যায়। তাই আজকালকার কবিদের রচনা অত্যন্ত সুখপাঠ্য ও অনেকাংশে উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। এখানে অবশ্য সেই সব কবির কথা বলা হইতেছে যাঁহারা উদ্ভট মৌলিকতার চর্চ্চা করেন না।

কিন্তু সৃজনী-প্রতিভার স্থান কখনই মার্জ্জন-পরিপাটিত্ব দিয়া পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই ইহাতে যে-তৃপ্তি পাওয়া যায় তাহার আড়ালে থাকে অতৃপ্তির ব্যঞ্জনা। এই ভাবিয়া দুঃখ হয়, যাঁহারা এত সুন্দর করিয়া বলিতে পারেন, তাঁহাদের বলিবার কথা কেন আরো গভীর, আরো বিশাল হইতে পায় না।

রচনাভঙ্গীতে আপাত-সারল্য ফুটাইয়া তুলিতে হইলে কত যে বিচিত্র কৌশল প্রয়োগের প্রয়োজন হয় তাহা মিস্ নোরো নিস্‌বেট্-এর "থার্টি পোয়েম্‌স্"-এর যে কোনোটিতে চোখ বুলাইয়া গেলে বুঝিতে পারা যায়। অথচ ইনি নবীন কবি, এই ত্রিশটি কবিতার গুচ্ছ হাতে করিয়াই কাব্যলোকে ইঁহার প্রথম প্রবেশ-পদক্ষেপ। আশা করা যায়, কালক্রমে ইনি আরো অগ্রসর হইবেন। ইঁহার রচনায় সংযমের দৃঢ়তা ও রুচির সৌকুমার্য্য প্রশংসনীয়। স্বশীল ও স্বেতর— সাব্‌জেক্‌টিভ্ ও অব্‌জেক্‌টিভ্—গীতি-কবিতার এই দুই বিভাগেই তাঁহার কৃতিত্বের উদাহরণ স্বরূপ, দুটি কবিতা উদ্ধৃত করা গেল—

DARK STAR.

Lovely are these:—
The morning light on trees,
Blue satin seas
With white embroidered sails,
Moon-drunken Nightingales . . .
Thick honey, dropping slow.
Lovely are these . . .
But I was born
Under a strange, dark star,
I am a foamless wave forlorn
Drawn upwards for a space ;
Striving to reach
The moon's untroubled face,
And doomed to die
Defeated by the terror of the sky.

THE DEFAULTER.

Dawn through a narrow window steals apace
Spilling cold light upon the sleeper's face.
One hand is flung back and upward, with the fingers
Uncurled as though to seize
Something that fled with night. A shadow lingers,
Like a caress, upon heavy eyes
That mock our busy world with faint surprise.

ব্রিটিশ মিউজিয়মের হস্তলিখিত পুঁথি বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ ডাঃ রবিন্ ফ্লাওয়ার সুপণ্ডিত ব্যক্তি। প্রকৃত পাণ্ডিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ, ধীরত্ব। সে গুণ ইঁহার আছে। কুড়ি বৎসর ধরিয়া ইনি কবিতা লিখিতেছেন, অথচ প্রকাশ করিবার জন্য তাড়াহুড়া করেন নাই। সস্তা ছাপাখানার যুগে এ প্রকাশকুণ্ঠা নিশ্চয়ই সম্ভ্রমের যোগ্য। "পোয়েমস্ এণ্ড ট্রান্‌স্‌লেশনস্"-এর স্বল্পাংশ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, অধিকাংশই নূতন। ইনি জাতিতে আইরিশ। অনুবাদখণ্ডে ইনি অষ্টম শতাব্দী হইতে

সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাচীন আইরিশ ভাষায় লিখিত গীতিকবিতা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে একটি লুপ্তপ্রায় লোকসাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যা সাহিত্যসেবীগণের নিকট ইহা কম লাভের কথা নহে। অনুবাদপন্থা সম্বন্ধে বলেন—

Some apology is perhaps necessary for the substitution of simple English lyrical measures for the intricate and subtly interwoven harmonies of alliteration and internal rhyme in the Irish. But the attempt to borrow these qualities of verse could only end in mechanic exercise, which might be a metrical commentary, but could not be poetry. And to translate poetry by less than poetry is a sin beyond absolution.

অনুবাদ করার জন্য ডাঃ ফ্লাওয়ারকে কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে বলিয়া বোধ হয়। মূল জানা না থাকায় মূলের প্রতি তাঁহার অনুবাদ কোন অবিচার করিয়াছে বলা যায় না, তবে সেগুলি অধিকাংশ স্থলেই সুখপাঠ্য কবিতা হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই বিগতযুগের সুপণ্ডিত শিক্ষক উইলিয়ম্ করির কথা মনে পড়ে, যিনি অনেকগুলি গ্রীক কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু 'আয়োনিকাস্'-এ করির যে সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায়, ডাঃ ফ্লাওয়ার তাহা অর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। করি-র অনুবাদ ইংরাজী সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে, এমন কি কাব্যচয়নগ্রন্থেও স্থান পাইয়াছে। এ সৌভাগ্য ডাঃ ফ্লাওয়ার-এর পক্ষে ভাবা শক্ত।

মৌলিক কবিতাতে ফ্লাওয়ার শক্তির আভাস দিয়াছেন কিন্তু বড় কবি হইয়া উঠিতে পারেন নাই, সাধারণের অপেক্ষা উর্দ্ধে উঠিয়াছেন, কিন্তু অসাধারণত্ব তাঁহাকে এড়াইয়া গিয়াছে। বাঙালীর সহিত আইরিশ-এর প্রকাণ্ড মিল, প্রখর দেশাত্মবোধে। তাই ফ্লাওয়ার-এর স্বদেশ-প্রীতি-মূলক একটি কবিতা এখানে তুলিয়া দেওয়া গেল।

THE PASSAGE.

The dark cliff towered up to the stars that flickered
And seemed no more than lights upon its brow,
And on the slippery quay
Men talked—a rush of Gaelic never-ending.
I stepped down to the boat,
A frail skin rocking on the unquiet water,
And at a touch she trembled
And skimmed out lightly on the moonlit seaway.
I lying in the stern
Felt all the tremble of water slipping under,
As wave on wave lifted and let us down.
The water from the oars dripped fiery ; burning
With a dull glow great globes
Followed the travelling blades. A voice rose singing
To the tune of the running water and loud oars:
" I met a maiden in the misty morning,
And she barefooted under rippling tresses,
I asked her was she Helen, was she Deirdre?

She answered: ' I am none of these, but Ireland.
Men have died for me, men have still to die,' "
The voice died then and, growing in the darkness,
The shape of the Great Island
Rose up out of the water hugely glooming,
And wearing lights like stars upon its brow.

আর একটি কবিতায় ফ্লাওয়ার বলিতেছেন তিনি একরাত্রে ঘুমাইয়া পড়েন The Trojan War's Economic Causes নামক বইটি পড়িতে পড়িতে—জানিতে ইচ্ছা করে কার্ল্ মার্ক্স্-এর কোন ভক্ত শিষ্য বইটি লিখিয়াছে, সন্দেহ জাগে হয়ত এ ব্যাপারটা কবিকপোলকল্পিত। ঘুমের ঘোরে—কবিকে স্বপ্নে পাইল।

Then, as the hours of night grew deep
A dream came through the passes of sleep
Of the silly stories of Homer's telling:
The press of the ships, the gathering hum,
Iphegeneia dying dumb,
The Greek tents white on the Trojan shore,
Achilles' anger and Nestor's lore,
The dabbled hair of the heroes lying
Mid the peace of the dead and the groans of the dying,
Hector dragged through the battle's lust,
The locks of Priam down in the dust,
Andromache's agony, Ilion's fall
And, over all,
The lovely vision of naked Helen.

ভাবিলে বিস্মিত ও পুলকিত হইতে হয় যে তিন হাজার বছর পূর্ব্বেকার এক অন্ধ (?) কবির "silly stories" আজও ইউরোপের কবিচিত্ত অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। এ প্রভাবের প্রতাপ প্রতিপন্ন হয় মেস্‌ফিল্ড্-এর 'এ টেল্ অব্ ট্রয়' পড়িলে। মেসফিল্ড আজ ইংলণ্ডের রাজকবি, কিন্তু তাঁহার কবিযশ বহুদিন হইতেই সুপ্রতিষ্ঠিত। এরূপ উচ্চপদস্থ কবিও ট্রয়ের আবাল্য পরিচিত কাহিনী লইয়া কাব্যগ্রন্থ প্রণয়নে লজ্জা বা অপমান বোধ করেন নাই। হোমার, ভার্জ্জিল, গ্রীক নাট্যকারত্রয় প্রভৃতি মহাকবিগণের সমকক্ষতা করিবার স্পর্দ্ধা প্রকাশও তাঁহার অভিপ্রেত নহে। কারণ বিভিন্ন ছন্দে রচিত এগারোটি ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করা এই ট্রয়-কাহিনী মেস্‌ফিল্ড্ এমনভাবে সাজাইয়াছেন যাহাতে আদ্যোপান্ত গল্পটি বলিয়াও পূর্ব্বগামী কবিগুরুদিগের পুনরাবৃত্তি অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে না হয়। যে ঘটনাটিতে মেস্‌ফিল্ড্ সকলের চেয়ে বেশী সময় ও মনোযোগ দিয়াছেন তাহা বোধহয় পূর্ব্বতন কোন কবিরই দৃষ্টি যথেষ্টভাবে আকর্ষণ করিতে পারে নাই—অর্থাৎ সেই সুবিখ্যাত কাষ্ঠঘোটকের অনুষ্ঠানটি। ইহার বর্ণনায় তাঁহার উৎসাহের সীমা নাই—ট্রয়-কাহিনীতে ইহা অযথা প্রাধান্য পাইয়াছে। বেশ বোঝা যায়, আজ পঞ্চাশোর্দ্ধে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া অক্সফোর্ডের প্রান্তস্থ সুরম্য বোর্‌স্ হিলে শান্তশিষ্ট হইয়া বসবাস করিলে কি হইবে, তাঁহার যৌবন-প্রারম্ভের সামুদ্রিক জীবনের চঞ্চলতা ও অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয়তা এখনও তাঁহার মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। আর ভাষা, মেসফিল্ড-এর ভাষা এমনই গদ্যধর্ম্মী যে স্বয়ং ওয়ার্ডসওয়ার্থ শুনিলেও চমকিত হইয়া উঠিতেন। "এ টেল্ অব ট্রয়"-এর আরম্ভ এইরূপ :—

Menelaus, the Spartan King,
Was a fighting man in his early spring,
With a war-cry loud as a steer's bellow,
And long yellow hair, so the poets sing.

হোমারের সাগর-গম্ভীর ষট্‌পর্ব্বিকাকে স্মরণ করিলে এ ছন্দ কানে অত্য-লঘু ঠেকে সন্দেহ নাই, মনে হয় ইহা সূর্য্যের পাশে জোনাকির মতো নিষ্প্রভ, তথা-মেসফিল্ড অকারণে ইহাকে ব্যবহার করেন নাই। তিনি জানেন ব্যালাড-জাতী-ছন্দের বিশেষত্ব এই যে ইহাতে গল্পের গতি অত্যন্ত দ্রুত করিয়া তোলা যায়, আর তিনি যে ভুল করেন নাই তাহা প্রথম পরিচ্ছেদের শেষ পর্য্যন্ত যাইবার পূর্ব্বে বোঝা যায় –

But he wearied of war, and longed to bide
In quiet at home by his fireside ;
He wooed and wedded the beautiful Helen
And carried her home to be his bride.

And little delight was hers, poor thing,
To be tied till death to the Spartan King,
She moved in a cage of the Spartan court
Like a bright sea-bird with a broken wing.

Paris came from a Trojan glen,
The prince of the world's young famous men,
With a panther's eye and a peacock air,
Even the goddesses wooed him then.

He came from Troy to the Spartan port,
He moored his galley: he rode to court
In a scarlet mantle spanged with gold
On a delicate stallion stepping short.

Helen and he knew each from each
That a red ripe apple was there in reach,
The loveliest girl and the loveliest lad
Ready to learn and ready to teach.

He said, " O Helen, why linger here
With the King your husband year by year?
What life is this to a star like you,
The brightest star in the atmosphere?

O beautiful girl, I love but you,
And a life of love is your rightful due:
Come with me over the sea to Troy,
Where Queens shall ride in your retinue."

She said to him, " O Paris, my own,
Since I married him I have lived so lone
That life is bleak as a withered bone,
O take me hence into light and life,
My spirit within me turns to stone."

Then Paris said, " But we will not fly
Like thieves that have heard a step draw nigh.
You are the Queen and I am I ;
I'll carry you off to my golden ship
At noonday under your husband's eye."
So it was planned, so it was done,
Paris and she were there at one,
The sentry bribed and the door undone,
With a waiting ship and a rising wind
Helen was off with Priam's son.

মেসফিল্ড এ কথা ভোলেন নাই যে সর্ব্বত্র এ ছন্দ সুপ্রযোজ্য নয় ; তাই ভাবভেদে তিনি ছন্দবিভেদ অতি সুচারুরূপেই সম্পন্ন করিয়াছেন। ষট্‌পর্ব্বিকা ইংরাজী কাব্যে খুব সুপ্রচলিত নয়, অথচ ক্লাইটেম্‌নেষ্ট্রার উক্তিতে মেসফিল্ড তাহার একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উদাহরণ দিয়াছেন ;—

I am that Klytaimnestra whom Agamemnon wedded,
Queen of a beautiful land in a city rich in gold.
Would that my happy fortune might strike me suddenly dead.

কিন্তু মেসফিল্ড তাঁহার কবিত্ব শক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখাইয়াছেন এই বইটির পরিশিষ্টে—

Though many died and many fled
To live as beasts do, without bread,
Or home, or bed,

Yet many, like myself, am slave,
Weeping the life the spirit gave
Into the grave.

However long our lives may be,
There is no hope of getting free
To such as we.

Swallows will come again, and flowers,
Not Troy, who guarded with her towers
That life of ours.

What help in giving way to tears?
To those most hurt by Fortune's spears
A spirit nears.

The spirit whom the prisoner knows,
And broken wretches faint from blows :
It comes most close.

And though I tread the unknown stair
Up, into Death, I shall not care,
It will be there.

ভুবনবিখ্যাত নগরীশ্রেষ্ঠ ট্রয়ের অগ্নি-ধ্বংসের পর বিজিত ক্রীতদাসীকৃত ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা রাজকুমারী কাসাণ্ড্রার এই মর্ম্মস্পর্শী খেদোক্তি মানবের ও নিয়তির নিষ্ঠুর হত্যালীলার উপর একটি সকরুণ ভাবঘন প্রশান্তির যবনিকা টানিয়া দেয়।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

The Letters of D. H. Lawrence (Heinemann).

Apocalypse—BY D. H. LAWRENCE (Secker).

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রমসাধ্য সৌখীনতা লরেন্সের পত্রাবলীতে একেবারেই পাওয়া যায় না। লরেন্সের রচনায় যে স্বতঃস্ফূর্তিতে, যে প্রতিভার আয়াসহীনতায় মুগ্ধ হই, সেই সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য পাই এই পত্রাবলীর অনেকগুলিতেই। লরেন্স্ মারা যাবার পর দুটী বই বেরোয়। প্রবন্ধটীতে মানবজীবন ও যীশু সম্বন্ধে যে মনোযোগ ছিল, তা নিছক্ সাহিত্যিক মূর্ত্তি পেয়েছিল The Man Who Died-এ। Apocalypse তারই আরো স্পষ্ট ও যুক্তিপ্রবণ মতামতের প্রচার। মরণাহত লরেন্সের এই শয্যাশায়ী রচনার অসংশোধিত আশ্চর্য্য গন্ধ ভূমিকা-লেখক অল্‌ডিংটনের মতো সবাইকেই অভিভূত করে। ছোট ছোট স্পষ্ট বাক্য জুড়ে যে কি ছন্দ আনা যায় ও কি যুক্তিহীন কাব্যলোক সৃষ্টি করা যায়, তা দেশছাড়া নির্য্যাতিত রোগীর এ শেষ রহস্যোদ্ঘাটনেও পাওয়া যায়। যে প্রতিভা তাঁর সব রচনাতেই অতীতে আমাদের কমবেশি অভিভূত করেছে, সেই প্রাণশক্তির আভাস এ দুটী বইয়েও ক্ষণে ক্ষণে পেলুম—যদিচ চিঠিগুলি পেশাদার পত্রলেখকের নয় ও প্রবন্ধটী টীকার সংযত রীতিতেই লেখা।

এ দুটী বই পড়ে আমার মনে হল যে লরেন্স্ সম্বন্ধে মুখ্য বিবেচ্য হচ্ছে এই প্রতিভাই, এই অসাধারণ প্রাণশক্তি ও রূপদক্ষতাই। লরেন্স্ ছিলেন ব্লেকের জাতের। পৃথিবীর ব্লেকেরা, পাস্কালেরা, গান্ধীরা আর যাই করুন, সাধারণ বুদ্ধির, সমাজশোভন স্বাস্থ্যের ধার ধারেন না। তাঁদের মতামতে যে লাভ হয় না, তা নয়। লরেন্স্ বা ব্লেকের মস্তিষ্কহীনতাবাদ আমাদের অনেকেরই জীবনবোধ ধারালো করতে পারে। কিন্তু তাঁদের মতবাদে যেটুকু অনুকরণীয় সে হচ্ছে তাঁদের সঙ্গতির আকাঙ্ক্ষা, জড়চৈতন্য বা প্রাণচৈতন্যের একচ্ছত্রতা স্বীকার নয়। সাধু পল বা গান্ধী যেরকম একদেশদর্শী মাত্রাজ্ঞানহীন, তাঁদের বিপক্ষের নেতারাও তাই। অবশ্য লরেন্স্ নিজেকে ঠকান্ নি—তাঁর মতের পারমার্থিক ও নৈতিক এবং সামাজিক ফলাফলের দায়িত্বও তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন। স্বীকার করেন নি শুধু তার মানসিক অসম্ভবতাটুকু। ইংরেজি রোমান্টিক্ উচ্ছৃঙ্খলতার শৃঙ্খল লরেন্সের কলমেও জড়ানো ছিল।

অল্‌ডাস্ হাক্‌স্‌লির সানুরাগ শ্রদ্ধা সেইজন্যই লরেন্সের প্রতি উৎসরিত হয়েছিল। বুদ্ধিমান ও বিদ্বান্ হিসাবে অগ্রগণ্য হলেও হাক্‌স্‌লির মধ্যে ঐ একটু পলীয় ভাব, একটু সেকালের ব্রাহ্ময়ানা, দেহের প্রতি একটু বিতৃষ্ণা গোপন আছে। এবং হাক্‌স্‌লি জানেন যে সে ভাব একেবারেই কাম্য নয়। তাই সাদা ও কালোর মতো হাক্‌স্‌লি ও লরেন্সের বন্ধুতা। এই বন্ধুতার সব চেয়ে উজ্জ্বল স্মৃতি হচ্ছে—পত্রাবলীর ভূমিকা যাতে তিনি লিখেছেন—He might propose impracticable schemes, he might say or write things that were demonstrably incorrect or even on occasion (as when he talked about science), absurd. But to a very considerable extent it didn't matter. What mattered was always Lawrence himself, was the fire that burned within him, that glowed with so strange and marvellous a radiance in almost all he wrote। এবং ডায়েরির থেকে—"He is one of the few people I feel real respect and admiration for. Of most other eminent people I have

met I feel that at any rate I belong to the same species as they do. But this man has something different and superior in kind, not degree." . . . A being, somehow, of another order; more highly conscious, more capable of feeling than even the most gifted of common men। এবং যদিচ লরেন্স্ ছিলেন অতি অমায়িক বন্ধুতাপ্রবণ ও সাদাসিধে মানুষ—তবু To be with him was to find oneself transported to one of the frontiers of human consciousness। এই আশ্চর্য্য বোধশক্তিই, অগোচরজ্ঞানই, কল্পনার এই বাস্তবতাই লরেন্সের রচনাকে ও অনেকাংশে জীবনকে অদ্ভূত করেছে। কারণ লরেন্সের প্রকাশক্ষমতাও ছিল অসাধারণ।

লরেন্সের জীবনীর দ্বারা যে তাঁর সাহিত্যরচনার অর্থ করা যায় না, হাক্‌স্‌লির একথা আমিও মানি। এবং লরেন্সের মতো আর্টিষ্টের পক্ষে পারিপার্শ্বিকের ছায়াও যে গৌণ, তাও আমি জানি। আবেগজীবন্ত কল্পনায়, তীব্র বোধশক্তিতে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যে বহু অজ্ঞাত রহস্য রয়েছে, তার প্রখর উপলব্ধিতে তাঁর জীবন চঞ্চল ও রচনা অসামান্য হয়ে উঠেছিলো। লরেন্সের মন ছিল হুইট্‌ম্যানের সেই শিশুর মতো, যে প্রতিদিন পৃথিবীতে নূতন ক'রে চ'লে যেত, যার কাছে বিশ্ব ছিল নিত্য নূতন আবিষ্কার। লরেন্সের বিশেষত্ব হচ্ছে যে, সে আবিষ্কারে শুধু জানার চেনার বিস্মিত আনন্দ নেই, তাতে আছে পরিচিতের অন্তরস্থ রহস্য—সমস্ত কিছুর পরিচয়ান্তের মিলনান্তের the essential otherness, বা বিশ্বের আদি রহস্য। তাই প্রেমের বিস্ময়কর একাত্মতার মতোই, প্রেমের অতিগভীরেও যে দুই চৈতন্যের নগ্ন দ্বৈততা, সেই ভেদরহস্যও লরেন্সকে মুগ্ধ করেছিল। সভ্যতার বিজলীআলোয় এই অনাবস্থার রহস্যময় উপলব্ধি আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। বুদ্ধির স্পষ্টতায় অভ্যস্ত ও পল্লবগ্রাহী হৃদয়বৃত্তি নিয়ে আমাদের তাই লরেন্সকে দুর্ব্বোধ্য লাগ্‌তে পারে। বিশেষ করেই লাগতে পারে, কারণ লরেন্সের মতে এই otherness-এর উপলব্ধিতেই মানবজীবনের সার্থকতা। এইখানেই তাঁর তত্ত্ব, তাঁর নীতি ও সভ্যতাসংস্কারের ভিত্তি। ১৯১৪ সালে গার্নেট্‌কে লেখা এক চিঠিতে এই চৈতন্যলোকের কথাই লরেন্স্ লেখেন—" . . . but somehow, that which is physic—non-human in humanity, is more interesting to me than the old-fashioned human element, which causes one to conceive a character in a certain moral scheme and make him consistent. The certain moral scheme is what I object to. In Turgenev, and in Tolstoy and in Dostoievsky, the moral scheme into which all the characters fit—and it is nearly the same scheme—is, whatever the extraordinariness of the characters themselves, dull, old, dead. When Marinetti writes: 'It is the solidity of a blade of steel that is interesting by itself, that is, the incomprehending and inhuman alliance of its molecules in resistance to, let us say, a bullet. The heat of a piece of wood or iron is in fact more passionate, for us, than the laughter or tears of women'—then I know what he means. He is stupid, as an artist, for

contrasting the heat of the iron and the laugh of the woman. Because what is interesting in the laugh of the woman is the same as the binding of the molecules of steel or their action in heat: it is the inhuman will, call it physiology, or like Marinetti, physiology of matter, that fascinates me. I don't so much care about what the woman feels—in the ordinary usage of the word. That presumes an ego to feel with. I only care about what the woman is—what she is—inhumanly, physiologically, materially—according to the use of the word: but for me, what she is as a phenomenon (or as representing some greater inhuman will), instead of what she feels according to the human conception. . . . You mustn't look in my novel for the old stable ego of the character. There is another ego, according to whose action the individual is unrecognisable, and passes through, as it were, allotropic states which it needs a deeper sense than any we've been used to exercise, to discover are states of the same single radically unchanged element. (Like as diamond and coal are the same pure single element of carbon. The ordinary novel would trace the history of the diamond—but I say, 'Diamond, what! This is Carbon.' And my diamond might be coal or soot, and my theme is carbon.)'' চৈতন্তের এই গভীর স্তরে বারবার আসে অন্তের কঠিন অন্ততা—otherness। এই অন্ধকার নিঃসঙ্গলোক ফ্রেজার্ ও ফ্রয়েড্ পাঠান্তেও কল্পনায় অনেকের কাছে অস্পষ্ট থাকতে পারে। ভুল বোঝার সে সম্ভাবনা লরেন্স্ও জানতেন। কিন্তু তাঁর শক্তি—হাক্স্লির ভাষায় daimon তাঁকে তবু মুক্তি দেয়নি। আর তিনি বাস্তবিক মুক্তি চান্ নি—নিজের স্বভাব থেকে মুক্তির প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া ক্ষমতার জ্ঞানও তাঁর ছিল—যদিও তিনি প্রেরণাবাদী ছিলেন। তাই তিনি বন্ধু গার্ণেট্কে লিখেছিলেন Sons and Lovers প্রসঙ্গে—It is a great tragedy, and I tell you I have written a great book। নিজের এ বিশেষ শক্তিকে লরেন্স্ বহু বাধা থাকলেও কখনো অপমান করেন নি, করতে পারেন নি। আর্টী চরিত্রের স্বাভাবিক নিঃসঙ্গতার সঙ্গে মিশে এই অসামান্য দৈবশক্তির ভার তাই লরেন্স্কে সারা জীবন ব্যথিত করেছে। কারণ লরেন্সের স্বভাব খুবই বন্ধুতাপ্রবণ, খুবই হৃদ্য। এবং লরেন্সের পরিচিতেরা তাঁর সঙ্গলাভে মুগ্ধই হয়েছেন। কিন্তু লরেন্সের হৃদয়বৃত্তি তবুও অতৃপ্ত। ক্যাথারিন্ কার্সোয়েলকে তিনি যা লেখেন, তা তাঁর নিজের সম্বন্ধেও খাটে—"I think you are the only woman I have met who is so intrinsically detached, so essentially separate and isolated as to be a real writer or artist or recorder. Your relations with other people are only excursions from yourself. And to want children and common human fulfilments is rather a falsity for you, I think. You were never made to meet and mingle, but to remain intact, essentially, whatever your experiences may be.''

কিন্তু হাক্স্লি যে ভাবে মারির ঈষদ নাটকীয় Son of Woman-কে উড়িয়ে দিয়েছেন, সে ভাবে বোধ হয় লরেন্সের বাল্যযৌবনের অভিজ্ঞতা, তাঁর বাড়ীর ছাপ ওড়ানো যায় না। লরেন্স্ যে হাক্স্লি হলেও হাক্স্লির মতো না লিখে লরেন্সের মতোই লিখতেন, একথা হঠাৎ মানা কঠিন। অবশ্য লরেন্সের বিষয়ে এসব মতামত গৌণ। লরেন্সের স্বকপোলকল্পিত বাইব্ল্-ব্যাখ্যাও আমরা না মান্তে পারি। খৃষ্টধর্ম্ম যে মানুষের স্বার্থপরতা ও কর্ত্তৃত্ব-কামনার বেলায় প্রায় চোখ বুজে মানব-সাধারণকে ছেড়ে কয়েকটা সম্ভ্রান্ত-স্বভাব ব্যক্তির আত্মসাধনায় ঝোঁক দিয়েছে; এবং এর ফলে যে পৃথিবীতে দুঃখ অসম্পূর্ণতা ঘৃণ্যতার বন্যা বয়ে চলেছে, তার প্রতি-বিধান যে রক্তাম্বর যথার্থশাসক রাজা (বা মুসোলিনি?) ও ক্ষাত্র আভিজাত্য, এসব তত্ত্ব শিরোধার্য্য না হয় নাই করলুম। বর্ত্তমান য়ুরোপ ছেড়ে অজ্ঞাত ইট্রুরিয়া, অতীত মিশর, অসভ্য মেক্সিকো বা ভারতবর্ষে মুক্তি সন্ধানেরই বা বাধ্যতা কি? লরেন্সের আসল দান হচ্ছে তাঁর কাব্য যার উচ্ছল প্রাণবন্যা শুধু হাক্স্লিদের, গার্ণেট-দের বা মোরেল এস্কিথ্কেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি, কেম্ব্রিজের পরীক্ষাগার থেকে গণিতপূজারী রাসেল্কেও বার করেছিল। তাছাড়া এই শ-গান্ধীর মানসিক যুগেও এই আশ্চর্য্য সত্য কথা কেবল মৃতপ্রায় লরেন্সের মুখ দিয়েই বেরিয়েছিলো— What man most passionately wants is his living wholeness and his living unison, not his own isolate salvation of his "soul.'' Man wants his physical fulfilment first and foremost, since now, once and once only, he is in the flesh and potent. For man, the vast marvel is to be alive. For man, as for flower and beast and bird, the supreme triumph is to be most vividly, most perfectly alive. Whatever the unborn and the dead may know, they cannot know the beauty, the marvel of being alive in the flesh. The dead may look after the afterwards. But the magnificent here and now of life in the flesh is ours, and ours alone, and ours only for a time. We ought to dance with rapture that we should be alive and in the flesh, and part of the living, incarnate cosmos. I am part of the sun as my eye is part of me. That I am part of the earth, my feet know perfectly, and my blood is part of the sea. My soul knows that I am part of the human race, my soul is an organic part of the great human soul, as my spirit is part of my nation. In my own very self, I am part of my family. There is nothing of me that is alone and absolute except my mind, and we shall find that the mind has no existence by itself, it is only the glitter of the sun on the surface of waters. (পৃঃ ২২২—৩, Apocalypse).

শ্রীবিষ্ণু দে

The Secret of the Golden Flower (a Chinese Book of Life, translated and explained BY RICHARD WILHELM with a European Commentary BY C. G. JUNG (Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd.).

চৈনিক ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনা করিলে দেখা যায়, ভারতবর্ষের ন্যায় প্রাচীন চীনেও যোগসাধনা প্রচলিত ছিল—There exists an esoteric movement, which has devoted itself with energy to the psychological method, that is meditation, Yoga practice (Wilhelm).—গুরু-পরম্পরাক্রমে চিনা সাধকেরা ধ্যান-ধারণাদি যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতেন ; এবং তাঁহাদের সাধনার সৌকর্য্যের জন্য যোগ-মার্গের পথপ্রদর্শকরূপ 'যোগদীপিকা'-সমূহ সঙ্কলিত হইত। 'আই-চিন্' (I Ching) —এই 'Secret of the Golden Flower' যাহার অনুবাদ—ঐরূপ একখানি দীপিকাগ্রন্থ। উহার পূরা নাম 'T'ai I Chin Hua Tsung Chih'। আই-চিন্ অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ— ইয়ুং (Dr. Jung) ইহাকে a pearl of great insight বলিয়াছেন। ইহা অত্যুক্তি নহে।

এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষভাগে 'তাও'-সাধক (Taoist adept) লু ইয়েন (Lü Yen) কর্ত্তৃক গ্রথিত হয়। লু ইয়েন বলেন ইহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত নহে—চৈনিক অষ্ট চিরজীবীর অন্যতম সিদ্ধপুরুষ কুয়ান্ ইন্‌সি (Kuan Yin-hsi) (যাঁহার আদেশে লাওট্‌জ—Lao Tze—প্রখ্যাত Tao Te Ching সংকলন করেন)—তিনি এই আই-চিন্ গ্রন্থের আদিম উৎস। সে যাহা হউক, গ্রন্থকর্ত্তা নিজ গ্রন্থে প্রাচীন Yu Ching, Su Wen, Yin-Fu-Ching, লঙ্কাবতার সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে [illegible] উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বুদ্ধদেব, কন্‌ফুচি ও লাওট্‌জের স্পষ্ট নামোল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এ গ্রন্থ রচিত হইবার পূর্ব্বেই চৈনিক চিত্তক্ষেত্র মহাযান-বুদ্ধধর্ম্ম, লাওট্‌জের তাও-ধর্ম্ম ও কন্‌ফুচির আশ্রমধর্ম্মের ত্রিবিধ ধারায় অভিষিক্ত হইয়াছিল। সুতরাং এ গ্রন্থ ঐ ত্রিবেণীসঙ্গমের সাক্ষাৎ ফল।

অনেক দিন পর্য্যন্ত এ অমূল্য গ্রন্থ পাশ্চাত্য পাঠকের অগম্য ছিল। [illegible] Legge ইহার অনুবাদ প্রকাশ করেন। কিন্তু সে অনুবাদ নহে—'হনুবাদ'। [illegible] অনুবাদে মূলের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইত না। ঐ বিকৃত অনুবাদ [illegible] করিয়া পাশ্চাত্যেরা এ গ্রন্থকে কতকগুলা ভোজবাজি ও আবর্জ্জনার নিবিড় [illegible] মনে করিতেন। অত্রাবস্থায় রিচার্ড উইল্‌হেল্‌ম ১৯২৯ সালের শেষার্দ্ধে সংক্ষিপ্ত টীকাসহ ঐ আই-চিনের জার্ম্মান অনুবাদ প্রকাশ করিয়া কেবল বিশেষজ্ঞের নহে, সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হন। ঐ টীকাসহ বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী (Psycho-analyst) ডক্টর ইয়ুংয়ের European Commentary (পাশ্চাত্য বার্ত্তিক) সংযুক্ত ছিল। ১৯৩০, ১লা মার্চ্চ উইল্‌হেল্‌ম মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার ঠিক এক বৎসর পরে জার্ম্মান ভাষাভিজ্ঞ কেরি বেনস্ (Cary Baynes) জার্ম্মান হইতে ঐ মূলগ্রন্থ, টীকা ও বার্ত্তিকের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করেন। তৎসহ উইল্‌হেল্‌মের শোকসভায় তাঁহার বন্ধু উক্ত ডক্টর ইয়ুং যে অভিভাষণ পাঠ করেন (In Memory of Richard Wilhelm), তাহারও অনুবাদ সংযুক্ত হয়। এ ইংরাজী গ্রন্থ সুধী-সমাজে বেশ সমাদৃত হইয়াছে। অতএব বাঙ্গালী পাঠকের তৎসহ পরিচিত হওয়া উচিত।

প্রথমতঃ রিচার্ড উইল্‌হেল্‌মের কথা বলি। তিনি মিশনরি-রূপে চিনদেশে বসতি করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু অচির মধ্যে চৈনিক প্রজ্ঞা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। তাহার ফলে তিনি চিনের ধর্ম্মগ্রন্থ গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং কেবল চিনা-বিদ্যায় বিশারদ (Sinologue) হন, তা নয়—কিন্তু চৈনিক কৃষ্টির মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করেন। (Penetrated deeply into the secret and mysterious life of Chinese Wisdom—Dr. Jung).

তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইয়ুং তাঁহার সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন—In that vast territory of knowledge and experience, Wilhelm worked as master of his profession. . . . . . No sooner had he encountered the secret of the Chinese soul than he perceived the treasure hidden there for us.

অধিকন্তু উইল্‌হেল্‌ম was an initiate in the psychology of Chinese Yoga, to whom the practical application of the I. Ching was an ever renewed experience (Dr. Jung). ইহাকেই বলে—যোগাং যোগোন যুজাতে—এরূপ যোগ্য ব্যক্তি ভিন্ন আই-চিনের মত গ্রন্থের অনুবাদক হইবার যোগ্যতা কাহার ?

কিপলিং বলিতেন—

For East is East and West is West
And ne'er the twain shall meet.
—প্রাচ্য-সে প্রাচ্যই রবে প্রতীচ্য পশ্চিম
কভু না মিলিবে দুহুঁ কালেও অন্তিম।

উইল্‌হেল্‌ম ইহার প্রতিবাদ করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন— East and West are no longer to remain apart। বস্তুতঃ আদর্শের উচ্চ ভূমিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনই বিধাতার অভিপ্রেত—সেই জন্যই তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সংঘর্ষ ও সংঘাত ঘটাইয়াছেন। ডক্টর ইয়ুং এ প্রসঙ্গে কয়েকটি সার কথা বলিয়াছেন—যাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

The European invasion of the East was a deed of violence on a great scale and it has left us the duty—nobblesse oblige—of understanding the mind of the East। তিনি বলেন ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে আর একবার এইরূপ ঘটিয়াছিল—রোম প্রাচী বিজয় করিয়াছিল বটে—ফলে? What happened when Rome overthrew the near East politically. The spirit of the East entered Rome and out of the most unlikely corners of Asia Minor, came a new spiritual Rome । এবারও ইতিহাসের সেই আবর্ত্তনই হইবে—আবার প্রাচ্য প্রতীচ্যকে আপনা অধ্যাত্মশক্তিতে অভিভূত-পরাজিত করিবে। যাঁহারা চক্ষুষ্মান্, তাঁহারা ইতিমধ্যেই তাহার লক্ষণ লক্ষ্য করিয়াছেন—

The spirit of the East penetrates through all our pores and reaches the most vulnerable places of Europe.—Dr. Jung.

If we but briefly investigate the fields covered to-day by, wh is called, 'occult thought,' (we find) millions of people are includ in these movements and Eastern ideas dominate all of them.— Cary Baynes.

যাঁহারা এ ক্ষেত্রে অগ্রণী হইয়া প্রাচ্যের প্রজ্ঞাধারা প্রতীচ্যে অবতারণ করাইয়া রিচার্ড উইল্‌হেল্‌ম্ তাঁহাদের একজন মুখ্যতম। তাঁহার যোগ্যতার প্রধান নি এই যে, প্রতীচ্যসুলভ সঙ্কীর্ণতা ও হঠকারিতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। He was able to let the European in himself to slip into the back ground. . . . Towards the foreign culture of the East, Wilhelm displayed an extraordinarily large amount of *modesty*—something unusual in an European। বাস্তবিক শিষ্যভাবে উপসন্ন না হইলে—শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ না বলিলে, প্রাচ্য ভারতী প্রতীচ্যের 'ধী'র অভ্যন্তরে মুখরিত হন না। অথচ সাধারণ প্রতীচ্য মানবের attitude কি? All mediocre minds in contact with a foreign culture, either lose themselves in blind self-deracination or in an equally uncomprehending, as well as presumptuous passion for criticism (Dr. Jung)। রিচার্ড উইল্‌হেল্‌ম্ এরূপ mediocre mind ছিলেন না—সেই জন্যই তিনি চৈনিক প্রজ্ঞায় নিষ্ণাত হইতে পারিয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয় এত 'পণ্ডা'-বাদ বলা সত্ত্বেও বার্ত্তিককার ডক্টর ইয়ুং পাশ্চাত্য অহমিকার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার বার্ত্তিকের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া তিনি বলিয়াছেন—The aim of my commentary is the effort to build a bridge of psychological understanding between East and West. —'আমার বার্ত্তিক রচনার উদ্দেশ্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে বুঝা-পড়ার একটা সেতুবন্ধন করা'। তাহাই যদি হয় তবে তিনি সমস্বরে বলিলেন কেন?—We should do well to confess at once that fundamentally speaking, we do not understand the utter unworldliness of a text like this (I. Ching)—indeed we *do not* want to understand it.

ইহাকেই বলে—'গোড়ায় গলদ'—ভাষ্য রচনা করিব অথচ মূল বুঝিতে চাহিব না! বাস্তবিক ইয়ুংয়ের European Commentary ভাষ্যও নয়, বার্ত্তিকও নয়—উহা তাঁহার অভিমত 'Unconscious'-এর উপর একটা প্রকাণ্ড প্রবন্ধ। ঐ প্রবন্ধে আত্মমত সমর্থন জন্য ইয়ুং কোথাও কোথাও চিনা গ্রন্থ হইতে মাত্র বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে কদর্থ বা কষ্ট কল্পনার সাহায্যে ঐ Unconscious-এর থিওরির সহিত তাহার সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন। Unconscious বা অব্যক্ত সংবিৎ—জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির সহিত সুপরিচিত ভারতীয় দার্শনিকের নিকট একেবারেই অভিনব নয়; ইহাকেই ম্যায়ার, লজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা subliminal Consciousness বলিয়াছেন। ঐ 'Unconscious' ডক্টর ইয়ুংয়ের ব্যসন (hobby)—যেমন Repression of sexuality (কাম-প্রচ্ছদ) তাঁহার গুরু ফ্রয়ডের (Freud) ব্যসন। শিশুকন্যা যখন মাতার স্তন্যপান করে, সেটা তার প্রচ্ছন্ন কামক্রিয়ার অব্যক্ত অভিব্যক্তি! ফ্রয়ড ও ইয়ুং ঐ অব্যক্ত সংবিদ্ (Uncons-

cious বা Psyche) সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন—সেজন্য আমরা তাহাদের কাছে কৃতজ্ঞ বটে। ইয়ুং বলিয়াছেন—There can evolve spontaneously out of the Unconscious, contents which the conscious cannot assimilate। ঠিক কথা—কিন্তু পাগলের পাগলামি ও যোগীর যোগবিভূতি কি এক উৎস হইতে উদ্ভূত? ঐ subliminal consciousness ছাড়া জীবের যে একটা supraliminal consciousness আছে—যে সংবিৎ কলাবিদের কলাসিদ্ধিতে এবং ধ্যানীর সমাধিতে অভিব্যক্ত হয়—একথা বোধ হয় ইয়ুং এখনও আবিষ্কার করেন নাই। ইংরেজ অনুবাদক কেরি বেনস্ যথার্থই বলিয়াছেন—Much has been taught him in recent years about the hitherto unsuspected elements in his psyche, but the emphasis is all too often on the static side alone, so that he finds himself possessed of little more than an inventory of contents। আমরা জানি, প্রত্যেক জীবের অভ্যন্তরে অব্যক্ত শক্তিপুঞ্জ নিহিত আছে—ঐ শক্তিসমূহের অভিব্যক্তিই প্রকৃত যোগ (Development of the powers latent in man)। বেনস্ একথা লক্ষ্য করিয়াছেন—He contains within his psyche a store of unexplored forces, which, if rightly understood, would give him a new vision of himself and help safeguard the future for him। এজন্য যোগপ্রণালীর গভীর অনুশীলন এবং আই-চিনের মত যোগদীপিকার প্রগাঢ় অনুধাবন আবশ্যক। ইয়ুংয়ের বার্ত্তিকে কিন্তু ঐরূপ অনুশীলন ও অনুধাবনের পরিচয় পাওয়া যায় না।

ইয়ুং বলেন—The Western man is innocent of his own apparatus। ভারতীয় ও চৈনিক যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে এ অজ্ঞান-তিমির তিরোহিত হইতে পারে। ইয়ুং আরও বলেন—We veil from ourselves our real human nature with all its dangerous, subterranean elements and its darkness।—সেই subliminal consciousness-এর কথা। কিন্তু এই প্রচ্ছন্ন 'আসুরী সম্পৎ' ছাড়া জীবের কি দেবী সম্পৎ নাই—lifegiving empyrean elements নাই—যাহাকে আমরা supraliminal consciousness বলিলাম? যাহার জ্যোতিঃ ঐ অন্ধতমস ভেদ করিয়া ধ্যানধারণা-সমাধিতে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে—এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে (ছান্দোগ্য উপনিষৎ)।

ইয়ুং সারা জীবন 'Practice of Psychiatry and Psychotherapy' করিয়াছেন (ইহা তাঁহার নিজ মুখের কথা)।—যাঁহার কেবল Pathology-র সহিত পরিচয়, যিনি Anatomy চর্চ্চা করিবার সুযোগ পান নাই—তিনি যে দেহবিজ্ঞান আংশিক ভাবেই জানিবেন ইহা বিচিত্র নহে। অতএব ইয়ুংয়ের ঐকদেশিক দৃষ্টির কাছে যদি যোগের প্রকৃত তত্ত্ব প্রতিভাত না হইয়া থাকে তাহাতে আমরা বিস্মিত হইব কেন?

ইয়ুং লিখিয়াছেন—The art of letting things happen, action in non-action, letting go of one-self became a key to me, with which I was able to open the door to the 'way.' The key is this: We must be able to let things happen in the psyche. . . . Consciousness is for

ever interfering, helping, correcting and negating, and never leaving the simple growth of the psychic processes in peace। অতএব কি প্রণালী অবলম্বন করা উচিত? Allow the psychic processes to go forward without interference—to put aside the activity of the conciousness। এই যে wise passivity—উদাসীন নির্যোগ—ইয়ুংয়ের মতে ইহাই প্রকৃত যোগ এবং ইহাই আই-চিন্ গ্রন্থকারের অনুমোদিত! এই প্রণালীর প্রয়োগ করিয়া তিনি নাকি অনেক মনোরোগীকে নীরোগ করিয়াছেন—This detachment is an effect which I know very well from my professional practice; it is the therapeutic effect par excellence, for which I labour with my students and patients। কিন্তু মনোরোগী—বিশেষতঃ মনোরোগিণীর পক্ষে যাহা সুব্যবস্থা, ধ্যানী-যোগীর পক্ষেও কি তাহাই?—চৈনিক ও ভারতীয় যোগশাস্ত্রে দেখা যায় যে, চিত্তকে পরিকর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধ করিতে হইবে * এবং পৌরুষ ও প্রযত্ন দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে—পৌরুষেণ প্রযত্নেন লম্ভনীয়া শুভে পথি। বস্তুতঃ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ জন্য যে শুভ ও সার্থক উদ্যোগ, তাহাই 'যোগ'। এজন্য যমনিয়ম চাই, অভ্যাস বৈরাগ্য চাই। আই-চিন্ গ্রন্থে Laziness and Distraction ক্ষালন জন্য এ সম্পর্কে বহুবিধ উপদেশ আছে।† আরও চাই আসন (Sit like a withered tree before a cliff—sit quietly with upright body and fix the heart in the centre.—I Chin); চাই প্রাণায়াম (In order to steady the heart one begins by cultivating the breathing power. . . . . But the deeper secrets cannot be effected without making the breathing rhythmical.—I Chin);—চাই প্রত্যাহার—আবৃত্তচক্ষুঃ হওয়া—(If one closes the eye and reversing the glance directs it inward. . . Only when one looks and harkens inward, does the organ nor go outward nor sink inward.—I Chin); চাই ধারণা—one-pointedness—(When you fix your heart on one point, then nothing is impossible for you.—I Chin); চাই ধ্যান (Meditation)—প্রত্যয়ের একতান প্রবাহ (If for a day you do not practise meditation, this light streams out who knows whither?—I Chin) এবং সর্ব্বশেষ চাই সমাধি—(The Light is contemplation. Fixation without contemplation is circulation without Light. Fixating contemplation is indispensable, it ensures the strengthening of illumination).

এ সকল তুচ্ছ ব্যাপারে ইয়ুং বড় চিত্তক্ষেপ করেন নাই—তাঁর preoccupation—মনোনিবেশ—ঐ Unconscious লইয়া। ঐ অধমতারণ Unconscious-এর সাহায্যে তিনি সমস্ত জগৎসমস্যার সমাধান করিতে চান। তাঁহার মতে যোগ একটা

*It is the washing of the heart and the purification of the thoughts; it is the bath.—I Chin.

†The veil of *Maya* cannot be lifted by a mere decision of reason, but demands the most thorough-going and wearisome preparation, consisting in the right payment of all debts to life.

abnormal psychic condition. Our way begins in European reality and not in Yoga practices, which would only serve to lead us astray as to our own reality.*

আই-চিনের গ্রন্থকার পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, যোগবিদ্যা রহস্য রাখিতে হইবে—'গোপ্যা কুলবধূরিব'—'Disciples! Keep it secret and hold to it strictly!' 'Make the Light circulate: that is the deepest and most wonderful secret.' সেইজন্য তিনি অনেকস্থলে 'সন্ধ্যা'-ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন—যাহা বহির্দৃষ্টিতে হেঁয়ালি বা প্রহেলিকা বলিয়া মনে হয়। 'Red blood becomes milk. The fragile body of the flesh is sheer gold and diamonds.' 'In the purple hall of the city of jade, dwells the god of utmost emptiness and life.' 'Create an immortal body by melting and mixing.' 'The Heavenly Heart lies between sun and moon.' 'Look at the end of your nose'—(সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং—গীতা)—'Fix on the point which lies exactly between the two eyes' (ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্—গীতা)। ইয়ুং এ সকলের মর্ম্মস্থানে প্রবেশ করিবেন কি করিয়া?

প্রাচ্য প্রজ্ঞার মর্ম্মজ্ঞ হওয়ার পক্ষে ডক্টর ইয়ুংয়ের প্রবল বাধা তাঁহার superiority-complex (তাঁহার গরিমা-গ্রন্থি)। উইল্‌হেল্‌মে আমরা যে বিনীত শিষ্যভাব প্রত্যক্ষ করি, ইয়ুংয়ে তাহার অত্যন্ত অভাব। তাঁহার ঔদ্ধত্য প্রাচ্য পাঠককে পীড়া দেয়। দুই একটা নমুনা দেখুন—'Measured by the Western intellect, Eastern intellect can be described as childish.' (অথচ অধ্যাপক Cowell-এর মত অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই intellect-এর পুষ্পফল দেখিয়া বলিয়াছেন—It makes the 'European head dizzy!')—'The East came to its knowledge of inner things with a childish ignorance of the world.' 'There could be no greater mistake than for a Westerner to take up the direct practice of Chinese Yoga'। (অথচ তাঁহার বন্ধু উইল্‌হেল্‌ম ঐ যোগসাধনেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন)। কোন কোন প্রাচ্যের অন্তরে যেমন লঘিমাগ্রন্থি (Inferiority-complex) খুব প্রকট—তাঁহারা প্রাচ্য দেশের কোন কিছু ভাল ভাবিতে পারেন না,—তেমনি ইয়ুংয়ের মত পাশ্চাত্যের অভ্যন্তরে ঐ গরিমা-গ্রন্থি। উহা এত জটিলভাবে জড়িত, যে তাঁহারা চেষ্টা সত্ত্বেও উহার প্রভাব এড়াইতে পারেন না। তাই ইয়ুং স্পর্দ্ধার সহিত বলিতেছেন—We will investigate the psyche and its depths by a tremendously extensive historical and scientific knowledge. . . . . We are already building up a psychology to which the East found entrance only through abnormal psychic conditions.

* এ কথার অর্থ কি? Western way জুদা হইল কিরূপে? ইয়ুং ত নিজেই বলিয়াছেন—The psyche possesses a common substratum × × As a common human heritage, it transcends all differences of culture and consciousness and does not consist merely of contents capable of becoming consciousness, but of latent dispositions toward identical reactions (p. 83).

সেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও বুদ্ধির বড়াই! অথচ বার্গসঁ, অয়কেন প্রভৃতি পাশ্চাত্যেরাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বুদ্ধি (Intellect) চরম সত্য নির্দ্ধারণে অপারগ। ইহার সম্বল—তর্ক, যুক্তি, ব্যাপ্তিজ্ঞান—তত্ত্বের তুঙ্গভূমিতে আরোহণ করিতে পারে না—নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া। সে জন্য বুদ্ধির পর বোধি চাই—Intellect-এর উপর Intuition চাই। ঐ বোধি যোগসাধনাসাপেক্ষ—উহা বিজ্ঞান-বামনের অধিগম্য নহে।

ইয়ুং নিজেই এ কথা স্বীকার করিয়াছেন—Intellect does in fact violate the soul, when it tries to possess itself of the heritage of the spirit. It is in no way fitted to do this (p. 81).

বিজ্ঞানের প্রয়োগ নাই, তা নহে। কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, যেমন বুদ্ধির উপর বোধি—তেমনি বিজ্ঞানের উপর প্রজ্ঞান—প্রজ্ঞানেনৈনম্ আপ্নুয়াৎ। Scientific method must serve: it errs when it usurps a throne. . . It is not the only way of comprehending—(Dr. Jung).

অর্থাৎ বিজ্ঞানের স্বধর্ম্ম প্রজ্ঞানের অনুচর হওয়া—যে দাস, সে যেন প্রভুর আসন অধিকার না করে। এ প্রসঙ্গে কেরি বেনস্ বেশ কথা বলিয়াছেন—We have to see that the spirit must lean on science as its guide in the world of reality and that science must turn to the spirit for the meaning of life.

যোগশাস্ত্রের প্রচারকেরা ঠিক ইহাই করিয়াছেন—যোগ অবৈজ্ঞানিক কাল্পনিক কোন কিছু নহে—It is rigidly scientific—ইহার ভিত্তি মনোবিজ্ঞানের সুদৃঢ় তথ্যের উপর প্রোথিত—তবে উহা psychic মাত্র নহে—যোগ metapsychic—অতি-বিজ্ঞান, অর্থাৎ প্রজ্ঞান। ইয়ুংয়ের কথায় বলি—It does not consist of sentimental, exaggeratedly mystical, institutions, bordering on the pathological and emanating from ascetic recluses and cranks; the wisdom of the East is based on practical knowledge coming from the flower of Chinese intelligence, which we have not the slightest justification for undervaluing (p. 78).

এই যোগের লক্ষ্য কি? আই-চিন্ বলেন, ইহার লক্ষ্য 'তাও'-সিদ্ধি। তাও (Tao) কি? It is the undivided One—It is that which has nothing above it (যস্মাৎ পরং নাপরং অস্তি কিঞ্চিৎ) —It is the fixed pole in the whirl of phenomena (অজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ), It is that which exists through itself—the final world principle, the primordial spirit (পরিভূঃ স্বয়ংভূঃ)—the creative Light, the Light of Heaven, the Light of the Essence (জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ)—এক কথায় বেদান্তের ব্রহ্ম। It is that land that is no-where, which is our true home—তদ্ধাম পরমং মম—তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। ব্রহ্মের মত তাও-ও দেশকালের অতীত—' Overcomes time and space.' ' It is incorporeal space where a thousand and ten thousand places are one place. . . . . It is immeasurable time when all the æons are

like a moment—কেনাপ্যণুকমাত্রেণ পূরিতা শতযোজনী—নিমেষঃ কশ্চ কল্পঃ স্যাৎ। The 'Tao,' though motionless (অনেজদ্ একং), is the means of all movement and gives it law—যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ। স্থৎ ও ত্যৎ, রয়ি ও প্রাণ, জীব ও জড়, প্রকৃতি ও পুরুষ যেমন ব্রহ্মের বিধা বা প্রকার (modes of manifestation)—Yang-Yin, Hsing-Ming, Kun-Chien, Hun-Po অর্থাৎ Logos-Eros, Animus-Anima, Essence-Life, পুং-স্ত্রী—ঐ তাওর bipolar phenomena এবং তাও spirit ও matter-এর দ্বন্দ্বমুক্ত একাকার অদ্বৈত তত্ত্ব—যিনি ন সৎ নচাসৎ শিব এব কেবলঃ। যিনি যোগসিদ্ধ—'he penetrates the magic circle of polar duality and returns to the undivided Tao.' অতএব তাও-সিদ্ধি ও ব্রহ্মসাযুজ্য একই কথা—ইহাই প্রকৃত 'শূন্যতা'-সাধন। 'The Confucians call it the centre of emptiness, ... and in our Taoism the expression is 'to produce emptiness'। ইহাই বুদ্ধদেবের—সুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোক্‌খো যস্স গোচরো—(ধম্মপদ)

আই-চিন্ গ্রন্থের পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, গ্রন্থকার অনেক স্থলে 'The backward-flowing movement of the life forces -এর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—" The meaning of the Golden Flower depends wholly on the backward-flowing method. If it is not allowed to flow outward but is led back by the force of thought, so that it penetrates the crucible of the creative and refreshes heart and body and nourishes them, that also is the backward-flowing method. Therefore it is said: The meaning of the Elixir of Life depends entirely on the backward-flowing method. . . . This is the sublimation of the seed into power. If we reflect on this, we see that the ancients really attained long life by the help of the seed-power present in their own bodies, and did not lengthen their years by swallowing this or that sort of elixir. But worldly people lose the root and cling to the tree top. . . . The fool wastes the most precious jewel of his body in uncontrolled pleasure, and does not know how to conserve the power of his seed. . . . The seed that is conserved is transformed into power, and the power, when there is enough of it, makes the creatively strong body."

ইহাকেই এদেশে উর্দ্ধরেতা হওয়া বলে। আমরা মানব অর্ব্বাক্‌স্রোতঃ কিন্তু পাদপেরা উর্দ্ধস্রোতঃ। মানবকে যোগের দ্বারা উর্দ্ধস্রোতঃ হইতে হইবে। তখন তাহার রেতঃ ওজে পরিণত হইবে। ইহাকেই পতঞ্জলি কায়সম্পৎ বলিয়াছেন। কায়সম্পৎ কি?

রূপলাবণ্যবলবজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ—৩।৪৬

রেতঃ ওজে পরিণত হইলে কেবল যে, দেহ বজ্রের মত দৃঢ় হইবে তাহা নহে, শরীর হইতে একটা ছটা বিচ্ছুরিত হইবে। উইল্‌হেল্‌ম্ তাঁহার টীকায় এই লাইটের কথা বলিয়াছেন কিন্তু এই সম্পর্কে চিনা গ্রন্থের সহিত ভারতীয় গ্রন্থের যে নিকট সম্বন্ধ আছে, তাহা লক্ষ্য

করেন নাই। চৈনিক বিদ্যাতে তিনি বিশারদ ছিলেন কিন্তু যতদূর বুঝা যায় হিন্দু সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না।

আর একটি বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া এই আই-চিনের পরিচয় শেষ করি। সেটি spirit-fire-এর উজ্জলন এবং ঐ রসায়ন দ্বারা শরীরের নবীকরণ (Rejuvena- tion)। এই চৈনিক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে অনেকবার উল্লেখ আছে। " This influence intended to strengthen, rejuvenate and normalise the life process . . . If this method of ennobling is not applied, how will the w of being born and dying be escaped? . . . Only after the complete work of a hundred days will the Light be real, then will it becom spirit-fire. The circulation of the light is the epoch of fire. . The heart is the fire; the fire is the Elixir."

ইহাকেই আমরা এদেশে কুণ্ডলিনীর জাগরণ বলি। মূলাধার হইতে উত্থি হইয়া এই ত্রিবলীরূপিনী Serpent-fire মেরুদণ্ডের সুষি (Canal) পার হইয়া ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে সদাশিবের সহিত সঙ্গতা হন। ইহাই কঠোপনিষদের নাচিকেত-অগ্নি। যিনি ত্রিনাচিকেতঃ হন তিনি, 'তরতি জন্মমৃত্যু'—তাঁহার যোগাগ্নি শরীর হয় এবং তিনি জরা, রোগ ও মৃত্যুর অতীত হন।

ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্‌॥

আধিভৌতিক দিক্‌ হইতে যোগসিদ্ধ পুরুষের এই অবস্থা হয়। আ আধ্যাত্মিক দিক্‌ হইতে? আই-চিনের ভাষায় বলি, " Then the Golden Flower begins to bud. Eternal is the Golden Flower which grows out of inner liberation from all bondage to things.—That Golden Flower blooms in the purple hall of the city of jade. The Heavenly Heart rises to the summit of the creative, where it expands in complete free- dom. Then one has the ability always to react to things by reflexes only. Then body and heart are completely controlled and one is quite free and at peace, letting go all entanglements, untroubled by the slightest excitement, with the Heavenly Heart exactly in the middle.

ইহাকেই আই-চিন্‌ "action in inaction" বলিয়াছেন—গীতার শারীর কেবলং কর্ম্ম। ইয়ুং ইহাকে " reunion with the laws of life represented in the unconscious" বলিয়াছেন। সে অবস্থায় "Instead of being in it, one is above it।" * ইহাই প্রকৃত নির্দ্বন্দ্ব হওয়া—The union of the opposites on a higher level of consciousness। এইরূপ দ্বন্দ্বাতীত

*What, on a lower level, had led to the wildest conflicts and to emotions full of panic, viewed from the higher level of the personality now seemed like a storm in the valley seen from a higher mountain top. —Dr. Jung, p. 88.

পুরুষ "outgrows, that is, raises the level of consciousness to a higher plane।" ইহাকেই সাংখ্যেরা বলেন—প্রেক্ষকবৎ অবস্থিতঃ স্বস্থঃ। তখন তিনি সাক্ষী দ্রষ্টা মাত্র হন, কর্ত্তা বা ভোক্তা থাকেন না। ইহাই জীবন্মুক্তের দশা। যিনি জীবন্মুক্ত—তাঁহার আই-চিন্‌ বা কনক কমল পূর্ণ বিকশিত।

এই Golden Flower বা কনক কমল কি? It is the immortal spirit body—the Heavenly Heart, terrace of life, the light of Heaven—উপনিষদের হৃৎপদ্ম বা দহরাকাশ। তদস্মিন্‌ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম। এই যে ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক-গৃহ ইহাই ব্রহ্মের পরম আলয়—যদন্তরা তদুপাসিতব্যম্‌ (ছান্দোগ্য)। কারণ, হৃদি অয়ম্‌—সেই জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ ঐ কনক কমলে নিত্য বিরাজিত আছেন।

হৃৎপদ্মকোশে বিলসৎ তড়িৎপ্রভম্‌।

'The Golden flower is the Light and the Light of Heaven is *Tao*'.

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

আমরা :—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কয়েকটা নতুন কবিতা
একটা কথা :—বুদ্ধদেব বসুর কয়েকটা নতুন কবিতা

দুটাই গ্রন্থকারমণ্ডলীর তরফ থেকে বুদ্ধদেব বসুর দ্বারা প্রকাশিত ও এম্‌, সি, সরকারের দোকানে প্রাপ্তব্য। প্রত্যেকটার দাম চার আনা।

প্রকাশকদের অনুগ্রহ থেকে কবিতাকে (যা বাংলা দেশে চলে না) বাঁচাবার জন্যে এই দুই বিখ্যাত কবি ও তাঁদের আরো কোনো কোনো সাহিত্যিক বন্ধু মিলে গ্রন্থকারমণ্ডলী করেছেন। উদ্দেশ্য—প্রকাশকের ব্যবসাদারী চাল ছেড়ে শুধু সাহিত্যিক কারণে ও অতি সস্তায় বই বার করা। বুদ্ধদেব বাবুর "বন্দীর বন্দনা" ও অচিন্ত্যবাবুর "অমাবস্যা" পাঠে তাঁদের কবিতা সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, সে ধারণা অসম্পূর্ণ। মাসিক পত্রিকায়ও তাঁদের অজস্র কবিতা আছে। "একটা কথা", "বন্দীর বন্দনা"-র কবিতা থেকে স্বতন্ত্র এবং "আমরা" ও অমাবস্যা"য় কোনো মিল নেই। ভবিষ্যতে এই গ্রন্থধারায় আরো বই বেরোবে। আশা করি আপাততঃ কাব্যামোদীরা গ্রন্থকার- মণ্ডলীর এই সুলভ বই দুটা কিনে, পড়বেন। বই দুটার পুনর্মুদ্রণ হবে না। এবং কবি দুজন তো পরিচিত।

শ্রীবিষ্ণু দে

Hitler—By Emil Lengyel (George Routledge & Sons).

হেলীর ধূমকেতু যখন আকাশে প্রথম দেখা গিয়েছিল, তখন তার পুচ্ছের বহর দেখে পৃথিবীর অনেকেই ভেবেছিলেন যে আরও কাছে এলে সেই ঝাপটে পৃথিবী একদিন চূরমার হয়ে যাবে। সন্ধিক্ষণ পার হয়ে যাবার পর দেখা যে সে পুচ্ছ বাষ্পগুচ্ছ বই আর কিছুই নয় এবং সেটি পৃথিবীর ধাক্কায় দ্বিধা-বিভক্ত অতিসৌরলোকে অনির্দ্দেশ যাত্রা সুরু করেছে।

জার্ম্মানীর রাজনৈতিক আকাশের এই বর্ত্তমান জ্যোতিষ্কটিকে Dr. Leng ভাষায় না হোক অন্ততঃ ভাবে ধূমকেতুর পর্য্যায়ভুক্ত করেছেন। তাঁর মতে Hitler প্রবর্ত্তিত নাজীমতবাদের মূলে গঠনমূলক বা প্রগতিশীল পরিবর্ত্তনের লেশমাত্র নাজীমতবাদ অন্তঃসারশূন্য—তার মূলে আছে, জাতিগত দ্বেষ এবং দাম্ভিকতা। ঋণপী হৃতসর্ব্বস্ব ও বন্দী জার্ম্মানীর রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির বাস্ত কঠিনস্পর্শে নাজীমতবাদের ধূমপুচ্ছ বেশী দিন অবিভক্ত থাক্‌বে না এবং সম্ভবতঃ এই ধরণের ছেলেভুলানো মতবাদের যা পরিণতি হয়ে থাকে তা লাভ করবে।

টিউটন্ আজ আত্মহারা। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে যে চৈতন্য ও চিন্তাধারা জীবনকে প্রণোদিত করেছিল আজ আর তা কার্য্যকরী নয়। সেগুলির মূলে তখনকার জার্ম্মানীর বিরাট শক্তি এবং উদ্দীপ্ত ও জীবন্ত সাম্রাজ্যবাদ। সে শক্তি মূলোচ্ছেদ করেছে টিউটনের জাতিশত্রু এবং জ্ঞাতিশত্রুর দল; আর সে উদ্দী সাম্রাজ্যবাদের মূলে বিষপ্রয়োগ করেছে জার্ম্মানীর বিভিন্ন সাম্যপন্থী জনমণ্ড তাই আজ জার্ম্মানী Bismarck-কে ফিরিয়ে চাইলেও পাচ্ছে মাত্র Hitler-কে আজ সে অতিমানুষের প্রার্থনা করে, উত্তরে পাচ্ছে বনমানুষ। তার কারণ, গোব পদ্মফুল ফোটে না।

দুর্ব্বহ কর এবং দুস্তর ঋণের ভারে জার্ম্মানী আজ মুমূর্ষু। Hitler আশ্বা দিয়েছেন, "বিদেশজাত পণ্যের উপর শুল্ক চাপিয়ে আভ্যন্তরিক কর কমাব; ঋণ বা সু শোধ করব না; চাইলে লড়ব।" তাই আজ জার্ম্মানী আশার নেত্রে তাঁর দি তাকিয়ে আছে।

গত মহাযুদ্ধের সমস্ত গ্লানি এবং পরকালীন অপমান জার্ম্মানীর উপরে চাপা হয়েছে; টিউটন্-গর্ব্ব আজ আহত; নিজ দৌর্ব্বল্যে ক্ষুব্ধ। হিট্‌লারের বাণী—"চাইলে লড়্‌ব"—তার মৃতপ্রায় আত্মাভিমানকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই নাজীদলের সংখ্যাপুষ্টি।

সুদ ও ঋণ ধনবাদী মনোভাবের পরিচায়ক। য়িহুদিরা গত যুদ্ধে উভয়পক্ষে প্রচুর অর্থলাভ করেছে; তারাই টাকা দিয়ে লড়াই চালিয়েছিল। তারা সুদ এ রক্তপাত উভয়ের জন্যই দায়ী। Hitler বলেন, "অতএব য়িহুদিপীড়ন করো।" জার্ম্মানী সমর্থনসূচক ঘাড় নেড়ে বলে, "হাঁ, তাই করবো; কারণ সুদ ও ঋণ শো দেবার শক্তি আমাদের নেই।" এ-সমস্ত কথাই ধনবাদের প্রতিকূল, অথচ Hitl প্রকাশ্যে ধনিকতন্ত্রের শত্রু নন। শোভিয়েটবাদ তাঁর দুই চক্ষের বিষ। তাঁর ম ধনবাদ ভাল যতক্ষণ সে ধনভার নর্ডিক জাতির উপর ন্যস্ত আছে; য়িহুদীর জার্ম্মানীকে সর্ব্বনাশের পথে চালিয়েছে।

Hitler-এর অনুগত নাজীদলের সংখ্যাধিক্যের কারণ দেখিয়েছেন Lengyel উপরের যুক্তিগুলি দিয়ে। কিন্তু Lengyel বলেন, জার্ম্মানীর বর্ত্তমান অবস্থায় বহিঃসাহায্য ভিন্ন লড়বার সামর্থ্য নেই, এবং বিদেশজাত পণ্যের উপর শুল্ক চাপালে সে সাহায্যপ্রাপ্তির আশা দুরাশায় পরিণত হবে।

ফলকথা Lengyel বলতে চান যে Hitler একটি প্রকাণ্ড রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজ; সে ধাপ্পাবাজি আজও রাষ্ট্রশাসনরথ টানার কাজে প্রযুক্ত হয়নি ব'লে তার স্বরূপ ধরা পড়েনি; অতএব সাধু সাবধান! Hitler-কে লোকচক্ষে ভুল বোঝাবার জন্যই হয়ত Lengyel-এর লেখা জীবনী সৃষ্টি হয়েছে। Hitler সমাজপন্থী এবং য়িহুদিদের উপর খড়্গহস্ত, যদিও হাতে তাঁর খাঁড়া নেই এবং Lengyel-এর মতে কখনো আসবেও না। খৃষ্টানদের প্রতিও Hitler যে সুপ্রসন্ন নন্ তার প্রমাণ তিনি Ludendorf-এর সহযোগী এবং Ludendorf চান প্রাচীন টিউটনদের পৌত্তলিকতার প্রত্যাবর্ত্তন। Hitler-এর সাম্যপরিপন্থিতা, য়িহুদি ও খৃষ্টান বিদ্বেষ, সোভিয়েটভীতি প্রভৃতির একটাকেও সুনজরে দেখেন না বলেই Lengyel হয়তো এই জীবনী নিরপেক্ষভাবে লিখতে পারেন নি। জীবন্ত সমসাময়িকের নিরপেক্ষ জীবনী শুধুচোখে লেখা দুরূহ; অথচ এভাবের রাজনৈতিক অনুবীক্ষণযন্ত্র চোখে লাগিয়ে তার সহজ রূপ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নয়।

রাজনৈতিক মতবাদের ভাঙ্গাগড়া আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়েই চল্‌ছে। কোনও ব্যক্তিবিশেষ তার নিজের মতে পৃথিবীকে নতুন এবং সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারবে অথবা পারবে না, একথা জোর গলায় হেঁকে বলা বিপত্তি ও আপত্তিজনক, ঐতিহাসিক রীতিবিরুদ্ধ তো বটেই। আরও বিশেষ যখন এই ক্ষেত্রে ব্যক্তিটি এখনও পর্য্যন্ত এমন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে পায়নি যার ব্যবহার বা অপব্যবহারের দ্বারা সে জার্ম্মানীর অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

একটা সন্দেহ স্বতঃই মনে জেগে ওঠে। Hitler-এর রাজনৈতিক মতগুলি বিশেষ ক'রে ফ্রান্স্ ও আমেরিকার স্বার্থের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত। বর্ত্তমান রাজনৈতিক জগতে অনুকূল ও প্রতিকূল প্রচাররীতির খুব প্রচলন হয়েছে। জার্ম্মানীর বর্ত্তমান বহিঃ ও অন্তর্সঙ্কটের নিরাকরণের একমাত্র উপায় মনে হয় বিস্‌মার্ক-প্রবর্ত্তিত যুগে ফিরে যাওয়া; গায়ের জোরে বাহিরের দাবী নাকচ করা এবং গায়ের জোরেই সেই ভাবে আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলা এবং ঐক্য স্থাপনা করা যে ভাবে এক তথাকথিত চৈনিক রাজা তাঁর রাজ্য হতে ভিক্ষাবৃত্তির উচ্ছেদ করেছিলেন। Hitler-এর সাফল্য নির্ভর করছে নাজীদলের সংখ্যার উপর এবং তাদের সমবেত শক্তির উপর। তবে কেন Lengyel হিট্‌লারের আশু পতনের ব্যগ্র বায়সবাণী করলেন? সন্দেহ হয়!

তবু বইখানি উপভোগ্য হয়েছে। বর্ত্তমান জার্ম্মানীর নৈতিক, রাষ্ট্রীয়, আর্থিক, গ্রাম্য জীবনাদি, মূল চরিত্রের বিশেষত্ব ও ঘটনাবলী আঁকার ফাঁকে ফাঁকে, নিপুণ হাতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। হিট্‌লারের বিরুদ্ধে প্রচার হিসাবে লেখকের এ বিষয়ে দক্ষতার প্রশংসা করতে হবেই। তবু নিরপেক্ষ ভাবী ঐতিহাসিক এরই ভিতরে অনেক উপযোগী মালমশলা পাবেন।

Hitler রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে যখন Landsberg-এর দুর্গে আবদ্ধ ছিলেন, সে সময়ের লেখা Mein Kampf-এ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বহু তত্ত্ব

পাওয়া যায়,—কিন্তু সম্পূর্ণ বোধগম্য ভাবে নয়। Dr. Lengyel-এর বইখানি Hitler-বিরোধী হ'লেও, Mein Kampf-এর পাশাপাশি পড়লে সম্ভবতঃ হিট্‌লার-স্বজীবনীর অবোধ্য অংশগুলি সরল হয়ে আসে।

Mein Kampf-এর অসাধারণ কিশোর বা বালকটি যা হিট্‌লার পাঠককে স্বীয় Vienna প্রবাসকালীন প্রতিকৃতি ব'লে বিশ্বাস করাতে চান্,—Dr. Lengyel-এর কলমের খোঁচায় তার চেহারা দাঁড়ায় একজন সাধারণ ছোক্‌রা রাজমজুরের। হিট্‌লারের বাবা ছিলেন অষ্ট্রো-ব্যাভেরীয় সীমান্তের সামান্য শুল্কবিভাগীয় নায়েব। তাঁর মা ছিলেন জাতিতে Czech; বংশগত টিউটন্ আভিজাত্য—বা নর্ডিক প্রাধান্যবাদের মূলে যে সহজ বীজ থাকে হিট্‌লারের ভিতর তা নেই। হিট্‌লার্ নর্ডিক্ নন্; তিনি যে মিশ্র আল্পীয়, তা আমরা তাঁর চেহারা এবং বংশাবলী থেকে জান্‌তে পারছি। একজন আল্পীয়ের পক্ষে নর্ডিক্ প্রাধান্যবাদ প্রচার করা যে শ্রেণীর মনোবৃত্তির পরিচায়ক—তার সঙ্গে দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশেও আমাদের পরিচয় আছে। হিন্দুর পক্ষে হিন্দুপ্রাধান্য, এ্যাংলো-স্যাক্সন্ বা টিউটনের পক্ষে নর্ডিকপ্রাধান্য অথবা নিগ্রোর পক্ষে নিগ্রোপ্রাধান্য বিশ্বাস করা স্বাভাবিক,—যদিও অপরের পক্ষে তা কষ্টকর। কিন্তু মঙ্গোলীয়ের পক্ষে য়িহুদিজাতির প্রাধান্য প্রচার করা অশোভনীয় ও অস্বাভাবিক, অপরের পক্ষে কষ্টকর তো বটেই। হিট্‌লার্ চরিত্রের এই বিশেষ বিকৃতিগুলি রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ববিদদের অনুশীলনযোগ্য।

শ্রী প্রতাপকুমার বসু

প্রকাশক—শ্রীজগবন্ধু দত্ত, ষ্টিফেন হাউস, ৪ ও ৫, ড্যালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা।
মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১।২, দুর্গা পিতুড়ি লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীজগবন্ধু দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

পরিচয়

বার্ষিক ৪।০
প্রতি সংখ্যা ১৲

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

দ্বিতীয় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৪০

বিষয় সূচী

পুস্তক-পরিচয়